তফসীরে নূরুল কোরআন

বাইশ পারা

২২

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

বাইশতম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

বাইশতম খন্ড

২২

বাইশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ,
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

তৃতীয় প্রকাশ ঃ জুলাই ২০১৪ইং

গ্রন্থ সত্ত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০

মোবাইল ঃ ০১৭১৩-০১৪৮৮৯, ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V); 22. Published by Al-Balag Publications
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207 Price : 350.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের ২২তম খন্ডের রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন। এজন্যে তাঁর মহান দরবারে পেশ করি সেজদায়ে শোকরানা। আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত এ কাজ ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। বস্তুতঃ তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা ও প্রকাশনার মাধ্যমে অহরহ আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, যার শোকর আদায় করতেও আমরা অক্ষম।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার অনন্ত অসীম নেয়ামতের শোকর গুজারীর তৌফিক দান কর।

আর অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর উসিলায় আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত ও দানে আমরা ধন্য। হে আল্লাহ! দরুদ ও সালাম পেশ কর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর আল আওলাদের প্রতি, দুনিয়ার শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত নক্ষত্রপুঞ্জ উদিত হয়েছে এবং হবে সেগুলোর সংখ্যা অনুসারে এবং দুনিয়ার শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত ফোটা বৃষ্টি পড়েছে এবং পড়বে, যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছে এবং হবে সেগুলোর সংখ্যা অনুসারে।

আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালাম কোরআনে করীমের হেফাজতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

'নিশ্চয় আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজতকারী'। কোরআনে করীম নাযিল হবার পর প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এর একটি জের জবরেও কোন পরিবর্তন হয়নি। এটি একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের হেফাজত করছেন।

সকল যুগেই আল্লাহ পাক তাঁর কিছু বন্দাকে পবিত্র কোরআন নিয়ে মশগুল থাকার তৌফিক দান করছেন, তাদের মধ্যে কেউ শুদ্ধ এবং সুন্দর করে পবিত্র কোরআন পাঠ করছেন, তারা হলেন 'ক্বারী', আরেক দল রয়েছেন, যাঁরা সর্বদা পবিত্র কোরআন কণ্ঠস্ত করে চলেছেন, তাঁরা হলেন 'হাফেজ'। আজকের দুনিয়ায় আল্লাহর রহমতে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন বর্তমান রয়েছেন, যেভাবে পবিত্র কোরআন কণ্ঠস্ত করা হয় এবং কণ্ঠস্ত রাখা হয়, পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ এ প্রক্রিয়ায় কণ্ঠস্থ করা ও রাখা হয়না। আরো

এক দল রয়েছেন, যারা পবিত্র কোরআন লিখছেন, তাঁরা হলেন কাতেব'। অন্য একদল রয়েছেন, তাঁরা পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তফসীরে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় জীবন অতিবাহিত করছেন, তাঁরা হলেন তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম। আরো একদল রয়েছেন, যাঁরা পবিত্র কোরআনের মর্মবাণীর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা হলেন ওয়ায়েজীনে কেরাম। আরেক দল রয়েছেন, যাঁরা আজীবন পবিত্র কোরআন শেখাচ্ছেন তাঁরা হলেন, মোদাররেসীনে কেরাম। এভাবে সকল যুগে, সকল দেশ ও পরিবেশে লক্ষ লক্ষ লোককে আল্লাহ পাক তাঁর কালামের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন। আর তাঁদের সবার সম্পর্কেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

خيركم من تعلم القران وعلمه

'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে পবিত্র কোরআন শেখে এবং শেখায়'।

পবিত্র কোরআনের ভাষা; তার অর্থ সব কিছুই বরকতময় এবং শিক্ষণীয়, যে বা যারা এ পর্যায়ে কোন প্রকার ভূমিকা পালন করবে, তার জন্যেই রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ সুসংবাদ।

এরপরও কথা থাকে, তা হলো পবিত্র কোরআন যেমন পাঠ করতে হবে, তেমনি তার মর্মবাণীর উপর আমলও করতে হবে, আর আমল করার জন্যে এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা পূর্বশর্ত।

মূলতঃ এজন্যেই তফসীরে নূরুল কোরআনের এ সাধনা, যা অব্যাহত রয়েছে বিগত দু' যুগ থেকে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কোন্ ভাষায় শোকর আদায় করবো, যে তিনি পবিত্র কোরআনের ২২ পারা পর্যন্ত তফসীরের এ মহান কাজ সু-সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন।

হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। তোমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আমাদের এ সাধনা কবুল কর, আমাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা কর, সকল পাঠক, সহযোগী ও শুভানুধ্যায়ী সহ সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল কর, যারা তফসীরে নূরুল কোরআন সম্পূর্ণ করার জন্যে দোয়া করছেন, তাঁদের প্রতিও বিশেষ রহমত নাযিল কর। হে আল্লাহ! এ কাজকে সহজ করে দাও এবং সারা পৃথিবীতে তফসীরে নূরুল কোরআন পৌঁছে দাও, তোমার পছন্দনীয় জীবন যাপনের তওফিক দান কর, আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

বিনীত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। উম্মহাতুল মোমেনীনের ফজিলত	৪
২। নারী জাতির কর্মক্ষেত্র	৯
৩। পর্দাহীনতার শোনীয় পরিণতি	১২
৪। আহলে বায়েত	১৬
৫। সংক্ষিপ্ত কথা	১৯
৬। শানে নুযুল	২১
৭। আল্লাহর স্মরণের মাহাত্ম	২৪
৮। আয়াতের মর্মকথা	২৮
৯। শানে নুযুল	২৯
১০। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর গৌরব	৩৩
১১। হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর গৌরব	৩৬
১২। খাতেমুন নাবিয়্যীন	৪২
১৩। খতমে নবুওয়তের তাৎপর্য	৪৬
১৪। আল্লাহর জিকর	৫১
১৫। শানে নুযুল	৫৩
১৬। 'সালাত' শব্দের ব্যাখ্যা	৫৪
১৭। 'সিরাজাম মুনীরা'র তাৎপর্য্য	৬৫
১৮। শানে নুযুল	৬৬
১৯। আয়াতের মর্মকথা	৬৬
২০। শানে নুযুল	৭৭
২১। বরের পক্ষে কণেকে দেখা বৈধ	৭৯
২২। শানে নুযুল	৮১
২৩। আদব কায়দা ও ভদ্রতা শিক্ষা	৮২
২৪। আয়াতের মর্মকথা	৮৪
২৫। শানে নুযুল	৮৭

বিষয় পৃষ্ঠা
২৬। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের সংঙ্গে বিয়ে অবৈধ....৮৭
২৭। দরুদ শরীফ পাঠের গুরুত্ব ও মাহাত্ম............................ ৯২
২৮। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাম প্রেরণের তাৎপর্য.... ১০০
২৯। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি.......১০৫
৩০। শানে নযুল............................ ১১০
৩১। পর্দা প্রথার গুরুত্ব............................ ১১১
৩২। মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে শাস্তির ঘোষণা............................ ১১৩
৩৩। কেয়ামতের আলামত............................১১৬
৩৪। চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা............................ ১১৮
৩৫। আমানতের তাৎপর্য............................১২৭
৩৬। সূরায়ে সাবা প্রসঙ্গে............................ ১৩৬
৩৭। নামকরণ............................১৩৬
৩৮। পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক............................ ১৩৭
৩৯। শানে নুযুল............................১৩৮
৪০। কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী............................১৪২
৪১। হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিশেষ ফজিলত............................১৫৬
৪২। সাবা জাতির পরিণতি............................১৭১
৪৩। আল্লাহ পাকের মহান দরবারের মাহাত্ম............................ ১৮৬
৪৪। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য............................১৯৪
৪৫। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা............................ ১৯৬
৪৬। কাফেরদের শাস্তি............................ ২০২
৪৭। শানে নুযুল............................২০৩
৪৮। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা............................২০৩
৪৯। ধনবল বা জনবল বড় কথা নয়............................২০৪
৫০। নৈকট্য-ধন্য হবার মাধ্যম............................ ২০৬
৫১। নৈকট্য লাভের পন্থা............................ ২০৮
৫২। আল্লাহর রাহে দানের ফজিলত............................ ২১০

বিষয় পৃষ্ঠা

৫৩। কাফেরদের ধৃষ্টতা..২১৪
৫৪। সত্যের বিজয় ঘোষণা..২২২
৫৫। সূরা ফাতের প্রসঙ্গে..২২৯
৫৬। ফেরেশতা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি..২৩১
৫৭। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা..২৩৭
৫৮। পুনরুত্থানের প্রমাণ..২৪৩
৫৯। ইজ্জত সম্মানের প্রতিভূ একমাত্র আল্লাহ পাক..২৪৫
৬০। সকলেই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী..২৫৮
৬১। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা..২৬২
৬২। পরকালের মূল্যবান সম্পদ..২৬২
৬৩। এলমের ফজিলত..২৬৯
৬৪। জীবনকে সার্থক করার তিনটি কর্মসূচী..২৭৩
৬৫। আমল অপরিহার্য..২৭৪
৬৬। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা..২৭৭
৬৭। পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকারী কে?..২৭৯
৬৮। ওলামায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা..২৮২
৬৯। জান্নাতে সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে..২৮৭
৭০। শানে নুযুল..২৮৯
৭১। হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতের আয়না ভেঙ্গে গেল..৩০০
৭২। শানে নুযুল..৩০১
৭৩। সূরা ইয়াসীন প্রসঙ্গে..৩০৭
৭৪। শানে নুযুল..৩০৭
৭৫। সূরা ইয়াসীনের ফজিলত..৩০৭
৭৬। পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক..৩০৯
৭৭। কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পেলোনা...... ৩১৩
৭৮। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব..৩১৫
৭৯। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা..৩১৮
৮০। আনতাকিয়ার ঘটনা..৩২৩

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ
হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)-এর
অন্যান্য বই

১। পবিত্র কোরআনের মর্মকথা
২। বিশ্ব-সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান
৩। পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব-জীবন
৪। হযরত গওসুল আযমের (রঃ) অমরবাণী
৫। ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন
৬। দালায়েলুল খায়রাত (বাংলা)
৭। দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম
৮। সাহাবা-চরিত
৯। হাজীদের সাথী
১০। বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবদান
১১। এনায়েতুল কোরআন
১২। যুগ-সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন
১৩। মানব-মর্যাদায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
১৪। ইসলামী মাহফিলের তাৎপর্য
১৫। তারীখে ইসলাম (উর্দু)
১৬। শরহে বয়যাবী
১৭। ইসলামী অর্থনীতির রূপ-রেখা
১৮। মুসলমানের কর্তব্য
১৯। দুই ঈদ
২০। পবিত্র কোরআনের অনুবাদ (প্রথম খণ্ড)
২১। ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে
২২। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খণ্ডে সমাপ্ত)
২৩। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

বাইশতম খন্ড **বাইশ পারা**

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ

النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(৩১) এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে ও নেক আমল করবে, তাকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবো, আর তার জন্যে আমি রেখেছি সম্মানজনক উপজীবিকা।

(৩২) হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের ন্যায় নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তোমরা এভাবে পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলোনা, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়; বরং তোমরা যুক্তিসঙ্গত কথাই বলবে।

(৩৩) এবং তোমরা তোমাদের গৃহেই অবস্থান করবে, প্রথম জাহেলিয়া যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করোনা। আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর। আর আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত থাক। হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো শুধু তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে পবিত্র করতে চান।

(৩৪) আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহ এবং জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণে রাখ। আল্লাহ্ পাক অতীব সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব বিষয় অবগত।

তফ্সীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে উম্মাহাতুল মোমেনীন বা মোমেন-জননীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণের পাশাপাশি তাদের উচ্চ মর্যাদার ঘোষণাও ছিল। আর এ আয়াতে তাদের উচ্চ মর্যাদার কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا

'এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে ও নেক আমল করবে তাকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবো, আর তার জন্যে আমি রেখেছি সম্মানজনক উপজীবিকা'।

এভাবে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-সঙ্গিনীগণের বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। যেন তাঁরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাকওয়া পরহেযগারী ও অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জনের পাশাপাশি নিজেদের অন্তর সমূহকে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রাখেন এবং আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর জন্যে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও প্রকাশ করা যায়। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তাঁরা যেন দুনিয়া অথবা আখেরাত-এর যে কোন একটিকে অবলম্বন করে। তাঁরা দুনিয়ার স্থলে আখেরাতকেই বেছে নেন এবং চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের আগ্রহ

প্রকাশ করেন। এজন্যে আল্লাহ পাক সরাসরি তাঁদেরকে সম্বোধন করে তাঁর মহান বাণী প্রেরণ করেছেন, যেমন পরবর্তী আয়াতেই রয়েছেঃ

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

'হে পয়গম্বরের স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের ন্যায় নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, তবে তোমরা এভাবে পর পুরুষদের সাথে কথা বলোনা যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়, বরং তোমরা যুক্তিসঙ্গত কথাই বলবে'।

এ আয়াতেও মোমেন-জননীগণের অনন্য-সাধারণ মর্যাদার কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের নেক আমলের জন্যে অন্য নারীদের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ সওয়াব লাভ করবেন, আর তাঁদের উচ্চ মর্যাদা ও উত্তম রিয্কের কথাও এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরকারগণ এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন যে যেহেতু (১) তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিকতর অনুগত ছিলেন। (২) যেহেতু তাঁরা দুনিয়ার মায়া মোহ, আরাম আয়েশ পরিহার করে ধৈর্য এবং অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করেছেন, তাই তাঁদেরকে এ উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, উম্মাহাতুল মোমেনীনের একটি নেকীর সওয়াব অন্যদের দশটি নেকীর সমান হবে।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের তৌফিক দিয়েছেন, মোমেন-জননী হবার উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তাই তাঁদের মর্যাদা অসাধারণ, অতুলনীয়, সততা, পরহেযগারী এবং আল্লাহ পাকের রসূলের তাবেদারী প্রভৃতি গুণাবলী তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য। আর এজন্যে এ আয়াতে এ বিষয়েও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, যদি তোমাদের অন্তরে সত্যিই আল্লাহ পাকের ভয় থাকে, তবে তোমরা নিজেদের আত্মমর্যাদায় সর্বদা সচেতন থাকবে, কোন পর পুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় সুরে কথা বলবেনা, কেননা যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, তারা এ ব্যাপারে দুর্বলতার পরিচয় দিতে পারে। পরিণামে তাদের ইহকাল পরকাল ধ্বংস হবার আশঙ্কা থাকে। অতএব, এসব ক্ষেত্রে অন্য নারীদের চেয়েও মোমেন-জননীগণের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন একান্ত কাম্য।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, মোমেন-জননীগণের পূণ্যের পুরস্কার যেমন দ্বিগুণ তেমনি তাদের পাপের শাস্তিও দ্বিগুণ। তাঁদের অতি উচ্চ মর্যাদার কারণেই এ ব্যবস্থা।

উম্মাহাতুল মোমেনীনের ফজিলত

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অন্যান্য মোমেন স্ত্রীলোকদের চেয়ে আমার নিকট তোমাদের সম্মান, মর্যাদা এবং তোমাদের নেক আমলের সওয়াব অনেক বেশী।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সকল নারীদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হলেন উম্মাহাতুল মোমেনীন বা মোমেন-জননীগণ।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সমগ্র বিশ্বের স্ত্রীলোকদের মধ্যে তোমাদের মর্যাদা যথেষ্ট, অর্থাৎ সকলের ওপর প্রাধান্য রয়েছে মরয়ম বিনতে এমরান, খাদিজা বিনতে খোয়াইলাদ, আর ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হবার যে উচ্চ মর্যাদা তোমরা লাভ করেছ, সারা পৃথিবীতে এমন মর্যাদা আর কারো নেই।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সমগ্র নারী জাতির মধ্যে উত্তম হলেন হযরত ফাতেমাতুজ যোহরা (রাঃ) এবং উম্মাহাতুল মোমেনীনের মধ্যে উত্তম হলেন হযরত খাদিজা বিনতে খোয়াইলাদ (রাঃ)। এমনিভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে মরয়ম বিনতে এমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং আয়েশা (রাঃ)।

ইমাম বোখারী ও মুসলিম এবং আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পুরুষদের মধ্যে তো অনেকেই পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে কিন্তু নারীদের মধ্যে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং মরয়ম বিনতে এমরান ব্যতীত আর কেউ পরিপূর্ণতা লাভ করেনি, আর নারীদের মধ্যে আয়েশার ফজিলত হল এমন, যেমন খাবারের মধ্যে সারীদের ফজিলত।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছেঃ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'এর মধ্যে (পৃথিবীতে) উত্তম স্ত্রী হলেন মরয়ম বিনতে এমরান এবং খাদিজা বিনতে খোয়াইলাদ'। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে জান্নাতবাসী স্ত্রীলোকদের তুমি হবে নেত্রী'।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এই ফেরেশতা (এই মাত্র এসেছে) যে ইতোপূর্বে কখনও নিম্নে অবতরণ করেনি, সে তার প্রতিপালকের অনুমতি প্রার্থনা করেছে যেন এসে আমাকে সালাম করে এবং এ সুসংবাদ দেয় যে, ফাতেমা (রাঃ) জান্নাতী স্ত্রীলোকদের সর্দার হবে এবং হাসান হোসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা হবে। অনুমতি প্রার্থনার অর্থ হল অনুমতি লাভ করেছে এবং এসে এই বাণী পৌঁছিয়েছে।[১] (তিরমিজী শরীফ)

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, উম্মাহাতুল মোমেনীনের নেক আমলের সওয়াব অন্য স্ত্রীলোকদের নেক আমলের চেয়ে অধিকতর হবে। তদ্রুপ তাঁদের অন্যায়ের শাস্তিও অন্যদের চাইতে অধিক হবার ঘোষণা রয়েছে। এর পাশাপাশি আলোচ্য আয়াতে আখেরাতে তাঁদের জন্যে যে সম্মানজনক রিয্কের ব্যবস্থা রয়েছে, তার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। নেক আমলের পুরস্কার যেমন তাঁদেরকে দ্বিগুণ দেয়া হবে, ঠিক তেমনি অন্যায় কাজের শাস্তিও তাদের দ্বিগুণ হবে, এটি তাঁদের উচ্চ মর্যাদার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহিয়সী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের আনুগত্য এবং নেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে, তোমাদের জন্যে জান্নাতে অত্যন্ত সম্মানজনক রিয্কের ব্যবস্থা রয়েছে। কেননা তাঁরা আল্লাহ্ পাকের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটই অবস্থান করবেন, আর তাঁর অবস্থান হবে সর্বোচ্চ স্তরে, আর সে স্তরের নামই হলো 'ওয়াসীলা'। এটি হলো জান্নাতের মঞ্জিল, যার ছাদ হলো আল্লাহ্ পাকের মহান আরশ।[৩]

ইমাম তাবারী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেন-জননীগণকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা যদি আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ মোতাবেক আমল কর, তবে তোমাদেরকে পৃথিবীর অন্য নারীদের নেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের يقنت শব্দটি قنوت থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো তোমাদের মধ্যে যারা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৬৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড -২৫, পৃষ্ঠা- ২০৬
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-২

আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে, তাদের জন্যেই রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব এবং সম্মানজনক উত্তম রিয্কের ব্যবস্থা।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! উম্মাহাতুল মোমেনীন তাঁদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকওয়া পরহেযগারীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনে এবং তাঁর ইন্তেকালের পরও তাঁদের এ বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে অক্ষুন্ন ছিল। ইসলামের দুশমনরা এক্ষেত্রে ছিদ্রান্বেষণের অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

বস্তুতঃ মোমেন-জননীগণ দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-সঙ্গিনী, তাঁদের মর্যাদা সর্বোচ্চে, তাঁরা সর্বকালে সম্মানিত, তাঁদের এ সম্মানের ঘোষণা এভাবেও করা হয়েছেঃ

وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا

অর্থাৎ কারো জন্যে কখনও এর অনুমতি নেই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীকে তাঁর পরে আর কেউ বিয়ে করতে পারে, এটি তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ পর্যন্ত উম্মাহাতুল মোমেনীনের উচ্চ মর্তবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে কিছু নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হচ্ছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

'হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের ন্যায় নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে এভাবে পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলোনা, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়; বরং তোমরা যুক্তিসঙ্গত কথাই বলবে'।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক উম্মাহাতুল মোমেনীনের উদ্দেশ্যে এমন কিছু নিয়ম কানুন ঘোষণা করছেন, যার দ্বারা তাকওয়া পরহেযগারীর উপর কায়েম থাকা সহজ হয়। তাই এরশাদ হয়েছে, হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নও, বরং তোমরা অনন্য-সাধারণ সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত। তোমরা উন্নত আদর্শের অধিকারীনী। অতএব, তোমাদের তাকওয়া পরহেযগারীও হবে অসাধারণ, তোমাদের পরহেযগারীর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই কোন পর পুরুষের সাথে নিতান্ত প্রয়োজন হলেও কখনও মিষ্টি মধুর স্বরে কথা বলবে না, কেননা যাদের অন্তরে কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি থাকে তাদের দুনিয়া আখেরাত দু' জাহানের সাধনা এভাবে বিনষ্ট হতে পারে।

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২

অতএব, এ ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। পরবর্তী বাক্যাংশে এর কয়েকটি কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

'অতএব, তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলোনা',

فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

'কেননা, এর পরিণামে যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত থাকে, তারা প্রলুব্ধ হয় এবং ফেতনা সৃষ্টি হয়'।

وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

'আর তোমরা যুক্তিসঙ্গত কথাই বলবে'।

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ

'এবং তোমরা তোমাদের গৃহেই অবস্থান করবে'।

অর্থাৎ নিজেদের হেফাজতের উত্তম পন্থা হলো মেয়েদের স্ব-গৃহেই অবস্থান করা। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যাতিরেকে ঘর থেকে বের না হওয়া। যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে শরীয়ত মোতাবেক পর্দা করে বের হওয়া।

ইসলাম নারী জাতিকে দিয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা। আর এ উচ্চ মর্যাদা রক্ষায় এবং নারী জাতির পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখতে যা একান্ত জরুরী তারই নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে পর নারীর সাথে এমন কোমল কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করেছেন যার ফলে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে জনৈক ব্যক্তি কোন নারী পুরুষকে এক সঙ্গে কথা বলতে লক্ষ্য করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি আলাপরত পুরুষটির মাথায় এমন প্রবল আঘাত করে যে তার মাথা ফেটে যায়। পরে খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এ মোকদ্দমা পেশ করা হলে তিনি আঘাতকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

'আর জাহেলিয়াতের যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রকাশ করোনা'।

বলাবাহুল্য, বর্তমান যুগে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে যে নগ্ন সভ্যতার প্রচলন হয়েছে তা নতুন কিছু নয়; বরং বর্বরতার যুগেও এভাবেই নারীরা নিজেদের সাজ-সজ্জা, শোভা-সৌন্দর্য দেখিয়ে ফিরত। ইসলামের আবির্ভাবের মাধ্যমে এ অন্যায়-অনাচার বন্ধ হয়েছিল। কেননা ইসলাম মাতৃ-জাতির সম্মান রক্ষা করতে চায়। মানবতার কল্যাণ এবং সভ্যতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধন করতে চায়। এজন্যেই ইসলাম নির্লজ্জতা এবং বেলেল্লাপনার অনুমতি দেয়না। নারী জাতির স্বেচ্ছাচারিতা এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি-অশ্লীলতা ইসলাম বরদাশত করেনা। এটি নিঃসন্দেহে আত্মহনন ব্যতীত আর কিছুই নয়। নারী অন্দর মহলের শোভা-সৌন্দর্য রূপেই তার প্রতি অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুক-এটিই ইসলামের কাম্য।

আলোচ্য আয়াতের الجاهلية الاولى এর ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো ইসলামের আবির্ভাবের আগের যুগ অর্থাৎ বর্বরতার যুগ।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত সময়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার আবুল আলিয়া (রঃ) বলেছেন, দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর যুগকেও জাহেলিয়াতের যুগ বলে আখ্যা দেয়া যায়। কেননা, সে যুগেও মহিলারা এমন পোষাক পরিধান করতো যা দ্বারা দু'দিক থেকেই তাদের দেহ উন্মুক্ত থাকতো।

তফসীরকার একরামা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর মধ্যকার সময়কে (الجاهلية الاولى) 'জাহেলিয়্যাতিল উলা' বলা হয়েছে।

হযরত আদম (আঃ)-এর বংশ থেকে দু'টি গোত্রের উৎপত্তি হয়। একটি গোত্র পাহাড়ের উপর বসবাস করতো, আরেকটি সমতল ভূমিতে। পাহাড়ের উপর অবস্থানকারী গোত্রের পুরুষদের চেহারা অত্যন্ত সুন্দর হতো, কিন্তু তাদের মেয়েদের চেহারা হতো কুৎসিত। পক্ষান্তরে, সমতল ভূমিতে যারা বাস করতো তাদের মেয়েরা হতো সুন্দরী, কিন্তু পুরুষদের চেহারা হতো কুৎসিত।

একবার ইবলিস মানবাকৃতি ধারণ করে সমতল ভূমিতে অবস্থানকারী এক ব্যক্তির নিকট হাযির হলো এবং তার ভৃত্য হিসেবে কাজ শুরু করলো। এরপর সে একটি বাঁশী তৈরী করে, যা এভাবে সে বাজাতে থাকে যে লোকেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একত্রিত হয়। পরবর্তীতে সে বাঁশী বাজাবার অনুষ্ঠান করতে শুরু করে, যেখানে

নারীরা সাজ-সজ্জা করে পুরুষের সম্মুখে হাযির হওয়া শুরু করে। ঘটনাক্রমে পাহাড়ের কোন অধিবাসী এমনি অনুষ্ঠানে পৌঁছে নারী পুরুষকে একত্রিত অবস্থায় দেখে এবং নারীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। এরপর সে পার্বত্য এলাকায় তার অধিবাসীদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করে। পাহাড়ের অধিবাসীরাও এরপর এসে আবাদ হয়। এভাবে ব্যাভিচার প্রসার লাভ করে। আলোচ্য আয়াতের تبرج الجاهلية الاولى দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।

অথবা এর দ্বারা বর্বরতার যুগকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, বিশেষ কোন সীমা নির্ধারিত নেই।[১]

নারী জাতির কর্মক্ষেত্র

বর্তমান যুগে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে, নারী স্বাধীনতার নামে বিশ্বময় যে স্বেচ্ছাচারিতা এবং অশ্লীলতার গড্ডলিকা প্রবাহ চলছে, তা বর্বরতার যুগেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাই ইসলাম নারীর স্বেচ্ছাচারিতা তথা অশালীন আচরণকে সমর্থন করেনা, করতে পারেনা। যারা পর্দা প্রথাকে 'মধ্যযুগীয়' বলে উড়িয়ে দিতে চায়, যারা নারীকে রাস্তায় টেনে আনার প্রয়াসী তারা প্রকৃত অবস্থায় শুধু যে মাতৃজাতিকে অপমান করে তাই নয়; বরং বর্বরতার যুগেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

(আর তোমরা প্রথম জাহেলিয়া যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করোনা।)

কোন কোন অপরিণামদর্শী ব্যক্তিকে একথা বলতে শোনা যায় যে, নারী সমাজ জাতির অর্ধেক। যদি নারী সমাজকে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে না দেয়া হয়, তবে জাতির অর্ধাংশকে অকার্যকর করে রাখা হয়। আর জাতীয় উন্নতির পথে এটি হয় বড় বাধা। প্রকৃতপক্ষে কথাটি সত্য নয়, কেননা ইসলাম নারীকে গৃহবন্দী এবং নিস্ক্রীয় করে রাখতে চায় এমন নয়; বরং ইসলাম নারীকে জাতীয় জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের তাগিদ দেয়, কেননা জাতির ভবিষ্যত তাদেরই কোলে গড়ে ওঠে। মা মাত্রকেই তার সন্তানকে চরিত্রবান, বিভিন্ন গুণের অধিকারী করে প্রস্তুত করতে হয়। এটি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। তারা যদি এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, তবে এটিই হবে জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের বিরাট অবদান।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৬৭-৬৮

বর্তমান যুগে নারী স্বাধীনতার যে ধুঁয়া উঠেছে এবং মাতৃজাতিকে রাজপথে টেনে আনা হয়েছে, পরিণামে সন্তান তার মায়ের সস্নেহ প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এ কারণেই এখন সুশিক্ষিত, সুনাগরিক এবং সচ্চরিত্রের যুবক খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। যে সত্যটি সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে, তা হলো নারী জাতির কর্মক্ষেত্র তার গৃহ, বাইরে নয়। পুরুষদের কর্মক্ষেত্র বহিঃবিশ্ব। জীবন সাধনায় নর-নারী উভয়ের দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ সাফল্যের মণিমানিক্য সংগ্রহ করে আনবে, আর নারী তা সংরক্ষণ করবে। অতএব, প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নারী জাতির প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালনের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় যে অশান্তি বিরাজমান, তা দূর করার একমাত্র পথ হলো পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ। তাই নবী পত্নীগণকে লক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াতে যে পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তা শুধু তাঁদের জন্যেই নয়; বরং সর্বকালের সমগ্র নারী জাতির উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে, আর এতেই রয়েছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ।

আলোচ্য আয়াতে নারী জাতি সম্পর্কে যে পথ-নির্দেশনা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়ত কয়েকটি বিধান প্রণয়ন করেছেঃ

১. মেয়েদের এত উচ্চস্বরে কথা বলা বৈধ নয়, যা পর পুরুষ শ্রবণ করে।

২. মেয়েদের আযান দেয়া বৈধ নয়।

৩. একান্ত জরুরী না হলে তারা বাড়ী থেকে বের হবে না।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে-

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ

(আর তোমরা তোমাদের গৃহেই অবস্থান করবে)

শুধু যে গৃহে থাকবে তা নয়; বরং নামাজও তারা স্বগৃহেই পড়বে। কেননা, তাদের নামাজ মসজিদের চেয়ে গৃহেই উত্তম। একান্ত প্রয়োজনে যদি কোন স্ত্রীলোককে বাইরে যেতেই হয় তবে তাকে অবশ্যই শরীয়ত মোতাবেক পর্দা করে বেরোতে হবে।

৪. পবিত্র কোরআনের সূরা নূরে বিশেষভাবে এবং বিস্তারিতভাবে একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা হলো

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

'(হে রসূল!) আপনি মোমেনদেরকে বলুন, যেন তারা তাদের চক্ষুকে নীচু করে রাখে'। অর্থাৎ তারা যেন চক্ষুর হেফাজত করে। এমনিভাবে, অন্য আয়াতে নারীদেরকে লক্ষ্য করেও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য হলো নিজেদের চক্ষুকে হেফাজত করা তথা একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন, 'হে আলী! কোন পর নারীর প্রতি অনিচ্ছাকৃত ভাবে প্রথম যে নজর পড়ে, তোমার জন্যে তার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় নজরের অনুমতি নেই, তার জন্যে তোমার শাস্তি হবে'।

অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত নজরের পর যদি কেউ ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় বার নজর ফেলে, তবে তার জন্যে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। স্বামী বা পিতা ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে মেয়েদের সৌন্দর্য এবং সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করা বৈধ নয়, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ-الاية

৫. যদি কোন পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলার একান্ত প্রয়োজনই হয় তবে তা বলতে হবে পর্দার আড়াল থেকে, যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

'আর যদি তোমরা তাদের নিকট কিছু চাও তবে পর্দার আড়াল থেকেই চাও'।

৬. নিতান্ত প্রয়োজনে নারীদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে কয়েকটি শর্তে-

(ক) বাইরে যেতে হলে অবশ্যই পর্দা করে যেতে হবে।

(খ) কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে যাবে না।

(গ) অভিভাবক অথবা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে যাবে না।

(ঘ) স্ত্রীলোক রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবেনা; বরং এক পার্শ্ব দিয়ে হেঁটে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসে এ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৭. ইসলামী শরীয়ত এ নির্দেশ দিয়েছে যে, কেউ যেন কারো গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে।

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

'তোমাদের গৃহ ব্যতীত অন্য কোন গৃহে প্রবেশ করোনা যে পর্যন্ত না তোমরা তাদের অনুমতি গ্রহণ কর এবং তাদের প্রতি সালাম পেশ কর'।

এমনিভাবে ইসলাম কারো বাড়ীর ভেতরে নজর দেয়াকেও নিষিদ্ধ করেছে।

পর্দাহীনতার শোচনীয় পরিণাম

عن الحسن مرسلا قال بلغنى ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم قال لعن اللّٰه الناظر والنظور اليه رواه البيهقى فى شعب الايمان

৮. হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছেছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে পর নারী বা পর পুরুষকে দেখে আর যাকে দেখা হয় তার প্রতি আল্লাহর লা'নত'।

যাহোক, এ আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শরীয়ত যে পর্দা প্রথা প্রচলন করেছে তা নারীকে গৃহবন্দী করতে নয়; বরং তাদের নিরাপত্তার খাতিরেই এ বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। বিশ্বের সকল নারীর জন্যেই আল্লাহ পাকের এ বিধান। নারী জাতির কল্যাণ-সাধনের পাশাপাশি মানব সভ্যতার সংরক্ষণও এ বিধানের লক্ষ্য। কেননা (১) যারা পর্দাহীন, তাদের মাঝে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয়। (২) এ পর্দাহীনতাই অবশেষে ব্যাভিচারের ঘৃণ্য দ্বার উম্মুক্ত করে। (৩) অবশেষে এমনকি, অবৈধ সন্তানের জন্মও হয়। (৪) বংশধারা বিনষ্ট হয়। (৫) সমাজে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয় (৬) পর্দাহীন স্ত্রীলোক তার স্বামীর শান্তি ও সান্ত্বনারও কারণ হয় না; ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে স্বামী যখন বাড়ী ফিরে, সে থাকে তখন অনুপস্থিত। (৭) আর পর্দাহীন স্ত্রী শুধু যে স্বামীর কোন খেদমত করেনা, অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর অনুগতও থাকেনা এবং সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনের হক্বও আদায় করতে পারেনা। ফলে পারিবারিক জীবন হয় দুর্বিষহ। কলহ-দ্বন্দ্ব হয় নিত্যসাথী। পর্দাহীনতার শোচনীয় পরিণামে পশ্চিমা দেশ সমূহে আজ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি এখন সেখানে টলটলায়মান। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি– এসব পরিচয়ের কোন স্থায়িত্ব সেখানে এখন আর অবশিষ্ট নেই। ইসলাম মানব জতিকে এমন অন্যায়-অনাচার থেকে রক্ষা করেছে। মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

'আর তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত থাক'।

বর্বরতার যুগের অন্যায় অনাচার এবং ব্যাভিচারের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশের পর আলোচ্য আয়াতে শরীয়তের এমন কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে যা পালনের মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে এবং মানুষকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়, আর তা হলো যথা নিয়মে, যথা সময়ে সঠিকভাবে নামাজ কায়েম করা। তাই এ পর্যায়ে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ রয়েছে। নামাজ হলো আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় এবাদত। একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বন্দা আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য হয় তখন যখন সে তাঁর দরবারে সেজদারত হয়।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যদি নামাজের হিসাব সঠিক পাওয়া যায় তবে অন্য আমলের হিসাব সহজ হয়ে যাবে। আর নামাজের উল্লেখের মাধ্যমে 'হক্কুল্লাহ' বা আল্লাহ পাকের হক্ব আদায়ের তাগিদ করা হয়েছে কেননা, আল্লাহ পাকের হক্বের প্রতীক হলো নামাজ। এরপর বন্দার হক্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ তোমরা যথা নিয়মে যাকাত আদায় কর। আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সাথে ভাল ব্যবহার কর। বিশেষতঃ দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে আত্মনিয়োগ কর। এরপর সাধারণভাবে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অনুগত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

'হে নবী পরিবার! আল্লাহ পাক তো শুধু তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করতে চান'।

অর্থাৎ হে নবী পত্নীগণ! তোমাদেরকে কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কিন্তু তোমাদের কষ্ট দেয়ার জন্যে নয়; বরং এতে রয়েছে আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া এবং তাঁর বিশেষ রহমতের জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ পাকের মর্জি হলো তোমাদের অসাধারণ মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা, কেননা তোমাদের অবস্থান

সর্বোচ্চে। তোমরা অনন্যা। তোমরা যেন সর্বক্ষেত্রেই অনন্যা থাক তার ব্যবস্থাই করা হয়েছে বর্তমান বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম, এবনে আসাকের একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত বিশেষভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে একরামা (রঃ) বলতেন, এ আয়াত বিশেষভাবে উম্মাহাতুল মোমেনীনের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

মসনদে আহমদ এবং তিরমিজীতে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের জন্যে বের হয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়ীর সম্মুখে পৌছে বলতেন, 'হে আহলে বায়েত! নামাজের সময় এসে গেছে'। এরপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

হযরত ওয়াসেলা এবনে আসকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তখন জানতে পারলাম, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসে গমন করেছেন। আমি তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম। একটু পরই দেখি স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন হযরত আলী (রাঃ) এবং হাসান (রাঃ) হোসেন (রাঃ)। তাঁরা উভয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলি মোবারক ধরে রেখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর সম্মুখে বসিয়েছেন এবং হযরত হাসান (রাঃ) এবং হোসায়েন (রাঃ)-কে কোলে বসিয়েছেন। এরপর একটি চাদর দিয়ে সকলকে ঢেকে নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, 'হে আল্লাহ! এ হল আমার আহলে বায়েত, আর আমার আহলে বায়েত অধিকতর হক্বদার'। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহলে বায়েত সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) বলেছেন, 'এ দৃশ্য দেখে আমিই আরজ করেছিলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমিও আপনার আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'হ্যাঁ তুমিও আমার আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত'।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৪

হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ফরমান আমার জন্যে বিরাট আশার সঞ্চার করেছে।

মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত ইয়াজিদ এবং হাব্বান বর্ণনা করেন, আমি এবং হাসিন এবনে সোবরা ও আমর এবন মুসলেমা একত্রিত হয়ে হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ)-এর নিকট হাযির হলাম। হাসিন বললেন, 'হে যায়েদ! আপনি অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জেয়ারত লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁর পবিত্র হাদীস সমূহ শ্রবণ করেছেন, তাঁর সঙ্গী হয়ে জেহাদ করেছেন, যাহোক আপনি অনেক কল্যাণ, অনেক বরকত লাভ করেছেন, অতএব, আপনি আমাদের কোন হাদীস শুনিয়ে দিন'। তিনি বললেন, 'হে ভ্রাতঃস্পুত্র! এখন আমার বয়স অনেক বেড়ে গেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগও অনেক দূরে সরে গেছে, অনেক কথা মনেও নেই, অতএব আমি নিজে যা বর্ণনা করি তা গ্রহণ কর, অন্যথায় আমাকে কষ্ট দিওনা। শোন, মক্কা এবং মদীনার মধ্যে একটি স্থান রয়েছে যেখানে পানি পাওয়া যায়, যার নাম হল খম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন, আল্লাহ পাকের হাম্‌দ বর্ণনার পর তিনি এরশাদ করলেন, 'আমি একজন মানুষ, আর হয়তো আমার নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বাণী বাহক আসতে পারে, আর এ সম্ভাবনা আছে যে আমার নিকট আমার প্রতিপালকের বাণী বাহক এসে পড়বে, আর আমি সেই পয়গাম মেনে নেব। আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, প্রথমতঃ আল্লাহর কিতাব, (পবিত্র কোরআন) যাতে রয়েছে হেদায়েত এবং নূর, তোমরা আল্লাহ পাকের কিতাবকে গ্রহণ কর এবং সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর'। এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি এরশাদ করেছেন, 'আমার আহলে বায়েত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করিয়ে দিচ্ছি', একথাটি তিনবার বলেছেন'। তখন হাসিন হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহলে বায়েত কে? তাঁর স্ত্রীগণ কি আহলে বায়েত নন'? তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, 'তাঁর স্ত্রীগণ তো আহলে বায়েত আছেনই, তবে তাঁর আহলে বায়েত হলেন তাঁরা, তাঁর পর যাদের উপর সদকা গ্রহণ করা হারাম'। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারা কে?' তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, 'আলে আলী, আলে আকীল, আলে জাফর, আলে আব্বাস (রাঃ)'। জিজ্ঞাসা করা হল, 'তাঁদের সকলের প্রতি কি সদকা গ্রহণ করা হারাম?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।[১]

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৫-৬

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হল হে আহলে বায়েত! তোমাদের প্রতি যে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করার যে নির্দেশ রয়েছে তার কারণ হল, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পাপাচার থেকে দূরে রাখতে চান, তোমরা যেন এমন কাজ থেকে বিরত থাক যা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয়।

আহলে বায়েত

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাড়ীর লোক তথা পরিবারবর্গ।

একরামা এবং মোকাতেল (রঃ)-এর মতে তারা হলেন, উম্মাহাতুল মোমেনীন (মোমেন জননীগণ)।

হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়েরের সূত্রে জানা যায় যে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন। তাই হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আহলে বায়েতের অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন ঃ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط

অর্থাৎ 'তোমাদের গৃহে আল্লাহ পাকের যে আয়াত সমূহ এবং হেকমত পূর্ণ কথাবার্তা তেলাওয়াত করা হয় তা তোমরা স্মরণ কর'।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) এবং তাবেয়ীদের একটি দল, যাদের মধ্যে কাতাদা এবং মুজাহেদ (রঃ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন তাদের মত হল, আহলে বায়েত হলেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত হোসাইন (রাঃ), কেননা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কৃষ্ণ বর্ণের গরম চাঁদরে আবৃত অবস্থায় বাইরে তশরিফ নিয়ে গেলেন। এরই মধ্যে হাসান এবনে আলী (রাঃ) আসলেন। তাঁকে তিনি চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর হোসায়েন এবনে আলী (রাঃ) আসলেন, তাঁকেও তিনি চাদরে ঢেকে নিলেন, এরপর সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ) আসলেন, তাঁকেও তিনি চাঁদরে ঢুকিয়ে নিলেন, এরপর হযরত আলী (রাঃ) আসলেন, তাঁকেও চাদরে আবৃত করলেন। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত-

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

(আল্লাহ পাক তো শুধু তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করতে চান) তেলাওয়াত করলেন। (মুসলিম)

হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত-

نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَائَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ

নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) এবং হোসায়েন (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন, এরপর বললেন, 'হে আল্লাহ! এ হলো আমার আহলে বায়েত' (মুসলিম)।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন আলোচ্য আয়াত انما يريد নাযিল হলো তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) এবং হোসায়েন (রাঃ)-কে তলব করলেন এবং একটি কম্বলে তাঁদেরকে প্রবেশ করালেন এবং এরশাদ করলেন, 'হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বায়েত, তাদের থেকে ময়লা দূর করে দাও এবং পরিপূর্ণভাবে তাদেরকে পবিত্র কর'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) একথাও লিখেছেন, 'আহলে বায়েত' শব্দটির প্রয়োগ প্রধানত স্ত্রীদের সম্পর্কেই হয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততি বা অন্যান্যরা তাদের নিত্যসাথী হিসেবেই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত সারাকে সম্বোধন করে ফেরেশতাগণ বলেছিলেন,

اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ

'আল্লাহ পাকের আদেশের ব্যাপারে তোমার কি বিস্ময় হচ্ছে? হে আহলে বায়েত! তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত এবং বরকত হোক'।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত....اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ আমার কক্ষেই নাযিল হয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফাতেমা, আলী, হাসান এবং হোসায়েনকে ডেকে আনালেন এবং এরশাদ করলেন, 'এরাই আমার আহলে বায়েত'। আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমিও আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত', তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'কেন নয়? ইনশাআল্লাহ'! (বগভী)

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আহলে বায়েতের মধ্যে সকলেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

'আর তিনি তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে পবিত্র করতে চান'।

অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে দুনিয়াতে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখতে চান এবং আখেরাতে মাগফেরাত দান করতে চান।

মূলতঃ আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত সমূহে মোমেন-জননীগণকে বিশেষ কিছু কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, আর কোন কোন কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। গুনাহকে আবর্জনা এবং তাকওয়া পরহেযগারীকে পবিত্রতা আখ্যা দেয়া হয়েছে।

অতএব, যে মোত্তাকী, পরহেযগার সে এভাবে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে অজু করে, তার গুনাহ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়। আর পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে যায়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে মুসলিম বন্দা অজু করে, মুখমন্ডল ধৌত করে তার মুখমন্ডল থেকে পানির সাথে চোখের গুনাহও দূর হয়ে যায়।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى

'আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ এবং জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণে রাখ। আল্লাহ পাক অতীব সূক্ষ্নদর্শী, তিনি সব বিষয় অবগত'।

অর্থাৎ হে পয়গম্বর পত্নীগণ! তোমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে, তোমাদের গৃহেই রয়েছেন আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর তোমাদের গৃহেই আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। তোমরা তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং সর্বাবস্থায় তা স্মরণে রাখ। হেদায়েতের মূল উৎস হলো পবিত্র কোরআন, আর জ্ঞানের ভান্ডারও হলো পবিত্র কোরআন যা তোমাদের গৃহেই নাযিল হচ্ছে। তোমাদের এ সৌভাগ্যের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে তোমরা শোকর গুজার হও এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করতে থাক।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের اٰيٰتِ اللهِ শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হেকমত দ্বারা হাদীস শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ)-এর মতে, اٰيٰتِ اللهِ দ্বারা পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ এবং উপদেশ সমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ)-এর মতে, مَا يُتْلٰى দ্বারা পবিত্র কোরআন উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনকে স্মরণে রাখ, তার মধ্যে আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের উল্লেখ রয়েছে। আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তোমাদের গৃহ সমূহে অহরহ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী নাযিল হচ্ছে। এজন্যে দরবারে এলাহীতে তোমরা শোকর গুজার হও।

দ্বিতীয়তঃ ওহী অবতরণের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে কষ্ট হয় তা তোমরা স্বচক্ষে দেখ, ফলে তোমাদের ঈমান হয় সুদৃঢ় এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا

'আল্লাহ পাক অতীব সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব বিষয় অবগত'।

অর্থাৎ কোন্ কাজের কি হেকমত এবং কী তার রহস্য আর কে কোন্ কাজের যোগ্য এবং নবুওয়্যতের মহান দায়িত্ব কার প্রতি অর্পণ করা যায়, এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত। আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের মহিমা বুঝতে পারে এমন কে আছে! আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর নবুওয়্যতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রূপে পেশ করেছেন। তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী করে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছেন। আল্লাহ পাকের কোন কাজই অযৌক্তিক এবং অহেতুক নয়; বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজই হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। আর তিনি সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।[১]

সংক্ষিপ্ত কথা

এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই, সর্বপ্রথম উম্মাহাতুল মোমেনীনের ব্যাপারে এ মর্মে আয়াত নাযিল হয়েছেঃ

إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

'যদি তোমরা পার্থিব জীবন এবং এখানকার শোভা-সৌন্দর্য কামনা কর তবে এস, আমি তোমাদেরকে ভোগ করার মত কিছু দিয়ে দেই এবং ভদ্রভাবে তোমাদেরকে বিদায় করি'। কিন্তু যখন তাঁরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল এবং আখেরাতকে বেছে নেন তখন তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৭১-৭২

তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ আয়াতেই 'আহ্লুল বায়েত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহিয়সী স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উম্মাহাতুল মোমেনীনের কথাই রয়েছে। অতএব, এক্ষেত্রে নতুন কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-সঙ্গিনীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, কেননা একাধিক আয়াতে তাঁদের সম্বোধন করা হয়েছে।

হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, একখানি হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দিহান হয়ে পড়েছে, হাদীস খানি হলো, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত ইমাম হাসান এবং হোসায়েন (রাঃ)-কে একটি চাদরের মধ্যে রেখে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়েত', একথা দ্বারা কেউ কেউ ভ্রান্ত ধারণা করেছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত নন, অথচ এই হাদীসের অর্থ হলো হে আল্লাহ! এরাও আমার আহলে বায়েত, তাদেরকেও পবিত্র কর, তাদেরকেও আলোচ্য আয়াতে যে ফজিলতের কথা বলা হয়েছে তা দান কর। এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল শুধু স্ত্রীগণই আহলে বায়েত নন; বরং আলী, ফাতেমা এবং হাসান, হোসায়েনও আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যেই যখন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকেও আহলে বয়েতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন', তখন তিনি এরশাদ করেছেন, 'তুমি তো আছই'। অর্থাৎ তোমাকে চাদরাবৃত করার কোন প্রয়োজন নেই কেননা, তুমি তো প্রথম থেকেই আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছ, আর এ আয়াত সমূহ তোমাদের ব্যাপারেই নাযিল করা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯৫

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقٰنِتِينَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِينَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ
الْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِينَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَّ
الذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

তরজমা

(৩৫) নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিনী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, সবর অবলম্বনকারী পুরুষ ও সবর অবলম্বনকারী নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, লজ্জাস্থল রক্ষাকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক পরিমাণে স্মরণকারিনী নারী, তাদের জন্যে আল্লাহ পাক তৈরী করে রেখেছেন মাগফেরাত এবং মহা প্রতিদান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে উম্মাহাতুল মোমেনীনের সম্পর্কে বিশেষ সুসংবাদের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে সাধারণভাবে সুসংবাদ রয়েছে সমস্ত মুসলিম নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে, আল্লাহ পাক তাদেরকে মাগফেরাত দান করবেন এবং তাদের জন্যে অনেক নেয়ামত তৈরী করে রেখেছেন।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন কোন স্ত্রী তাঁর খেদমতে আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! পবিত্র কোরআনে পুরুষদের সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা রয়েছে, কিন্তু নারীদের সম্পর্কে কি এমন কোন ভাল কথা আছে? অথবা নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন কল্যাণই নেই। আমাদের আশঙ্কা হয়, হয়তো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমাদের কোন এবাদত কবুল হয় না, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

তেবরানী এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে যে, নারীদের একটি দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! পবিত্র কোরআনে ঈমানদার পুরুষদের কথা রয়েছে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে তো কোন কথা নেই, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে জরীর কাতাদার (রঃ) সূত্রেও একথা বর্ণনা করেছেন।

তিরমিজী হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)-এর কথার বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন যে, পবিত্র কোরআনের সব কিছু পুরুষদের ব্যাপারেই লক্ষ্য করছি, কিন্তু নারীদের ব্যাপারে ভাল কিছুর উল্লেখ নেই, এর কারণ অনুধাবন করতে পারছিনা, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) মোকাতেল (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া এবং হযরত আসিয়া বিনতে কা'ব আনসারীয়া হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের প্রতিপালক (পবিত্র কোরআনে) পুরুষদের উল্লেখ করেন কিন্তু নারীদের কোন উল্লেখ থাকেনা, আমরা আশঙ্কা করি যে, নারীদের মধ্যে হয়ত কোন কল্যাণ নেই, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

একথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা বিনতে হুমায়েস যখন তাঁর স্বামী হযরত জাফর এবনে আবু তালেবের সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং উম্মাহাতুল মোমেনীনের খেদমতে হাযির হলেন, তখন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পবিত্র কোরআনে আমাদের সম্পর্কে কোন কথা আছে কি? উম্মাহাতুল মোমেনীন জবাব দিলেন, না। তখন হযরত আসমা সঙ্গে সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! নারী সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের জীবন ব্যর্থ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? তিনি আরজ করলেন, যেভাবে পবিত্র কোরআনে পুরুষদের উল্লেখ করা হয়েছে, নারীদের কোন কল্যাণের কথা সেভাবে উল্লেখ করা হয় না, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেনঃ আহমদ, নেসায়ী, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে মরদবিয়া এবং তেবরানী হযরত উম্মে সালমার কথার উদ্ধৃতি

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৭২
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫০০-০১

দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলাম, যেভাবে পবিত্র কোরআনে পুরুষদের আলোচনা স্থান পেয়েছে, সেভাবে আমাদের নারীদের কথা দেখতে পাচ্ছিনা। একদিন আমি আমার ঘরে বসেছিলাম, হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে এ আয়াত তেলাওয়াত করছেন।[১]

এ পর্যায়ে আল্লামা আলুসী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে মহিলাদের একটি দল আগমন করলেন, তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! পুরুষদের ফজিলত ও মর্যাদা অধিকতর, তাঁরা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে পারেন। আমাদের জন্যে কি এমন আমল রয়েছে? যার কারণে আমরা জেহাদের সওয়াব পেতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمٰتِ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, পুরুষ হোক কী নারী,

وَالْقٰنِتِينَ وَالْقٰنِتٰتِ

যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের তাবেদার, পুরুষ হোক কী নারী,

وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ

যারা কথায় ও কাজে সত্য পরায়ণ, নারী হোক কী পুরুষ,

وَالصّٰبِرِينَ وَالصّٰبِرٰتِ

যারা (আল্লাহর রাহে) বিপদাপদে ধৈর্যধারণকারী এবং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, যারা যাবতীয় পাপাচার থেকে আত্মরক্ষাকারী, পুরুষ হোক কী নারী,

وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعٰتِ

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃঃ ২১৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃঃ ৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃঃ ৬

যারা বিনয়ী, পুরুষ হোক কী নারী,

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ

যারা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান খয়রাতকারী,

وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ

ফরজ ও নফল রোজাদার, পুরুষ হোক কী নারী,

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ

মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ থেকে নিজের লজ্জা-স্থানকে হেফাজতকারী, পুরুষ হোক কী নারী,

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ

আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ হোক কী নারী। আল্লাহ পাক তাদেরকে মাগফেরাত দান করবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বন্দা আল্লাহ পাকের অধিক পরিমাণে স্মরণকারীদের মধ্যে তখনই অন্তর্ভুক্ত হয় যখন সে দাঁড়ানো অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায়, এক কথায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাককে স্মরণ করে। এ ব্যাপারে কখনো গাফলত করেনা। এতদ্ব্যতীত, কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়না।

আল্লাহর স্মরণের মাহাত্ম

হযরত মা'আজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কোন্ মুজাহেদ সর্বাধিক সওয়াবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়? তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী, এরপর ঐ ব্যক্তি আরজ করলেন, কোন্ রোজাদার সবচেয়ে বেশী সওয়াবের অধিকারী?

তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী।

এরপর ঐ ব্যক্তি নামাজ, যাকাত এবং হজ্ব ও দান খয়রাতের কথা উল্লেখ করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ জবাবই দিলেন যে, আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী।

একথা শ্রবণ করে হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে আবু হাফস! আল্লাহ পাকের স্মরণকারী সার্বিক কল্যাণ লাভ করে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, 'অবশ্যই'। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের স্মরণকারীর মর্যাদা তখন অর্জন করা যায় যখন 'ফানায়ে ক্বলব' এর মর্যাদা হাসিল করা যায়। অর্থাৎ মানব মন যখন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকরে ডুবে থাকে, সর্বক্ষণ দরবারে এলাহীতে হাযির থাকার উপলব্ধি থাকে।

একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'এফরাদ ওয়ালাগণ অগ্রগামী হয়েছে'। আরজ করা হলো, 'এফরাদ ওয়ালা কারা'? তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী নারী পুরুষ'। (মুসলিম শরীফ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নাজাতদানকারী আল্লাহর জিকরের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'আল্লাহর রাহে জেহাদও নয়'?

তিনি এরশাদ করলেন, 'না' আল্লাহর রাহে জেহাদকারীও নয়, তবে জেহাদে যদি এত অধিক আত্মনিয়োগ করে যে তার তরবারী ভেঙ্গে যায় (এমন অবস্থায় মুজাহেদের মর্তবা বৃদ্ধি পাবে)।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হলো, 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে কোন্ বন্দা সর্বাধিক উত্তম এবং উচ্চ মর্তবার অধিকারী হবে'? তখন তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর রাহের মুজাহেদের চেয়ে বেশী? তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'যদি মুজাহেদ এত বেশী লড়াই করে যে তার তরবারী ভেঙ্গে যায় এবং সে রক্তাপ্লুত হয়। তবু আল্লাহ পাককে স্মরণকারীর মর্তবা অধিক হবে'।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে যারা গাফেল থাকে, তাদের মাঝে আল্লাহ পাককে স্মরণকারীর দৃষ্টান্ত হলো জেহাদ থেকে যারা পলায়নপর হয় তাদের পেছনে যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদরত থাকে তাদের ন্যায়। আর আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল লোকদের মধ্যে তাঁকে স্মরণকারী লোকদের দৃষ্টান্ত হলো শুষ্ক বৃক্ষে সবুজ ডালার ন্যায়। আর এমনিভাবে গাফেলদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারীর দৃষ্টান্ত হলো অন্ধকার কক্ষে

প্রদীপের ন্যায়। গাফেলদের মধ্যে যে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করে, তাকে দুনিয়াতেই তার জান্নাতের স্থান দেখিয়ে দেয়া হয়। আর গাফেল লোকদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারীর সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। আর তা যারা কথা বলে, আর যারা বলতে পারেনা তাদের সংখ্যার সমান লোককে মাফ করে দেয়া হয়। 'যারা কথা বলতে পারে' এর দ্বারা মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'যারা কথা বলতে পারেনা' তার দ্বারা চতুঃষ্পদ জন্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে আতা এবনে আবি রাবাহ্ বলেছেন, যে নিজের যাবতীয় কাজে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে, সে المسلمين والمسلمت। এর আওতায় এসে পড়ে। আর যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল, আর তাঁর দিল তার রসনার বিরোধী না হয় তবে সে المؤمنين والمؤمنت। এর তালিকাভুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি ফরজ সমূহে আল্লাহ্ পাকের অনুগত হয়, আর সুন্নতের ব্যাপারে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়, সে القنتين والقنتت। এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যে নিজেকে মিথ্যাবাদিতা থেকে রক্ষা করে, সে الصّدقين والصّدقت। এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যে আল্লাহ্ পাকের অনুগত থাকে এবং পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে সে الصّبرين والصّبرت। এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যে নামাজের মধ্যে এভাবে মনোনিবেশ করে যে তার ডান বামেরও খবর থাকেনা সে الخشعين والخشعت। এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যে সপ্তাহে এক দেরহাম সদকা খয়রাত করে সে المتصدقين والمتصدقت। এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যে প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ, পনের তারিখ রোযা রাখে সে الصائمين والصئمت। এর অন্তর্ভূক্ত হয়। আর যে নিজের চরিত্রের হেফাজত করে সে الحفظين والحفظت فروجهم। এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যে সঠিক ভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে সে الذّكرين الله كثيرا والذّكرت। এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের সম্পর্কেই পরবর্তী আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে,

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থাৎ তাদের দ্বারা যে সব গুনাহ হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তা থেকে মাগফেরাত দান করেন এবং তাদের জন্যে অনেক সওয়াব তৈরী করে রেখেছেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর যখন ঈমান সুদৃঢ় হয় আর ঈমান ও ইসলাম যখন একত্রিত হয়, তখন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের

১। তাফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৪-৭৫

প্রতি আনুগত্যের গুণ সৃষ্টি হয়। কথাবার্তায় সত্যবাদীতা আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয় বিবেচিত হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমনও লোক ছিলেন যে জাহেলিয়াতের যুগেও তারা অসত্য কথা বলেননি।

মূলতঃ সত্যবাদীতা হলো ঈমানের প্রমাণ, আর মিথ্যাবাদীতা হলো মুনাফেকীর আলামত। যে সত্যবাদী সে নাজাত পায়, অতএব, তোমরা সত্য কথা বল। সত্যবাদীতার গুণ অর্জন কর এবং মিথ্যাবাদীতা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা মিথ্যাবাদীতা মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, আর তা মানুষকে দোযখের দিকে নিয়ে যায়।[১]

সর্বাধিক কষ্টকর বিষয় হল সবর অবলম্বন তথা ধৈর্য ধারণ; চরম কষ্টের সময় সবর অবলম্বন অত্যন্ত কঠিন আর এজন্যে তার সওয়াবও অধিক। আলোচ্য আয়াতের 'খুশু' শব্দটির অর্থ হল পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা। আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে বিনীত হয়ে হাযির হওয়া।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, মানব মনের অবস্থা তখন এমন হয়, যখন মানব মনে আল্লাহ পাকের ভয়ের সঞ্চার হয় এবং মানুষ তার প্রতিপালককে সর্বদা তার সঙ্গে দেখতে পায়, আর এভাবে আল্লাহ্ পাকের এবাদত করে যেন সে আল্লাহ্ পাককে দেখছে, যদি তার মনের অবস্থা এমন নাও হয়, তবে কমপক্ষে এ বিশ্বাস তো অবশ্যই থাকবে যে আল্লাহ্ পাক তাকে দেখছেন।

আলোচ্য আয়াতে সদকার কথাও রয়েছে, যারা দুর্বল, দারিদ্র-প্রপীড়িত, যাদের কোন রোজগার নেই তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা। আর তা করতে হবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে এরশাদ হয়েছে, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন আরশের ছায়া তলে স্থান দেবেন, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। ঐ সাত প্রকার লোকের মধ্যে ঐ ব্যক্তিও রয়েছে, যে এত গোপনে সদকা দেয় যে তার ডান হাত কি দান করলো বাঁ হাত তার খবর রাখেনা। অন্য একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছে, সদকা ভুল-ত্রুটি তথা পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এভাবে রোজার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে হাদীস শরীফে যে রোযা হল শরীরের যাকাত অর্থাৎ রোজার কারণে মানুষের দেহ-মন পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র হয়, আর চরিত্রের মন্দ দিকগুলোকে দূরীভূত করে।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা ব্রত পালনের পাশাপাশি প্রতিমাসে তিনটি রোযা রাখে, সে الصَّائمين والصَّئمٰت। এর অন্তর্ভুক্ত হয়।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৬-১৭
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২২

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নর-নারী নির্বিশেষে সকলেই সৎ কাজের পুরস্কার লাভের ব্যাপারে সমান। ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন, এবাদত বন্দেগী, সততা, সত্যবাদীতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, দানশীলতা, রোযা ব্রত পালন করা, সংযম অভ্যাস করা, আল্লাহ পাকের স্মরণে মগ্ন হওয়া প্রভৃতি নেক আমল কারোই ব্যর্থ হয় না; বরং নারী পুরুষ উভয়ই এমনি সৎ কাজের যথাযোগ্য পুরস্কার পেয়ে থাকে। এসব সত্য-সাধনার দ্বার শুধু পুরুষের জন্যে নয়; বরং নারীদের জন্যেও সমভাবে উন্মুক্ত। অতএব, কোরআনে করীমে শুধু পুরুষদের কথা রয়েছে, নারীদের কথা নেই এমন ধারণা সঠিক নয়। এমনিভাবে, আলোচ্য আয়াত সমূহে শুধু মোমেন-জননীগণের কথাই রয়েছে এমনও নয়; বরং সমগ্র নারী সমাজ সম্পর্কেই পবিত্র কোরআন পথ-নির্দেশনা দিয়েছে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ
يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾ وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ
عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ
مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا
قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ
اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৬) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন, তখন কোন মোমেন পুরুষ বা নারীর সে সম্পর্কে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকেনা। যে কেউ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করে স্পষ্টত সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়।

(৩৭) আর আল্লাহ পাক যাকে নেয়ামত দান করেছেন এবং (হে রসূল!) আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, যখন আপনি তাকে বলছিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক"। (হে রসূল!) আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন রাখছিলেন আল্লাহ পাক তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আপনি লোক ভয় করছিলেন, অথচ ভয় করার অধিকতর হকদার আল্লাহ পাকই। এরপর যায়েদ যখন জয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে মোমেনদের পালকপুত্রগণ নিজেদের স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেই রমণীদেরকে বিবাহ করায় মোমেনদের কোন দোষ না হয়। আল্লাহ পাকের আদেশ মেনে চলতেই হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলিম নারী ও পুরুষদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনার পর তাদের উদ্দেশ্যে মাগফেরাতের ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে প্রকৃত মুসলমান হবার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কথা। যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের হাতে, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সমর্পণ করতে পারে সে-ই প্রকৃত মোমেন অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ সম্পূর্ণ আক্ষরিক ভাবে মেনে চলাই হলো মোমেন নারী পুরুষের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আত্মসমর্পণ করা প্রকৃত মোমেন হবার পূর্বশর্ত। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন আদেশ মানবো, আর কোন আদেশের ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করবো এ অবস্থা অনভিপ্রেত।

শানে নুযুল

এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত জয়নব (রাঃ) সম্পর্কে। হযরত যায়েদ (রাঃ) আরবের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবেই দুর্বত্ত ছেলেধরারা তাঁকে অপহরণ করে মক্কার বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে। ঘটনাক্রমে, হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে ক্রয় করে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাদেম হিসেবে নিয়োগ করেন, তিনিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করেন। কিছুদিন পর তাঁর পিতা, পিতৃব্য এবং পিতামহ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাযির হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'মুক্তিপণের কোন প্রয়োজনই নেই, যায়েদ যদি যেতে চায় আমার তাতে কোন আপত্তি নেই'।

তারা যায়েদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু যে পিতা, পিতামহের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানান তাই নয়; বরং তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকার জন্যে ক্রন্দন করতে থাকেন।

এ পরিস্থিতিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে সস্নেহে স্বীয় কোলে টেনে নেন এবং তাঁকে স্বাধীনতা দান করে পালক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে তাঁকে লোকেরা "যায়েদ এবনে মোহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পুত্র যায়েদ বলতে থাকে। তিনি এই হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কিছুদিন পর যখন পবিত্র কোরআনে পালক পুত্রদেরকে তাদের প্রকৃত পিতার নামে ডাকার নির্দেশ অবতীর্ণ হয় তখন থেকে তাঁকে যায়েদ এবনে হারেসা বা হারেসার পুত্র বলেই ডাকা হতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র হিসেবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ পাকের কালামে তাঁর নামোল্লেখের কারণেও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এমন সৌভাগ্য আর কারো হয়নি।

হযরত জয়নব (রাঃ) ছিলেন আবদুল মোত্তালেব তনয়া উমাইমার কন্যা, আরবের একজন সম্ভ্রান্ত অভিজাত মহিলা ছিলেন তিনি। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়া। যেহেতু হযরত যায়েদ (রাঃ) পিতা-পিতামহকে চিরতরে ত্যাগ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁকে আদর করে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও হযরত যায়েদ (রাঃ) কিছুদিনের জন্যে হলেও দাসত্বের কলংকে কলংকিত ছিলেন। এ কারণেই হযরত জয়নব (রাঃ) হযরত যায়েদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সংকোচ বোধ করেছিলেন। এ আপত্তি বা সংকোচ অস্বাভাবিকও নয়, তাই অতি স্বাভাবিক কারণেই হযরত জয়নব (রাঃ) এবং তাঁর ভ্রাতা এ বিয়েতে প্রথমতঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একান্ত ইচ্ছা ছিল হযরত জয়নব (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর বিবাহ হোক, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ

আল্লাহ পাক ও তার রসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার পর কোন ঈমানদারেরই তা মেনে নিতে কোন প্রকার আপত্তি করার অধিকার নেই, শুধু তাই নয়; বরং পরবর্তী আয়াতাংশে আরো কঠোর ভাষায় বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

'আর যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, সে অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় থাকবে'।

এ আয়াত নাযিল হবার পর হযরত জয়নব (রাঃ) এবং তাঁর ভ্রাতা বিয়েতে সম্মত হন। যথারীতি হযরত জয়নব (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত যায়েদের (রাঃ) বিবাহ সম্পন্ন হয়। কেননা, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই প্রকৃত মোমেনের কাজ। আর এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদের তরফ থেকে দশটি দিনার, ষাট দেরহাম, এক জোড়া পরিধেয় পোষাক, একটি চাদর, পঞ্চাশ কেজি খাদ্য দ্রব্য এবং প্রায় চার মন খেজুর দান করেছিলেন।[১]

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

'আর যাকে আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেছেন এবং (হে রসূল!) যাকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাকে আপনি বলেছিলেন, "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক"।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হযরত জয়নবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাযির হন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখ এবং আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মূলতঃ তাঁদের বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না, এমনি অবস্থায় হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত জয়নব (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে নালিশ নিয়ে আসতেন এবং হযরত জয়নব (রাঃ)-কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বুঝিয়ে বলতেন, 'দেখ, জয়নব একমাত্র আমার কথায়ই এ বিয়েতে সম্মত হয়েছে। এখন যদি তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও, তবে তার অবস্থা কি হবে তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পার'।

এভাবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে বুঝিয়ে তালাক প্রদান থেকে বিরত রাখতেন। কিন্তু তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৭৭

কলহ-দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। এতে করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন যে বিয়ে তো দু'দিনের ব্যাপার নয়; এমন সময় আসতে পারে যে, যায়েদ জয়নবকে তালাক দিয়ে দিতে পারে। এ অবস্থায় জয়নব একথাই চিন্তা করবে যে, আমিই তাকে জোর করে যায়েদের নিকট বিয়ে দিয়েছি এবং যদি তা না হতো তবে সে এ অপমানের সম্মুখীন হতো না। তদুপরি সে যখন নারী তখন তাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিতেই হবে। আর ঐ বিয়ে হবে তখন আরো জটিলতর। এমন অবস্থায় জয়নবের দুঃখ-দুর্দশা নিরসন-কল্পে একটি পথই রয়েছে, তা হলো স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি তাকে বিয়ে করেন তবে তার সকল দুঃখ মোচন হতে পারে। কিন্তু এ পথেও বাধা ছিল। লোক-নিন্দার বাধা, হযরত যায়েদ (রাঃ) ছিলেন তাঁর পালক পুত্র, দুশমনরা বলবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ ছিলেন আসলে পালক পুত্র, প্রকৃত পুত্র নয়। কিন্তু তদানীন্তন আরবদের সমাজ জীবনে পালক পুত্রকেও প্রকৃত পুত্রের মত মনে করা হতো। এ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাই জয়নবের দুঃখ নিবারণের জন্যে এ পথ অবলম্বনেও অসুবিধা ছিল। পরবর্তী বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে এদিকে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ

'হে নবী! আপনি যে কথা আপনার অন্তরে গোপন রেখেছিলেন, আল্লাহ পাক তা প্রকাশ করতে চান, অর্থাৎ পুত্রবধূকে বিবাহ সম্পর্কে যে সংকোচ এবং লোক নিন্দার ভয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে ছিল, তা তিনি প্রকাশ করছিলেন না, এদিকে আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে, যায়েদ অবশেষে জয়নবকে তালাক দেবে এবং জয়নব হবে আপনার স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত যায়েদ হযরত জয়নব (রাঃ)-কে তালাক দিয়ে দিলেন। ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণার্থে স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত জয়নব (রাঃ)-এর বিয়ের ঘোষণা দেন পবিত্র কোরআনে, এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا

'এরপর যায়েদ যখন জয়নবের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে (হে রসূল!) আপনার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম'।

হযরত জয়নবের (রাঃ) গৌরব

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জয়নব (রাঃ) অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীনের নিকট এই বলে গৌরব করতেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা আত্মীয়-স্বজনরাই করেছেন, আর আমার বিয়ের ব্যবস্থা সাত আসমানের উপর থেকে স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জয়নব (রাঃ) একথাও বলতেন, বিয়ের ব্যাপারে আমার অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। আর তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক হলেন আত্মীয়-স্বজন।

আল্লামা বগভী (রঃ) শা'বী (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত জয়নব (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতেন, আপনার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আর কারো নেই।

(১) আমার এবং আপনার দাদা একজন ছিলেন।

(২) আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ পাক আসমানে করেছেন।

(৩) আমার বিয়েতে পয়গাম বাহক ছিলেন জীব্রাঈল (আঃ)।[১]

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, এ বিবরণের পর পূর্ববর্তী আয়াতের দু'টি বাক্যের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَااللّٰهُ مُبْدِيْهِ

'(হে রসূল!) আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন রাখছিলেন, আল্লাহ্ পাক তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন'।

অর্থাৎ পালক পুত্রের বধূর সঙ্গে বিয়ে সংক্রান্ত যে সংকোচ তাঁর অন্তরে ছিল, বিশেষতঃ ঐ সময়কার আরব সমাজে এক্ষেত্রে লোক নিন্দার যে আশঙ্কা ছিল, তা তিনি গোপন করছিলেন, আর এ গোপন করার কারণও ছিল উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া, তিনি আশঙ্কা করছিলেন এই বিয়ের কথা প্রকাশ করলে কেউ যদি কোন প্রকার বিরূপ মন্তব্য করে, তবে সে অত্যন্ত বড় গুনাহ্গার হবে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাই হযরত জয়নবের সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিয়ের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে দিয়েছেন। পরবর্তী বাক্যে বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৮২

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ

'(হে রসূল!) আপনি লোক নিন্দার ভয় করছেন, অথচ আল্লাহ পাককে ভয় করাই অধিকতর সমুচিত'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انی اخشاکم واتقاکم

(আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে অধিকতর ভয় করি) অতএব, আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই নয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় কম ছিল, বরং যেহেতু আল্লাহ পাক পূর্বেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, জয়নব অবশেষে আপনার স্ত্রী হবে, এখন তিনি কিভাবে আল্লাহ পাকের মর্জির কথা প্রকাশ করবেন, তাই ছিল তাঁর সমস্যা। কেননা, আরববাসী সেকালে পালক পুত্রকেও প্রকৃত পুত্রের মর্যাদা দিত, আর এ কুসংস্কার দূরীভূত করাই ছিল এ ঘটনার মূল উদ্দেশ্য।

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ

'যাতে পালক পুত্রগণ তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেই রমণীদেরকে বিবাহ করায় মোমেনদের কোন দোষ না হয়'।

اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

'যখন পালক পুত্রগণ তাদের থেকে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়, তথা তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয়'। এ অবস্থায় তাদেরকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই।

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

'আর আল্লাহ পাকের আদেশ মেনে চলতেই হয়' তথা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েই থাকে।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের দ্বীনের প্রচারে, প্রতিষ্ঠায় এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে কাউকে ভয় করার প্রশ্নই ওঠেনা, ইতোপূর্বে যত নবী রসূল পৃথিবীতে প্রেরীত হয়েছেন, তাঁরা কখনো আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের প্রচারে কাউকে পরোয়া করেননি। (হে রসূল!) আপনিও ইতোপূর্বে আল্লাহ পাকের সকল

আদেশ নিঃশঙ্কচিত্তে পালন করেছেন এবং আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের প্রচারে কখনো কারো পরোয়া করেননি। অতএব, এ ব্যাপারেও সংকোচ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা যায়েদ আপনার পালক-পুত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়; সে আদৌ আপনার ঔরষজাত পুত্র নয়, তাই তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা আপনার জন্যে কোন অবস্থাতেই নিন্দনীয় নয়।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য তা হলো যায়েদ এবনে হারেসা এবং জয়নবের বিয়ে অবশেষে টিকবেনা একথা জানা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে এ বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এর একমাত্র কারণ ছিল ইসলামের একটি নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আর তা হলো ইসলাম মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য বা পার্থক্য বরদাশত করেনা, ইসলামে বংশীয় মর্যাদা এবং কৌলিন্যের কোন গুরুত্ব নেই, পৃথিবীর সকল মানুষ মানুষ হিসেবে সমান, তবে তাকওয়া পরহেযগারীর মানদন্ডে সম্মান এবং মর্যাদায় পার্থক্য করা হয়, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

'তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার, সে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত'।

ইসলামের এ সাম্য নীতি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই অভিজাত গৃহের জয়নবের সঙ্গে যায়েদ এবনে হারেসার বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বনিবনা হলোনা, হযরত যায়েদ হযরত জয়নবকে তালাক দিলেন এবং এরপর যথারীতি ইদ্দতের সময় শেষ হবার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন হযরত জয়নব (রাঃ)। আর এ গৌরব তাঁকে দান করেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। আসমানের ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত জয়নবের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

'আর আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েই থাকে'।

এভাবে বর্বরতার যুগের একটি কুসংস্কার দূরীভূত হলো, অর্থাৎ পালক পুত্রকে প্রকৃত পুত্র মনে করার কোন হেতু নেই, আর পালক পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করাও অবৈধ নয়।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ পছন্দ করেনা, সবাই আল্লাহ পাকের বন্দা, সমস্ত মানুষ আদম সন্তান, তাই সকলেই সমান, পার্থক্য হবে শুধু তাকওয়া পরহেযগারীর ভিত্তিতে, বংশ বা সম্পদের ভিত্তিতে নয়।

এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়ের প্রতি 'সেলায়ে রেহমী' বা আত্মীয়তার হক্ব আদায়ের একটি ব্যবস্থাও হয়েছে এ বিয়ের মাধ্যমে।[১]

কেননা, হযরত জয়নব (রাঃ) ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়া।

হযরত যায়েদের বিশেষ গৌরব

ইমাম আবুল কাসেম মোহায়মী (রহঃ) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে একটি তথ্য সংযোজন করেছেন যে, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে যায়েদ এবনে হারেসার নাম সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন, অথচ সর্বাধিক সম্মানিত সাহাবী হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নাম পর্যন্ত উলেখ করেননি, এর কারণ এই যে হযরত যায়েদ ছিলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র। এজন্যে তাঁকে যায়েদ এবনে মোহাম্মদ বলা হত আর এটি ছিল তাঁর জন্যে একটি বিরাট গৌরবের বিষয়। কিন্তু যখন ادعـواهم لآباءهم (লোকদেরকে তাদের পিতার নামে ডাক)-এ আদেশ জারি হলো তখন হযরত যায়েদ এবনে মোহাম্মদের স্থলে যায়েদ এবনে হারেসা নামে ডাকা হতো। এ কারণে তাঁর মন কত বেশী আহত হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, এ কারণেই পবিত্র কোরআনে তাঁর নাম উল্লেখ করে তাঁকে এমন মর্যাদা দান করেছেন, যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করেননি, এটি শুধু তাঁর বৈশিষ্ট্য।

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার বিখ্যাত সাহাবী উবাই এবনে কা'বকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে এ সূরা পাঠ করে শুনিয়ে দেই, তখন উবাই এবনে কা'ব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আল্লাহ পাক কি আমার নাম উল্লেখ করেছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) অতি আনন্দে ক্রন্দন করতে লাগলেন, এর দ্বারা এ বিষয়ে ধারণা করা যায় যে যায়েদ এবনে হারেসার নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হওয়ার কারণে তিনি কত খুশী হয়েছিলেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে তেলাওয়াত করা হবে এবং জান্নাতবাসীগণও তেলাওয়াত করবেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫০৫-০৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৮২
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২৬
ফাওয়ায়েদে ওসমানী পারা-২২, পৃষ্ঠা-৫৪৯

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ
اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾
الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا
اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ
وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَ
سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৩৮) আল্লাহ পাক যা স্থির করে দিয়েছেন, তা করতে নবীর পক্ষে দোষের কিছুই নেই। ইতোপূর্বে যে নবীগণ অতীত হয়ে গিয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহ পাকের বিধান। আর আল্লাহ পাকের বিধান সুনির্ধারিত, স্থিরকৃত।

(৩৯) তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করতো এবং আল্লাহ পাককে ভয় করতো এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতো না। আর হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

(৪০) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষেরই পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

(৪১) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে।

(৪২) এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁরই তসবীহ পাঠ কর (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর)।

(৪৩) তিনি তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন, আর তাঁর ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্যে দোয়া করে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়নের লক্ষ্যে। আর তিনি মোমেনদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

তফসীরুল কোরআন

মুনাফেকরা সর্বদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো, এর পাশাপাশি ইহুদীরাও তাতে ইন্ধন যোগাতো। এক কথায় মুনাফেক ও ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় যৌথভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। হযরত জয়নব (রাঃ)-এর সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাদী মোবারক ছিল আল্লাহ পাকের মর্জির বহিঃপ্রকাশ, এটি ছিল সম্পূর্ণ তকদীরি বিষয় তথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়। কিন্তু মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র এবং কটুক্তির আশঙ্কা ছিল বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা প্রকাশে সংকোচ বোধ করছিলেন, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা স্থির করে দিয়েছেন, তা করতে নবীর পক্ষে দোষের কিছুই নেই। আর এটি নতুন কিছু নয়, বরং ইতোপূর্বেও নবীগণের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের এ বিধান কার্যকর ছিল।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا

পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এটি ছিল আল্লাহ পাকের বিধান। আর আল্লাহ পাকের বিধান সুনির্ধারিত স্থিরকৃত, তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, যেহেতু মুনাফেকরা একথা বলে বেড়াতো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন, তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে পালক পুত্রের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর বিয়ে করায় আমার নবীর কোন দোষ হয়নি। কেননা এটি আল্লাহ পাকের মর্জির ব্যাপার, সমাজের কুসংস্কার দূর করার লক্ষ্যে এটি আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা আর আল্লাহ পাক যা চান তাই হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতের "সুন্নাতুল্লাহ" শব্দটির ব্যাখ্যা হল বিয়ের প্রথা, কেননা এটি নবী রসূলগণের সুন্নত। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা অধিক সংখ্যক স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনেক স্ত্রী ছিলেন।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-১২
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৮৩

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسٰلٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ

'যারা আল্লাহ পাকের হুকুম (মানুষের নিকট) পৌঁছিয়ে থাকে এবং আল্লাহকে ভয় করে, আর আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেনা'।

অর্থাৎ পয়গম্বরগণের প্রধান দায়িত্ব হল আল্লাহ পাকের মহান বাণী মানুষের নিকট পৌঁছানো, আর তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা শুধু আল্লাহকে ভয় করেন, শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেন না। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ পাকের মহান বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে কোন জাগতিক শক্তিকে তাঁরা ভয় করেন না, তাঁরা কখনও সত্যকে গোপন করেন না। চরম বিপদের মোকাবেলা করেও সত্যের উপর অটল অবিচল থাকেন, কেননা তাঁদের নিকট আল্লাহ পাকের আমানত থাকে, সে আমানত তাঁরা সঠিকভাবে আদায় করেন। এ ব্যাপারে শীর্ষস্থান হল নবী রসূলগণের দলপতি সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। কেননা অন্যান্য নবীগণ তাঁদের জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন, আর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোন জাতির নিকট নয়; বরং তিনি সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য নবীগণ তাঁদের যুগের লোকদের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। এজন্যেই সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার না করে তিনি ক্ষান্ত হননি। সুদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় দ্বীন ইসলামের প্রচার করেন, কাফেরদের হাতে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেন। কিন্তু তাঁর প্রতি অর্পিত রেসালতের মহান দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। যখন কাফেরদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি আল্লাহ পাকের হুকুমে মদীনা শরীফে হিজরত করেন। এখানে এসেও কাফেররা তাঁকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। দশ বছরে তাঁকে ৮৩টি যুদ্ধ করতে হয়েছে। তন্মধ্যে ২৭টিতে তিনি নিজেই ছিলেন সেনাপতি। এভাবে পৃথিবীতে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে যখন মক্কাবাসীর সঙ্গে হোদায়বিয়া নামক স্থানে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তদানীন্তন বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র প্রধানের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছিয়ে দেন। এরই মধ্যে তিনি তাঁর ১,৩০,০০০ সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারের প্রশিক্ষণ দান করেন। তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শিখেছিলেন,

সবই সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর যাবতীয় কথাবার্তা, তাঁর কার্যাবলীর বিবরণ, তাঁর দিন রাতের অবস্থা, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের বিবরণ তাঁরা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছিয়েছেন। এভাবে তাঁদের পর তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, আউলিয়ায়ে কেরাম, ওলামায়ে কেরাম তবলীগের তথা আল্লাহ পাকের মহান বাণীর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। হক্কানী ওলামায়ে কেরাম আজ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালনে রত রয়েছেন, আর এ দায়িত্ব পালনে তাঁরা জাগতিক কোন শক্তিকে ভয় করেননি।

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, তোমাদের কেউ যেন নিজেকে অপমানিত না করে। লোকেরা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তা কেমন করে হয়? তিনি এরশাদ করলেন, 'শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখেও যে লোক ভয়ে নীরব থাকে কেয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন নীরব ছিল? সে বলবে মানুষের ভয়ে। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, সবচেয়ে বেশী ভয় করার যোগ্য হলো আমার পবিত্র সত্ত্বা'।[১]

وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

'আর হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট'।

অতএব, আল্লাহ পাককে ভয় করা একান্ত জরুরী, কেননা প্রত্যেকটি মানুষকে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই জবাবদেহী করতে হবে। অথবা এর অর্থ হল, আল্লাহ পাক সর্ব প্রকার ভয়ের জন্যে যথেষ্ট। অতএব, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় করা উচিত নয়।

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাককে সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। কেননা, এ ভয়ের ভিত্তি হল মা'রেফাত। যে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত যত বেশী হাসিল করেছে সে আল্লাহ পাককে ততবেশী ভয় করেছে। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا اعلمكم الله واخشاكم

'আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ পাক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত, আর আমি তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি'। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-১২

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থাৎ 'আল্লাহর বন্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহ পাককে ভয় করে'।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে মানব মনে আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি হয় তাঁর ব্যাপারে এলমের ভিত্তিতে অর্থাৎ যে যত বেশী আল্লাহ পাক সম্পর্কে অবগত, সে আল্লাহ পাককে ততবেশী ভয় করে। শুধু তাই নয়, বরং একথাও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

'আর তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেনা'।

বস্তুতঃ যার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় জাগ্রত হয় তার আর কোন কিছুকে ভয় করার প্রয়োজন হয়না, আল্লাহ পাকের ভয়ই যথেষ্ট হয়। আর যারা আল্লাহকে ভয় করেনা, তারা পৃথিবীর অনেক কিছুকেই ভয় করে। যেহেতু আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, জয়নব অবশেষে আপনার স্ত্রী হবে। কিন্তু তা প্রচারের কোন আদেশ আল্লাহ পাক দান করেননি, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা প্রচারও করেননি আর এর প্রচারে তিনি লজ্জাবোধ করছিলেন। অথবা দুবৃত্ত কাফের ও মুনাফেকদের কটুক্তির আশঙ্কা করছিলেন, কিন্তু যখন স্বয়ং আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে এ শাদী মোবারক সুসম্পন্ন করেন এবং زوجنكها এর ঘোষণা করেন তখন স্বাভাবিক ভাবে এ বিষয়ের প্রচার হয়। আর এটিই হল وتخشى الناس "(হে রসূল!) আপনি মানুষকে ভয় করেন"? কথাটির তাৎপর্য।

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বর্ণনা করেন, ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) এবং তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط

'মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষেরই পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী'।

যে সব মুনাফেক এ অপবাদ দিয়েছে যে, "মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন" একথাটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট,

১। ফতহুল বারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪০৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫০৬-০৭

অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন তারই ঘোষণা রয়েছে এ আয়াতে। এ আয়াতের শুরুতে এ ঘোষণা রয়েছে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষেরই পিতা নন- অতএব, তোমাদের ঐ কথা সম্পর্ণ মিথ্যা। হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর ঘরে তাঁর তিন পুত্রের জন্ম হয়, কাসেম, তাইয়্যেব, তাহের। অতি শৈশবেই তাদের সকলের মৃত্যু হয়। এমনিভাবে হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)-এর ঘরে এক শিশু সন্তানের জন্ম হয়, তাঁর নাম ছিল ইব্রাহীম। তিনিও দুগ্ধপানের বয়সে ইন্তেকাল করেন। অতএব, তারা কেউ সাবালক অবস্থাতেই পৌঁছেননি, যাকে পুরুষ বলা যায়। এজন্যে এরশাদ হয়েছেঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

'মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন'। অতএব, মুনাফেকদের উত্থাপিত অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা, বানোয়াট।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

'বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী'।

খাতেমুন নাবিয়্যীন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু নবী নন; বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কেউ নবী হবে না, হযরত মূসা (আঃ)-ও যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে তিনিও আমার অনুকরণ করতে বাধ্য হতেন। নবুওয়্যতের চির সমাপ্তি সত্ত্বেও নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবীদার দজ্জালরা আসবে। বনী ইসরাঈলদের পয়গম্বরগণই তাদের পরিচালনা করতেন, তাদের একজনের অবর্তমানে আরেকজন আসতেন, কিন্তু আমার পরে আর কেউ নবী হবে না; অবশ্য খলিফা জন্ম গ্রহণ করবে'। (বোখারী)

'আমার দৃষ্টান্ত ঠিক তেমনই, যেমন কোন ব্যক্তি একটি ইমারত নির্মাণ করে, লোকদেরকে দেখার জন্য আহবান করে, সবাই তার প্রশংসা করে বলে, ঐ যে একটি ইটের ফাঁক রয়েছে তা হলেই ইমারতটি পূর্ণ সুন্দর হয়ে যায়, আমি সেই শেষের ইটটির ন্যায়, আমার দ্বারাই নবুওয়্যতের ইমারত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে'। (বোখারী)

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল, কোরআনে করীমের এ ঘোষণার দ্বারা একথা চির সত্য হিসেবে প্রমাণিত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই শেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আসার সম্ভাবনা নেই এবং এর কোন প্রয়োজনও নেই।

হযরত ঈসা (আঃ) শেষ যমানায় আগমন করবেন তবে নবী হিসেবে নয়; প্রাক্তন নবী এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতভুক্ত হবেন, কেননা তিনি এজন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করেছিলেন।[১]

খতমে নবুওয়্যত সম্পর্কীয় হাদীসের বর্ণনাকারীদের ফিরিস্তি অনেক সুদীর্ঘ।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ সম্পর্কে যে সব বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরামের নামোল্লেখ করেছেন তারা হলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ), হযরত হোযায়ফাতুল ইয়ামান (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), হযরত আবু হাজেম (রাঃ), হযরত যোবায়ের এবনে মুতয়েম (রাঃ), হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত সাওবান (রাঃ), হযরত ওবাদাতুস সামেত (রাঃ), হযরত এরবাজ এবনে সারিয়া (রাঃ), হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ), হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) সহ আরও অনেক সাহাবায়ে কেরাম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক আমাকে অন্যান্য নবীগণের উপর ছয়টি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন (১) জামে কালেমাত, (২) আল্লাহ পাক আমাকে এভাবে সাহায্য করেছেন যে, দুশমনদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (৩) গণিমতের মাল (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) আমার জন্যে হালাল করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে কারো জন্যে হালাল ছিলনা, (৪) জমিনকে আমার জন্যে সেজদার স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন, (৫) আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে নবী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে, বিশেষ কোন জাতির জন্যে নয়, (৬) আমি খাতেমুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী, আমার দ্বারাই নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

হযরত যোবায়ের এবনে মুতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ '(আমার বহু নাম রয়েছে) আমি মোহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী (আমি কুফর ধ্বংসকারী), আমি হাশের, আমি আকিব (আমি সকলের শেষে আগমনকারী), আমার পরে আর কোন নবী নেই। আমি জানি দোযখের দারোগা কতজন, আরশ বহনকারী কতজন, আমার সঙ্গে আমার উম্মতের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, যতক্ষণ আমি তোমাদের মাঝে

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৮-১৩১

রয়েছি আমার কথা শ্রবণ কর এবং মেনে চল, আর যখন আমি বিদায় হয়ে যাই, তখন আল্লাহর কেতাব (কোরআনে করীমকে) আঁকড়ে ধর'। (মসনদে আহমদ) কোন কোন কে'রাত বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতের خاتم শব্দটি ت এর উপর فتح বা জবর পাঠ করেছেন, যার অর্থ হলো "সীলমোহর"। অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে নবুওয়্যতের উপর সীলমোহর পড়ে গেছে। তাঁর পর নবুওয়্যতের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ ও বন্ধ। তাঁর পরে আর কোন নবী আসতে পারবেনা। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ নবুওয়্যতের দাবী করে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব হোক বা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী, তবে তারা মিথ্যুক প্রমাণিত হবে। আর যদি ت ক্ষরটির নীচে যের পড়া হয় তবে এর অর্থ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই হলেন নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তিকারী। যাহোক 'খাতেম' শব্দটি যেভাবেই পাঠ করা হোক তার অর্থ একই, অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই হলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তাঁর পরেও যদি কেউ নবুওয়্যতের দাবী করে তবে সে হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়ত পূর্ণ পরিণত, সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে প্রযোজ্য, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত। নবুওয়্যতের যাবতীয় গুণাবলী তাঁরই মাঝে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। আল্লাহ পাক তাঁকে দ্বীনে কামেল তথা পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করেছেন। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এ পরিপূর্ণতার ঘোষণা।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থাৎ খাতেমুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী হওয়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ ফজিলত এবং বৈশিষ্ট্য। কেয়ামত পর্যন্ত এখন আর কোন ব্যক্তিকে নবুওয়্যত প্রদান করা হবেনা। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত শরীয়ত পরিপূর্ণ, শুধু তাই নয়; বরং এর মাধ্যমে পূর্বকালের সকল শরীয়ত বাতিল ঘোষিত, এখন হেদায়েত শুধুমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই, আর কারো নয়। এমনকি, এখন যদি কোন সাবেক নবীও আগমন করেন তবে তাঁকেও অনুসরণ করতে হবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের, একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل

'আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের ন্যায়'।

একথার তাৎপর্য হলো, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরে আর কোন নবীর আগমন হবেনা, তাই এ উম্মতের ওলামায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের নবীগণের ন্যায় দ্বীন ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করবেন। বিগত চোদ্দশ' বছরের ইতিহাস একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরাম তাঁর দ্বীন প্রচারেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের পর তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদ্বীন, সালফে ছালেহীন, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে উম্মত যুগে যুগে যত্ন সহকারে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন, আর কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ আমিই শেষ নবী, আমার পরে কেউ নবী হবে না। আজ যদি মূসাও (আঃ) জীবিত থাকতেন, তিনিও আমার অনুসরণ করতে বাধ্য হতেন। যাহোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই সর্বশেষ নবী, তিনিই খাতেমুন নাবিয়্যীন, একথাই চিরসত্য, কোরআন ও হাদীস দ্বারা এ সত্যই প্রমাণিত, আর এটিই সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সর্বসম্মত আকীদা বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় প্রত্যয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবীদার হয়েছে, তারা মিথ্যাবাদী বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তারা সাধারণ মানুষের মর্যাদাও হারিয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা কাফের। আর যারা তাদের অনুসরণ করেছে, তারাও কাফের হয়েছে। এটিই উম্মতের সমস্ত ওলামায়ে কেরামের সর্ববাদী সম্মত অভিমত। এমনকি, ইমাম আবুহানিফা (রঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন মিথ্যা নবীর সত্য-মিথা যাচাই করতেও যায়, তবে সে-ও কাফের হয়ে যাবে।

অতএব, মুসায়লামাতুল কাজ্জাব থেকে শুধু করে কুখ্যাত গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী পর্যন্ত যে কেউ নবুওয়্যতের মিথ্যাদাবী করেছে সবই ভন্ড, মিথ্যাবাদী, প্রতারক এবং কাফের এবং এরপরও যদি কেউ এমন মিথ্যা দাবী করে তবে সেও ভন্ড এবং কাফের বলেই পরিগণিত হবে।

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

'আর আল্লাহ পাক সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত যে, কে সর্বশেষ নবী হতে পারেন, আর কে নয়। আর এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

খত্‌মে নবুওয়্যতের তাৎপর্য

মওলানা রুমী (রঃ) 'খাতেমুন নাবিয়্যীন' এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন, নবুওয়্যতের যাবতীয় গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য সমূহ পরিপূর্ণভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছিল। লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কেরামের যত গুণ, যত বৈশিষ্ট্য ছিল, তার সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাঝে এমনকি, তাঁদেরকে যত মোযেজা প্রদান করা হয়েছিল, তার সবই দান করা হয়েছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং তার চেয়ে বাড়তি অনেক কিছুও তাঁকে দান করা হয়েছিল। মাওলানা রুমীর ভাষায় ঃ

حسن یوسف دم عیسی ید بیضاء داری
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

'হযরত ইউসুফের সৌন্দর্য, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ফুঁক দেয়া, হযরত মূসা (আঃ)-এর শুভ্র হাত, এক কথায় সমস্ত নবী রসূলগণের মধ্যে যত গুণাবলী ছিল, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাক আপনাকে তার সবই দান করেছেন'।

এর তাৎপর্য হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সবদিক থেকেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, অর্থাৎ শুধু যে তিনি সবার শেষে এসেছেন, সময়ের দিক থেকে তিনি সর্বশেষ নবী তাই নয়; বরং নবুওয়্যতের যাবতীয় গুণাবলীও তাঁরই মাঝে এসে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। এর কোন কিছুই আর অবশিষ্ট রয়নি। এজন্যে তাঁর দ্বীন পরিপূর্ণ, আর যা পরিপূর্ণ তাই উত্তম। অতএব তাঁর দ্বীন সর্বোত্তম। অন্য নবী রসূলগণের ইন্তেকালের পর তাঁদের নবুওয়্যত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর নবুওয়্যত শেষ হয়নি; বরং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুওয়্যতই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ অর্থেও তাঁর নবুওয়্যত পরিপূর্ণ। আর এজন্যে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর হেদায়েত তথা আদর্শ সার্বজনীন। সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে তাঁর হেদায়েত যথেষ্ট। ওলামায়ে কেরাম তাঁর মহান আদর্শের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করবেন। তাঁর নবুওয়্যতের কোন উত্তরাধিকারী নেই। ওলামায়ে কেরাম তাঁর এলমের উত্তরাধিকারী, এজন্যে তাঁর পর আর কারো নবী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

হযরত মওলানা কাসেম নানুতবী (রঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী-এর দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ যেহেতু তিনি সবার শেষে এসেছেন, তাঁর পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন হবেনা, তাই তিনি সর্বশেষ নবী। দ্বিতীয়তঃ নবুওয়্যতের যত মর্যাদা এবং স্তর রয়েছে, নবুওয়্যতের যে বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী রয়েছে, তা সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাঝে, তাই তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

শুধু তাই নয়; বরং সব দিক থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ন্যায় তিনি শুধু একজন নবী ও রসূল নন; বরং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক প্রিয়নবী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। এ পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য,

১. হাদীসে কুদসীতে রয়েছে,

وان كنت اصطفيت ادم فقد ختمت بك الانبياء
وما خلقت خلقا اكرم منك على

'যদিও আমি আদমকে (আঃ) 'ছফিউল্লাহ' করেছি কিন্তু আপনাকে 'খাতেমুন নাবিয়্যীন' উপাধি দিয়েছি'।

'আর আমি এমন কোন কিছু সৃষ্টি করিনি যা আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিকতর প্রিয়'।

২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু উম্মতেরই নবী নন; বরং অন্য নবীগণের উপরও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ রয়েছে, অন্য নবীগণের নিকট থেকে আল্লাহ পাক এর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ........

'আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ পাক নবীগণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, 'আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি, কিতাব হোক বা হেকমত, এরপর তোমাদের নিকট যদি এমন কোন রসূল আসেন যিনি তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যায়ন করেন, তবে তোমরা তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে'।

যেমন শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন এবং আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেন।

৩. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলই নন; বরং তিনি অন্য নবীগণের ইমাম। শবে মে'রাজে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বয়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যান। সেখানে পূর্বাহ্নেই হযরত আদম (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকলেই তাঁর জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন। হাদীসের ভাষায়ঃ

ثم دخلت بيت المقدس فجمع لى الانبياء فقدمنى جبرئيل حتى امتهم

'এরপর আমি বয়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করেছি, আমার জন্যে সকল নবী রসূলগণকে একত্রিত করা হয়েছে, এরপর জিব্রাঈল আমাকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি নবী রসূলগণের ইমামতি করেছি'।

৪. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু যে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল তাই নয়; বরং তাঁর কারণেই সমগ্র বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছে ঃ

فلولا محمد ما خلقت أدم ولا الجنة ولا النار

'যদি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টির পরিকল্পনা না থাকত, তবে আমি আদমকেও সৃষ্টি করতাম না এবং জান্নাত ও দোযখও সৃষ্টি করা হতো না'। (মুসতাদরাক)

৫. সৃষ্টির প্রথম দিন যখন স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই'?

قَالُوْا بَلٰى

'তারা বলেছিল হ্যাঁ অবশ্যই'।

সেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন, আর অন্যান্য নবীগণ তাঁর অনুসরণ করেছিলেন এবং আল্লাহ পাকের কথার জবাব প্রদানের ব্যাপারে সমগ্র মানব জাতির নেতৃত্ব তিনিই গ্রহণ করেছিলেন।

৬. ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের দিন যখন মানুষকে কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানে হাযির হতে হবে, তখন সর্ব প্রথম যিনি কবর থেকে বের হবেন তিনিও আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

انا اول من تنشق عنه الارض

'আমিই সে ব্যক্তি যার কবরের মাটি সর্ব প্রথম ফেটে যাবে, অর্থাৎ সর্বপ্রথম কবর থেকে আমিই উঠবো, এমনিভাবে কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমাকেই ডাকা হবে'।

انا اول من يؤذن له بالسجود

'আর কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমাকেই সেজদা প্রদানের অনুমতি দেয়া হবে'।

انا اول من يرفع رأسه فانظر الى بين يدى فيقال يا محمد ارفع راء سك سل تعط واشفع تشفع

'আমিই সর্বপ্রথম সে ব্যক্তি যাকে সেজদা থেকে মাথা তুলবার অনুমতি দেয়া হবে এবং তখন আমি আমার সম্মুখের দিকে তাকাব'।

'আমাকে বলা হবে (হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মাথা তুলুন, আবেদন করুন, আপনাকে দেয়া হবে আর সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে'। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا اول شافع واول مشفع

'আমি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী আর আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে'।

বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন মানুষ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নবীগণের নিকট আবেদন করবে, অন্যান্য নবীগণ বলবেন, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করার উপযুক্ত নই, কিন্তু একমাত্র আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলবেন, আমিই তোমাদের জন্যে সুপারিশ করবো।

তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ

انا اول من يجير

'আমিই সর্বপ্রথম পুল সিরাত পার হবো'। (বোখারী শরীফ)

انا اول من يقرع باب الجنة

'আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করব'।

আরও এরশাদ করেছেনঃ

انا اول من يدخل الجنة يوم القيامة

'আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ

اوتيت علم الاولين والآخرين

'আগের পরের সকলকে যে এলম দান করা হয়েছে তা আমাকে একা দান করা হয়েছে'।

৭. অন্যান্য নবীগণকেও দ্বীন প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে পরিপূর্ণ দ্বীন। দ্বীনের এ পরিপূর্ণতা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য, কোরআনে করীমেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের দ্বীনকে, সম্পূর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে পছন্দ করেছি'।

যেহেতু দ্বীন বা জীবন বিধান পরিপূর্ণ হয়েছে, কেয়ামতে পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে, সকলের জন্যে এ জীবন-বিধানকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেছেন, আর নবুওয়্যতরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে, আর কেয়ামত পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত অব্যাহত থাকবে আর কোন নবীর প্রয়োজন হবেনা, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই খাতেমুন, নবীয়্যিন বা সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবী রসূলগণের দলপতি, বিশ্ব সভার সভাপতি।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ পাককে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁরই তসবীহ পাঠ করতে থাক, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক'।

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা

অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় নিরত থাক। বিশেষতঃ আল্লাহ পাকের এ নেয়ামতের শোকর আদায় কর যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। এ নেয়ামত হলো তোমাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে প্রেরণ করেছেন যিনি নবী রসূলগণের দলপতি। যাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চে। আর এ নেয়ামতের শোকর গুজারীর পন্থা হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা

আল্লাহর জিকর

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আমল এবং পবিত্রতম কাজ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেক আমলের কথা বলবো না? যা আল্লাহর রাহে স্বর্ণ রৌপ্য দান করা এবং জেহাদ থেকেও উত্তম। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হুজুর সে কাজটি কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তা আল্লাহর জিকর।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে একটি দোয়া শ্রবণ করেছি, যা আমি সর্বদা পাঠ করতে থাকি। তা হলো–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অত্যন্ত বড় শোকর গুজার, অধিক পরিমাণে তোমাকে স্মরণকারী এবং তোমার বিধি-নিষেধ পালনকারী ও হেফাজতকারী বানিয়ে দাও'।

একবার দু' জন গ্রামীন ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যে সৎ কাজ করে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, ইসলামের বিধি-নিষেধ তো অনেক, আমাকে এমন কোন উঁচু কথা বলে দিন, যা আমি আঁকড়ে ধরে রাখি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'তুমি সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকরে তোমার রসনাকে ব্যস্ত রাখ'। (তিরমিজী)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, তোমরা আল্লাহর জিকরে এভাবে মশগুল থাক যেন লোকেরা তোমাদেরকে মজনু (পাগল) বলতে শুরু করে। (মসনদে আহমদ)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যারা কোন মজলিসে একত্রিত হয়, আর সেখানে আল্লাহর জিকর না করে তবে সে মজলিস তাদের জন্যে কেয়ামতের দিন অত্যন্ত আক্ষেপের কারণ হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক ফরজ কাজেরই একটা নিদৃষ্ট সীমা রয়েছে। আর ওজরের অবস্থায় তা মাফও হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর জিকরের কোন সময় বা সীমা নিদৃষ্ট নেই, আর তা কখনো বর্জন করা যায় না, তবে কেউ পাগল হয়ে গেলে তা ভিন্ন কথা। দাড়ানো অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায়, শায়িত অবস্থায়, রাতে-দিনে, ভ্রমণরত অবস্থায় বা কোথাও অবস্থান কালে, স্থলে বা সামুদ্রিক ভাগে, সকাল সন্ধ্যায়, দিনে রাতে, সমৃদ্ধ ও দরিদ্র অবস্থায়, সুস্থ ও রুগ্ন অবস্থায়, প্রকাশ্যে ও গোপনে এক কথায় সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকর করা উচিত, বিশেষতঃ সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ পাঠ করা উচিত। যখন তোমরা এ কাজটি করবে, তখন আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন আর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্যে সর্বদা দোয়া করতে থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বুজুর্গানে দ্বীন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম নববী (রঃ) সহ অনেকেই এ সম্পর্কে লিখেছেন, তবে এ বিষয়ে ইমাম নববী (রঃ) রচিত গ্রন্থ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।[১]

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا

অর্থাৎ 'সকাল সন্ধ্যায় তোমরা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ سبحوه بكرة অর্থাৎ ফজরের নামাজ আদায় কর। আর اصيلا শব্দটির ব্যাখ্যায় কালবী (রঃ) লিখেছেন, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় কর।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে তসবীহ পাঠের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلى العظيم কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ তসবীহগুলোকে অজু অবস্থায় বা বে-অজু অবস্থায় পাঠ করা যায়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সকাল সন্ধ্যায় তসবীহ পাঠের নির্দেশের কারণ হল, এ সময় রাত এবং দিনের ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-১৪-১৫

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রাতে আগত এবং দিনের বেলায় আগত ফেরেশতাগণ নিদৃষ্ট সময়ে তোমাদের মাঝে আসে। ফজর এবং আসরের নামাজে তারা একত্রিত হয়। এরপর যে ফেরেশতাগণ রাতে তোমাদের নিকট ছিল তারা উপরে চলে যায়। তোমাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (অথচ তিনি সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত), তোমরা আমার বন্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ? ফেরেশতারা আরজ করবে, আমরা তাদেরকে নামাজে রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাজ আদায় করছিলো।

হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বন্দা যখন নামাজে থাকে তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি রহমতের নজরে দেখেন, যতক্ষণ নামাজী বন্দার মন এদিক সেদিক না যায়। কিন্তু যখন বন্দার মন এদিক সেদিক চলে যায় তখন আল্লাহ পাক তাঁর শুভ দৃষ্টি সরিয়ে নেন।[১]

(আহমদ, আবু দাউদ, নেসায়ী, দারমী)

একখানি হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, আর যে আমাকে মজলিশে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম মজলিশে স্মরণ করি। যে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দু' হাত এগিয়ে যাই, আর যে আমার দিকে পদব্রজে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন আয়াত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ

নাযিল হলো তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ পাক আপনাকে যে বিশেষ মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, আমাদেরকেও তাতে শরীক করুন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা- ৩৮৫-৮৬

আবদ এবনে হোমায়েদ বলেছেন, শানে নুযুলের এ বিবরণ দিয়েছেন মুজাহেদ (রঃ)।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, মুজাহেদ (রঃ)-এর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আপনার প্রতি ইতোপূর্বে যে কল্যাণই নাযিল হয়েছে, আমরা তাতে শরীক হয়েছিলাম। অতএব, এতেও আমাদেরকে শরীক করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হাকেম এবং বায়হাকী সলীম এবনে আমের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম ফেরেশতাগণ আপনার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করছেন। আসা-যাওয়া, ওঠা-বসা সকল অবস্থায়ই তাদেরকে আপনার প্রতি দোয়া করতে দেখেছি। তখন হযরত আবু উমামা (রাঃ) বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে ফেরেশতাগণ তোমার জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করবেন। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

'সালাত' শব্দের ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

'তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্যে রহমতের দোয়া করে'।

এ আয়াতে 'সালাত' শব্দটি আল্লাহ পাকের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। এজন্যে এ শব্দটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, 'সালাত' শব্দটি যখন আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, আর যখন ফেরেশতাদের সঙ্গে শব্দটির সম্পর্ক হয়, তখন এর অর্থ হলো মাগফেরাতের দোয়া।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, বন্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের 'সালাতের' অর্থ হলো, মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তির সুনাম সুখ্যাতির প্রচার যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে করা হয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৮৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৩

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'কামুসে' রয়েছে, 'সালাত' অর্থ হলো রহমতের দোয়া, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রসূলের প্রশংসা, আর 'সালাত' সে এবাদতকেও বলা হয় যাতে রুকু ও সেজদা থাকে, যেমন নামাজ। যাহোক, 'সালাত' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেন।

অভিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণতঃ 'সালাত' শব্দটি 'দোয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কেউ যদি একথা বলে صليت عليه অর্থাৎ 'আমি তার জন্যে দোয়া করেছি'। একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে খাবার গ্রহণের দাওয়াত দেয়, তবে তা গ্রহণ করা উচিত। আর যদি সে রোজাদার থাকে, তবে সে যেন দাওয়াতকারীর জন্যে দোয়া করে। উল্লেখিত হাদীসেও 'সালাত' শব্দটি 'দোয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি, পবিত্র কোরআনেও 'সালাত' শব্দটি দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

'(হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে দোয়া করুন, নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের শান্তির কারণ হবে'।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, নামাজকে 'সালাত' বলা হয় এজন্যে যে, তাতে দোয়া করা হয় যেমনঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

(হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পূণ্য পন্থা প্রদর্শন কর।)

প্রশ্ন হতে পারে, 'সালাত' শব্দের অর্থ যদি দোয়াই হয় তবে 'সালাতুল্লাহ' অর্থ কি? এ প্রশ্নের জবাব এই, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বন্দার জন্যে দোয়ার তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ পাক তাঁর নিজের পবিত্র সত্ত্বার নিকট স্বীয় বন্দাদের জন্যে রহমত এবং মাগফেরাত কামনা করেন। আর এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতেই এরশাদ হয়েছেঃ

كتب على نفسه الرحمة

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের জন্যে রহমত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পাক দয়া করে বন্দাদের প্রতি রহমত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর কোন প্রকার দায়িত্ব রয়েছে যা অবশ্য পালনীয়; বরং এর অর্থ হলো

আল্লাহ পাক অতীব দয়াময়। তিনি দয়া করা পছন্দ করেন, তাই বন্দাদের প্রতি দয়া করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[১]

لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِط وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

আল্লাহ পাক চান তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে, কেননা আল্লাহ পাক ঈমানদারদের প্রতি অতিশয় দয়াবান'।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ কর। আর সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ কর। জীবনের কোন মহূর্তই আল্লাহ পাকের জিকর ব্যতীত অতিবাহিত করোনা; বরং সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকরে, তাঁর ধ্যানে তন্ময় থাক। সকাল সন্ধ্যার উল্লেখ বিশেষভাবে এজন্যে করা হয়েছে যে, সকাল সন্ধ্যায় সৃষ্টির বুকে বিরাট পরিবর্তন আসে, বিপ্লব সৃষ্টি হয়, রাতের স্থলে দিন, দিনের স্থলে রাত আসে। আলোর স্থলে অন্ধকার, আর অন্ধকারের স্থলে আসে আলো। এর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বহিঃপ্রকাশ হয়। যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন সর্বক্ষণ আলো থাকবে, কেউ তাতে বাধা দিতে পারবেনা, আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন সর্বক্ষণ রাতের অন্ধকার থাকবে, কেউ তাকে দিনে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেনা। রাত ও দিনের পরিবর্তনের সময় বিশেষভাবে আল্লাহ পাকের জিকর করা কর্তব্য। অথচ আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা সকল পরিবর্তন থেকে পবিত্র। তিনিই বন্দাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন। বন্দাদের অধিক পরিমাণে স্মরণের ফলশ্রুতিতেই তারা আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করে, আর আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেকই তাঁর ফেরেশতাগণ বন্দাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে। আল্লাহ পাকের এ রহমত ও বরকতই মানব জাতিকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে ঈমানের আলোর দিকে নিয়ে আসে।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতের কারণেই মানুষ ঈমান লাভ করতে পারে, আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া এবং মেহেরবানীতেই সে হেদায়েতের আলো দেখতে পায়। এটি নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত এবং দয়া। আর তিনি অতিশয় দয়াবান।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৮৬-৮৭
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫২৯

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۖۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَيُّهَا
النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّدَاعِيًا اِلَى
اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ
اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ
وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

তরজমা

(৪৪) যেদিন তারা আল্লাহ পাকের সাক্ষাত লাভ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং তাদের জন্যে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন অতি উত্তম প্রতিদান।

(৪৫) হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে।

(৪৬) এবং আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং একটি উজ্জ্বল বর্তিকা রূপে।

(৪৭) (হে নবী!) আপনি মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ।

(৪৮) (হে নবী!) আপনি কাফের ও মুনাফেকদের কথা মানবেন না, আর তাদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করে চলুন এবং এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখুন, কার্য সম্পাদনে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

(৪৯) হে মোমেনগণ! তোমরা যখন মোমেন নারীগণকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই 'তালাক' দাও তখন তোমাদের জন্যে তাদের পালনীয় কোন 'ইদ্দত' নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতএব, তাদেরকে কিছু ভোগ-সম্পদ দান কর এবং সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে উত্তমভাবে তাদেরকে বিদায় কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা দুনিয়াতে লাভ করবে, যেমন আল্লাহ পাক মোমেনদের প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণকে মোমেনদের পক্ষে দোয়া করার আদেশ প্রদান করেন।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে মোমেনদের শুভ পরিণতির কথা যা তারা আখেরাতে লাভ করবেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا

'যেদিন তারা আল্লাহ্ পাকের সাথে সাক্ষাত লাভ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং তাদের জন্যে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন অতি উত্তম প্রতিদান'।

মোমেন বন্দাগণকে কখন 'সালামে'র অভিবাদন দেয়া হবে, তার জবাবে তফসীরকারগণ বলেছেন (১) মৃত্যুর সময় অথবা (২) কবর থেকে পুনরুত্থানের সময় বা (৩) জান্নাতে প্রবেশ করার সময়।

তফসীরকার জুযাজ (রঃ) বলেছেন, মূলতঃ সালামের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করা হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে বালা-মসিবত এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন। আর কেয়ামতের দিন যখন মোমেন বন্দাগণ কবর থেকে বের হয়ে আসবে তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে 'সালাম' করবে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেবে। আর জান্নাতে প্রবেশ করার পর ফেরেশতাগণ মোমেনদের নিকট এসে তাদেরকে সালাম করবে এবং জান্নাতের সুসংবাদ পৌঁছাবে, যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۞ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

(আর প্রত্যেক দ্বার দিয়ে ফেরেশতাগণ মোমেনদের নিকট প্রবেশ করবে এবং বলবে 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের ধৈর্য সহনশীলতার ফলশ্রুতি স্বরূপ'।)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কেয়ামতের দিন যখন মোমেন বন্দাগণ কবর থেকে বের হয়ে আসবেন তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে 'সালাম' দেবেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন, শুধু তাই নয়; বরং তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পর ফেরেশতাগণ তাদের মোলাকাতের জন্যে হাযির হবেন এবং তাদেরকে সালাম করবেন। এরপর যখন মোমেনগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন, তখন

আল্লাহ পাকের তরফ থেকেও মোমেনগণকে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে, যেমন কোরআনে করীমে রয়েছেঃ

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

'দয়াবান প্রতিপালকের তরফ থেকে মোমেনদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, "সালাম" তথা তাদের উদ্দেশ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আজরাঈল (আঃ) মোমেনের রুহ কবজ করার সময় তাকে সালাম দেবেন। সালাম দেয়ার পূর্বে আজরাঈল (আঃ) কোন মোমেনের রুহ কবজ করেন না।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আঃ) কোন মোমেনের নিকট তার রুহ্ কবজ করার জন্যে আসেন তখন বলেন, তোমার প্রতিপালক তোমাকে 'সালাম' দিয়েছেন।[২]

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, يوم يلقونه (যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের সাক্ষাত লাভ করবে) কথাটির তাৎপর্য হলো কেয়ামতের দিন।

আর তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ মোমেন বন্দাগণ যেদিন বেহেশতে প্রবেশ করবে সেদিন তারা একে অন্যকে মোবারকবাদ দিয়ে বলবে, 'আমরা এখন সকল বিপদ থেকে নিরাপদ'।

وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا

'এবং তাদের জন্যে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন অতি উত্তম প্রতিদান'।

'সালাম' বা অভিবাদন এবং মোবারকবাদ এসব কিছুই জান্নাতে প্রবেশের পূর্বের বিষয়। আর জান্নাতে প্রবেশের পরের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে, অর্থাৎ মোমেনদের জন্যে আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম নেয়ামত জান্নাতে প্রস্তুত করে রেখেছেন যা দুনিয়াতে কোন মানুষ দেখেনি, শ্রবণও করেনি এমনকি, কল্পনাও করেনি।

এ আলোচনা থেকে যা প্রমাণিত হলো তা হচ্ছে, আখেরাতে মোমেনদের উচ্চ মর্তবা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হবে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা দেবেন এবং

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৯৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫২৯
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৪৪

'সালাম' দ্বারা তাদেরকে অভিবাদন জানাবেন। মোমেনগণ নিজেরাও পরস্পরকে অভিবাদন করবেন, এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্ পাকও তাদেরকে 'সালাম' বলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا....

'হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী স্বরূপ এবং সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক স্বরূপ এবং আল্লাহ্ পাকের দিকে আহবায়করূপে তাঁর অনুমতিক্রমে এবং দীপ্তিমান সূর্যরূপে'।

অর্থাৎ হে নবী! আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আপনি প্রেরিত রসূল। আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ বা তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো এবং আল্লাহ্ পাকের মহিমা বর্ণনা করা, মানুষকে সঠিক পথে হেদায়েত করা আপনার কাজ। ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতি জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া এবং কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি, দোযখের শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সর্তক করাও আপনার কাজ। আপনি নবুওয়্যতের আকাশের দেদীপ্যমান সূর্য। সূর্য উদিত হলে যেমন চন্দ্র, তারকারাজির কোন প্রয়োজন থাকে না, ঠিক তেমনি আপনার আবির্ভাবের পর আর কোন নবীরও প্রয়োজন হবে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ প্রেরণ করেছি, অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষী হবেন, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

অর্থাৎ রসূল হবেন (সেদিন) তোমাদের উপর সাক্ষী অথবা এর অর্থ হলো রসূল হবেন আল্লাহ্ পাকের তৌহিদের সাক্ষ্যদাতা, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এ সত্যের সাক্ষ্যদাতা হবেন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। অথবা এর অর্থ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আখেরাতের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। বেহেশত-দোযখ, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত প্রভৃতির বর্ণনা দেবেন তিনি। আর আখেরাতে কে দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনুগত ছিলেন আর কে ছিল অবাধ্য তিনি তার সাক্ষ্য প্রদান করবেন।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২১৬

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, আতাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসকে (রাঃ) বলেছি যে, তওরাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কি কি গুণের উল্লেখ রয়েছে? তিনি বলেছেন, পবিত্র কোরআনে তাঁর যেসব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে, তার কিছু তওরাতে স্থান পেয়েছে। যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেসব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর আলোচনা তওরাতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং উম্মী লোকদের রক্ষক রূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বন্দা ও রসূল, আমি আপনার নামকরণ করেছি মোতাওয়াক্কেল অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভরসাকারী। মন্দ কথা বলা আপনার স্বভাব বিরোধী, আপনি বাজারে চিৎকারকারীও নন, কারো মন্দ আচরণের জবাবে আপনি মন্দ আচরণ করেন না; বরং ক্ষমা করেন।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, হযরত ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলের একজন নবী হযরত শা'ইয়া (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাক ওহী নাযিল করেছেন এ মর্মে যে, তুমি তোমার জাতির সম্মুখে দন্ডায়মান হও, আমি তোমার কণ্ঠে কিছু কথা বলবোঃ আমি উম্মীদের মধ্যে একজন উম্মী নবী প্রেরণ করবো, তিনি হবেন অতি সুন্দর, অতি উত্তম ও মহান চরিত্রের অধিকারী। তিনি এত শান্ত ও বিনম্র যে, যদি প্রদীপের পার্শ্ব অতিক্রম করেন তবে প্রদীপ নিভে যাবে না, যদি কোথাও পদযাত্রা করেন তবে পায়ের চাপ পড়ে না, আমি তাঁকে সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করবো। তিনি সত্যভাষী হবেন, হক্ব কথা বলা হবে তাঁর বৈশিষ্ট্য, আমি তাঁর মাধ্যমে অন্ধ লোকদেরকে চক্ষুষ্মান করবো, বধির লোকদেরকে শ্রবণকারী বানাবো, যাদের অন্তর মরীচাগ্রস্ত তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করবো। সকল কল্যাণের দিকে তাঁকে পথ প্রদর্শন করবো, তাঁকে যাবতীয় নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী করবো, মনের একাগ্রতা তাঁর পোষাক হবে। নেকী এবং কল্যাণ তাঁর বৈশিষ্ট্য হবে, হেকমত তাঁর ভাষা হবে, সততা সত্যবাদীতা তাঁর অভ্যাস হবে, ক্ষমা-ঔদার্য তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে, হক্ব বা সত্য তাঁর শরীয়ত হবে, সুবিচার তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে, হেদায়েত তাঁর ঈমান হবে, ইসলাম তাঁর দ্বীন হবে, আহমদ তাঁর নাম হবে। পথভ্রষ্ট লোকদেরকে আমি তাঁর দ্বারা হেদায়েত করবো, মূর্খ লোকদেরকে তাঁর মাধ্যমে আলেম বানাবো, পতনোন্মুখ লোকদেরকে তাঁর দ্বারা উন্নতি দান করবো, অপরিচিত লোকদেরকে তাঁর দ্বারা সুবিখ্যাত করবো। তাঁর মাধ্যমে ফকীরকে আমির করবো, মতভেদকে ভুলিয়ে ঐক্যবদ্ধ করবো, পৃথিবীকে তাঁর কারণে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবো, সকল উম্মতের মধ্যে তাঁর উম্মতকে উত্তম

বানাবো, মানুষের কল্যাণের জন্যেই তাঁকে সৃষ্টি করা হবে। তিনি সৎ কাজের আদেশ দেবেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবেন, তিনি তৌহিদের আহবায়ক হবেন, তিনি হবেন প্রকৃত মোমেন, তিনি আন্তরিকতার প্রতীক হবেন, চলা ফেরায়, ওঠা-বসায়, মসজিদে মজলিসে এককথায় সকল অবস্থায় তিনি আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকবেন, তিনি দাঁড়িয়ে বসে নামাজে রত থাকবেন শুধু তাই নয়; তিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবেন এবং তাদের অনেকেই আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদের জন্যে বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়বে। তারা অজুর মাধ্যমে হাত মুখ ধৌত করবে, তারা পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত পোষাক পরিধান করবে, তারা আমার রাহে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেবে, আমার গ্রন্থ তাদের বক্ষে ধারণ করবে, তারা রাত্রে এবাদত গুজার হবে এবং দিনে জেহাদ করবে, আমি তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোক সৃষ্টি করবো। এই নবীর উম্মত তাঁর পরে বিশ্ববাসীকে হেদায়েত করবে, দুনিয়াতে সুবিচার কায়েম করবে, যারা তাদেরকে সাহায্য করবে আমি তাদেরকে সম্মানিত করবো। পক্ষান্তরে, যারা আমার এই নবীর বিরোধিতা করবে আমি তাদের শাস্তি বিধান করবো, তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা মানুষকে সত্যের প্রতি আহবান জানাবে আমি তাদেরকে আমার নবীর উত্তরাধিকারী করবো। তারা মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তারা নামাজ পড়বে, যাকাত আদায় করবে এবং তারা অঙ্গীকার পূরণ করবে, যে কল্যাণকর কাজ তারা শুরু করবে আমি তাদের দ্বারা তা পূর্ণ করাবো, এটি আমার দান, আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করি।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেসব গুণ এবং বৈশিষ্ট্যর উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সর্ব প্রথম হলো 'শাহেদান' অর্থাৎ হে নবী! আমি আপনাকে সমগ্র জাতির উপর সাক্ষী রূপে প্রেরণ করেছি। এজন্যে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আবদুল্লাহ এবনে মুবারক (রহঃ) সায়ীদ এবনে মুসাইয়্যের (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এমন কোন দিন যায় না যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তাঁর উম্মতকে পেশ না করা হয়। তিনি তাঁর উম্মতকে তাদের চেহারা দ্বারা বা বিশেষ কোন আলামত দ্বারা চিনতে পারেন, এজন্যেই তিনি কেয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। অথবা সাক্ষী হওয়ার অর্থ হলো এই, যখন উম্মতে মোহাম্মদীয়া এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, সমস্ত নবী রসূলগণ তাদের নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ পাকের বাণী

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-১৬-১৭

পৌঁছে দিয়েছেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের কথাকে সত্যায়িত করবেন।

বোখারী শরীফ, তিরমিজী শরীফ, নেছায়ী শরীফ এবং এবনে মাজা শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন নূহ (আঃ)-কে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি আমার বাণী পৌঁছিয়ে ছিলে? নূহ (আঃ) বলবেন, 'জ্বী-হ্যাঁ'। এরপর তাঁর উম্মতকে তলব করে জিজ্ঞাসা করা হবে, নূহ কি আমার বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে ছিল? তারা বলবে, 'আমাদের নিকট কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেননি', তখন নূহ (আঃ)-কে বলা হবে, তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? যে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে, তখন নূহ (আঃ) বলবেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মত আমার সাক্ষী।[১]

وَمُبَشِّرًا

অর্থাৎ (হে রসূল!) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা রূপে, যারা ঈমান আনে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা নবীর দায়িত্ব।

وَنَذِيرًا

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়, নবী রসূলকে অস্বীকার করে তাদেরকে তিনি তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন।

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ

এবং তিনি আল্লাহ পাকের দিকে মানুষকে আহবান করেন, অবশ্য আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে।

অর্থাৎ যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন, তাকে তিনি আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করেন তথা আল্লাহ পাকের তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের এবং তাঁর প্রতি অনুগত হওয়ার আহবান জানান। অথবা জান্নাতের দিকে আহবান জানান। আর এ কাজ সহজলভ্য নয়। আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত তা সম্ভবও নয়। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে বলেছিলেন, 'হে আমার চাচা! আপনি অন্ততঃ একবার আমাকে শুনিয়ে বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ', তাহলে আমি আপনার নাজাতের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। কিন্তু ঐ মুহূর্তে আবু জেহেল আবু তালেবকে এ ব্যাপারে বাধা দেয়, এরই মধ্যে আবু তালেব শেষ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৮

নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন, কেননা আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ না করলেও বিপদ মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্যে আসতে এতটুকু বিলম্ব করতো না। তাই তার পরিণাম চিন্তা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

'(হে রসুল! আপনি (আপনার চাচাকে) যতই ভালবাসুন না কেন, হেদায়েত করতে পারবেন না',

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ

'কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন'।

এর অর্থ হলো হেদায়েত সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত করেন। নবী রসূলগণের কাজ হলো মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করা, যারা আল্লাহ পাকের তৌফিক পায়, তারাই নবী রসূলগণের আহবানে সাড়া দেয় এবং হেদায়েত কবুল করে।

হযরত রবীয়া জারশী বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট (স্বপ্নে) এক ব্যক্তি আগমন করলো এবং বললো, 'আপনার চক্ষুগুলো নিদ্রিত কিন্তু কর্ণ শ্রবণ করে, আর অন্তর উপলব্ধি করে', তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, আমার নয়ন যুগল বন্ধ ছিল কিন্তু কর্ণদ্বয় শ্রবণ করছিল এবং অন্তর উপলব্ধি করছিল যে কেউ বলছিল, এক সর্দার একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তাতে খাবারের জন্যে দস্তরখান বিছিয়ে দেন, আর ঐ খাবার গ্রহণের দাওয়াত দেয়ার জন্যে একজন আহবায়ক প্রেরণ করেন। যে ঐ আহবায়কের আহবানে সাড়া দিল, ঘরে প্রবেশ করলো, খাবার গ্রহণ করলো, প্রাসাদের মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো। কিন্তু যে আহবায়কের আহবানে সাড়া দিলনা, ঘরে প্রবেশ করলো না, কোন প্রকার খাবারও গ্রহণ করলো না, প্রাসাদের মালিক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।

এ স্বপ্নের তা'বীর হলো এই, প্রাসাদের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক, আর প্রাসাদ হলো ইসলাম এবং আহবায়ক হলেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আর দস্তরখান হলো জান্নাত। (দারমী)

وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

অর্থাৎ দীপ্তিময় সূর্য।

‘সিরাজাম মুনীরা’র তাৎপর্য

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন নবুওয়্যতের আকাশের ‘দীপ্তিময় সূর্য’।

এ বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এর দু’টি অর্থ হতে পারে। ‘সিরাজ’ শব্দটি পবিত্র কোরআনে তিনটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দু’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমতঃ ‘সিরাজ’ অর্থ হলো প্রদীপ, যেভাবে একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করা যায়, ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি হেদায়েতের আলো লাভ করেছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের অন্তরে হেদায়েতের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। তাঁদেরকে যারা দেখেছেন অর্থাৎ তাবেঈগণ, তাঁরা সাহাবায়ে কেরাম থেকে আলো গ্রহণ করেছেন। আর তাদের থেকে তাবে-তাবেঈন হেদায়েতের আলো পেয়েছেন। এভাবে গত প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেদায়েতের যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তার আলোই সমগ্র পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর এ অর্থেই তিনি ‘সিরাজাম মুনীরা’। দ্বিতীয়তঃ ‘সিরাজ’ হলো সূর্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন নবুওয়্যতের আকাশের দ্বীপ্তিময় সূর্য। সূর্যের আলো তার নিজস্ব। চন্দ্র এবং তারকারাজির আলো সূর্য থেকে ধার করা। যেভাবে সূর্য উদিত হলে চন্দ্র তারকারাজির আলো নিস্প্রভ হয়ে যায় ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নবী রসূলগণের নবুওয়্যত শেষ হয়ে গেছে এবং নবুওয়্যত পূর্ণতা লাভ করেছে এবং অন্য কোন নবীর আগমনের প্রয়োজন রয়নি। ঠিক যেমন সূর্য উদিত হলে অন্য কোন আলোর প্রয়োজন থাকেনা। এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোন জাতির জন্যে নবী নন; বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে তিনি নবী। ঠিক এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত বিশেষ কোন কালের জন্যেও নির্ধারিত নয়; বরং তিনি সর্বকালের জন্যে নবী। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন হবেনা। তার প্রয়োজনও হবেনা। কেননা কেয়ামত পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরে নবুওয়্যত সূর্যের আলোর ন্যায় বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

‘আর (হে রসূল!) মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিন যে তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশেষ মর্যাদা এবং বিরাট দান রয়েছে’।

শানে নুযুল

বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুওয়্যতে' হযরত রবী এবনে আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন এ আয়াত وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ (আমি জানিনা মৃত্যুর পরে আমার সাথে কী ব্যবহার করা হবে, আর একথাও জানিনা যে তোমাদের সাথে কি করা হবে) নাযিল হয়, তখন আরেকটি আয়াত নাযিল হয় তা হলো,

لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

(যাতে করে আল্লাহ পাক আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করেন।)

এ আয়াত নাযিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরজী পেশ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার সাথে কী ব্যবহার করা হবে তা এ আয়াত দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে, আমরাও জানতে পেরেছি, আপনার জন্যে তা মোবারক হোক কিন্তু আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে তা তো আমরা জানিনা', তখন আলোচ্য আয়াত

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا

নাযিল হয়। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, মোমেনদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিরাট দান এবং বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

এবনে জরীর, একরামা এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এ 'ফজলে কবীর' বা বিরাট মর্যাদা হলো জান্নাত।[১]

আয়াতের মর্মকথা

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের কারণে লোকেরা গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে হেদায়েতের আলো লাভ করেছে এবং যাঁর অনুকরণের বরকতে মুসলমানগণ দুনিয়াতে বিশেষ মর্যাদা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছে এবং আখেরাতেও তারা পাবে অনন্ত অসীম নেয়ামত। পক্ষান্তরে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীপ্তিমান সূর্যের আলো গ্রহণ করেনি, তারা ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। এজন্যে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৯০

ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, 'হে নবী! আপনাকে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি। আপনিই কেয়ামতের দিনে সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে এই দল ঈমান এনেছে, আর 'এই দল ঈমান আনেনি', আর আপনিই সুসংবাদদাতা রূপে প্রেরিত হয়েছেন, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার অনুসরণ করবে আপনি তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করুন। আর আপনি ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। অতএব, কাফেরদেরকে দোযখের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। আর আপনার আরেকটি পদ মর্যাদা এই, আপনি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আহবায়ক হিসেবে প্রেরিত, মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করা আপনার দায়িত্ব। এতদ্ব্যতীত, আমি আপনাকে নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য রূপে প্রেরণ হরেছি। সারা বিশ্ব এ সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়েছে। সত্য-অসত্যের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কাফেররা অন্ধ হয়েছে বলে সে আলো দেখতে পায়নি, আর সে আলো দ্বারা উপকৃতও হয়নি'।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

'আর আপনি কাফের মুনাফেকদের কথা মানবেন না। তাদের উৎপীড়ন নির্যাতনকে উপেক্ষা করে চলুন, এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন, কার্য সম্পাদনে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনাকে যে অনন্য-সাধারণ মর্যাদা দান করেছেন এবং যে মহান দায়িত্ব আপনার প্রতি অর্পণ করেছেন এমন অবস্থায় মক্কার কাফেরদের এবং মদীনা শরীফের মুনাফেকদের কোন কথা আপনি শুনবেন না, আপনার উচ্চ মর্যাদা এবং গৌরবময় সাফল্যের জন্যে তাদের গাত্রদাহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমন অবস্থায় তারা আপনার প্রতি ও আপনার প্রতি বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি উৎপীড়ন করতে উদ্দত হবে। তারা পদে পদে আপনার বিরোধিতা করবে, আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, বিন্দুমাত্রও তাদের পরোয়া করবেন না, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন, কার্য সম্পাদনে তিনি যথেষ্ট। মুনাফেক ও কাফেররা আপনাকে মন্দ বলবে আপনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

وَدَعْ اَذٰهُمْ

'কাফেরদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করুন'।

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, কাফের ও মুনাফেকরা আপনাকে যে কষ্ট দিচ্ছে তার উপর সবর করুন।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তাদের নির্যাতন-উৎপীড়নের পরোয়া করবেন না এবং এসবকে ভয় করবেন না।

জুযাজ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, কাফেররা যত নির্যাতনই করুক না কেন আপনি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন।[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

'হে মোমেনগণ! তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদের বিয়ের পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও তখন তাদেরকে 'ইদ্দত' গুজরান করাবার কোন অধিকার তোমাদের নেই, অতএব, তাদেরকে কিছু ভোগ-সামগ্রী দিয়ে দাও এবং ভদ্রভাবে তাদেরকে বিদায় কর'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত জয়নব (রাঃ)-এর বিয়ে এবং তালাকের ঘটনার উল্লেখ ছিল। মধ্যস্থলে প্রসঙ্গক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান আয়াত থেকে বিয়ে এবং তালাক সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ বর্ণিত হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ সাধারণ মোমেনদের সাথে সম্পর্কিত আর কিছু বিধি-নিষেধ স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে রয়েছে যা শুধুমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য এবং যা তাঁর বিশেষ ফজিলত এবং মর্যাদার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এভাবে উম্মাহাতুল মোমেনীনের জন্যেও এমন কিছু বিশেষ বিধান রয়েছে যা সাধারণ কোন মুসলমান মহিলাদের জন্যে নেই। এটি তাঁদের বৈশিষ্ট্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর উম্মাহাতুল মোমেনীনের সাথে বিয়ে হারাম। কেননা উম্মতের রুহানী পিতা হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৪৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৯১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৪

ওয়াসাল্লাম আর তাঁর স্ত্রীগণ উম্মতের রূহানী মাতা, তাই তাঁদের আদব রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণ হতে পারে। তাই তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কে এ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।[১]

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ..........

হে মোমেনগণ! যখন তোমরা মোমেন নারীদেরকে বিয়ে কর এবং তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও তবে এমন অবস্থায় স্ত্রীকে ঈদ্দত পালন করতে হবেনা এবং সে অন্যত্র তখনই বিয়ে করতে পারবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন,

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ

এ বাক্যে 'মোমেনাত' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মুসলমানদের কর্তব্য হল অন্য মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করা।

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা প্রমাণিত হয়, বিয়ের পূর্বে তালাকের কোন গুরুত্ব নেই। কেননা তালাকের কথা বিয়ের পরই চিন্তা করা যায়। এজন্যে যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বলে, "আমি তোমাকে যখন বিয়ে করি তবে তোমাকে তালাক", এরপর ঐ ব্যক্তি সেই নারীকে বিয়ে করলো কিন্তু বিয়ের পূর্বে প্রদত্ত তালাকের কোন গুরুত্ব থাকবেনা। আর যদি কথাটি এভাবে বলে, 'আমি যে স্ত্রী লোককে বিয়ে করি তাকে তালাক'। এরপর যদি তার বিয়ে হয় তবে তালাক হয়ে যাবে।

হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মাআজ (রাঃ), হযরত যাবের (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। এমনিভাবে সায়ীদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ), সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ), ওরওয়া (রঃ), তাউস (রঃ), হাসান (রঃ), একরামা (রঃ), আতা (রঃ), সোলায়মান এবনে ইয়াসার (রঃ), শা'বী (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং ইমাম শাফী (রঃ) সহ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করেন।[২]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩১-৩২
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৯১-৯২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৪

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا
لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ
مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ
خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَاَةً
مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ
يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

তরজমা

(৫০) হে নবী! আমি আপনার জন্যে হালাল করে দিয়েছি আপনার সেসব স্ত্রীগণকে যাদের দেনমোহর আপনি আদায় করে দিয়েছেন, আর সেই নারীদেরকেও হালাল করে দিয়েছি যারা আপনার মালিকানাধীন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক আপনাকে দান করেছেন যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ রূপে এবং আপনার চাচার কন্যাগণ এবং আপনার ফুফুর কন্যাগণ এবং আপনার মামার কন্যাগণ এবং আপনার খালার কন্যাগণকে, যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে এবং ঐ মোমেন নারীগণকেও (আপনার জন্যে হালাল করেছি) যে কোন বিনিময় ব্যতীত (দেনমোহর ব্যতীত) নিজেকে নবীর দরবারে সমর্পণ করে। যদি নবী তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করেন। এ সমস্ত (বিধান) শুধু আপনার জন্যে, অন্য মোমেনদের জন্যে নয়, যাতে করে আপনার কোন অসুবিধা না হয়। মোমেনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি, আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পর্কীয় যে বিশেষ বিধান রয়েছে, তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ

হে নবী! আপনার জন্যে আপনার সেই স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে ইতোপূর্বে আপনি বিয়ে করেছেন, যাদের দেনমোহর আপনি আদায় করে দিয়েছেন, যারা দুনিয়ার বদলে আখেরাতের জিন্দেগীকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং যারা শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও নবীর সান্নিধ্য লাভকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বেছে নিয়েছে, চারের চেয়ে বেশী, কিন্তু এ আদেশ বিশেষভাবে আপনার জন্যে প্রযোজ্য, আপনি ব্যতীত আর কারো জন্যে চারের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি নেই।

আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)।[১]

ইমাম কুরতবী (রঃ) বলেছেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এটিই হলো আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা। আলোচ্য আয়াতের ازواجك। শব্দটি দ্বারা উম্মাহাতুল মোমেনীনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাঁরা দুনিয়ার মোকাবেলায় আখেরাতকে পছন্দ করেছেন। আর যাদের দেনমোহরও আপনি আদায় করে দিয়েছেন।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যবস্থা এই ছিল যে, তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর দেনমোহর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে দিতেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেনমোহর আদায় করাই উত্তম, আর এ উত্তম পন্থাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

আর সেই নারীদেরকেও হালাল করে দিয়েছি যারা আপনার মালিকানাধীন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ পাক আপনাকে দান করেছেন, এটি এ পর্যায়ের দ্বিতীয়-আদেশ, অর্থাৎ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসেবে আল্লাহ পাক আপনাকে যে সব দাসী বাঁদী দান করেছেন তারাও আপনার জন্যে হালাল। বাঁদীদের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, গণিমতের মাল বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বন্টন করার পূর্বে যদি তিনি কোন কিছু পছন্দ করতেন তবে তা নিয়ে নেয়ার অধিকার তাঁর ছিল, যেমন খায়বরের যুদ্ধের সময় হযরত সফিয়্যা (রাঃ)-কে তিনি এভাবে নিয়েছেন। এ অধিকার শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ছিল, আর কারো নয়। এমনিভাবে দুশমনের পক্ষ থেকে যদি কোন হাদীয়া তোহফা আসতো তবে তাও তাঁর মালিকানা হতো।

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৬
২। তফসীরে কুরতবী খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২০৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৩

وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ

আর এ পর্যায়ে তৃতীয় আদেশ হলো এই যে, (হে রসূল!) আপনার জন্যে আমি হালাল করে দিয়েছি আপনার চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন এবং খালাত বোন, তবে শর্ত হলো তাদেরকে হিজরত করতে হবে, তারা যতক্ষণ হিজরত না করেছে ততক্ষণ তাদের সাথে আপনার বিয়ে বৈধ নয়। এজন্যে আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেননি। কেননা তিনি হিজরত করেননি এবং মক্কা বিজয়ের পর তিনি ঈমান এনেছেন।

وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا

'আর সেই মোমেন নারীকেও বিয়ে করা আপনার জন্যে হালাল করে দিয়েছি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আত্ম নিবেদন করে'।

অর্থাৎ দেনমোহর ব্যতীতই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হতে ইচ্ছুক, তাঁর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় এমন কাউকে যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে বিয়ে করতে পারেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের وامراة مؤمنة এর তাৎপর্য হলো, যে মোমেন নারী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আত্ম নিবেদন করে, তাকে তিনি বিয়ে করতে পারেন, কিন্তু কোন অমুসলিম নারী যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আত্ম নিবেদন করে, তবে তাঁকে বিয়ে করা তাঁর জন্যে বৈধ নয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন মোমেন নারী যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁকে বিয়ে করার জন্যে আত্ম নিবেদন করে, তবে তা-ও যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত না প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত উম্মে হানি (রাঃ)-এর আজাদ করা গোলাম আবু সালেহ বর্ণনা করেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হানি বিনতে আবু তালেবের নিকট বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন, উম্মে হানি তখন আরজ করেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার অবস্থা খুবই দুর্বল, আমার সন্তান খুব ছোট'। এরপর যখন উম্মে হানির পুত্র বড় হয়, তখন তিনি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিয়ের আরজী পেশ করেন, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি জানালেন এবং এ আয়াত পাঠ করে বললেন, 'এখন আর তা সম্ভব নয়,' কেননা উম্মে হানি হিজরত করেননি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا বাক্যটির অর্থ হলো, কোন মোমেন নারী যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাকে বিয়ে করার জন্যে আত্ম নিবেদন করে, তবে কোন প্রকার দেন মোহর আদায় না করেই তিনি তাঁকে বিয়ে করতে পারেন।

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط

অর্থাৎ এ ব্যবস্থা শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যেই, অন্য কোন মোমেনের জন্যে নয়, কেননা মুসলমানদের বিয়েতে স্বামীর পক্ষ থেকে দেন মোহর আদায় করা পূর্বশর্ত। এটি স্বামীর একান্ত কর্তব্য। বিয়ের পূর্বে হোক পরে হোক দেন মোহর অবশ্যই ধার্য করতে হবে, এটি অপরিহার্য। যদি কোন কারণে বিয়ের পর দেনমোহর ধার্য না হয়ে থাকে, তবে 'মোহরে মিছিল' ধার্য হবে অর্থাৎ সাধারণতঃ তাদের পরিবারে প্রচলিত পরিমাণ মোহর অবশ্যই আদায় করতে হবে। কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এটি হলো বৈশিষ্ট্য, কোন নারী যদি তাঁর নিকট আত্ম নিবেদন করে, তবে তাঁকে দেনমোহর ব্যতীতই তিনি বিয়ে করতে পারেন। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য। এ পর্যায়ে তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, একজন মুসলমান এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেনা, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি চারের অধিক বিয়ে করতে পারেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক সঙ্গে কখনো নয়জনের অধিক স্ত্রী রাখেননি। মোট দশটি বিয়ে করেছিলেন, তন্মধ্যে একজন ছিলেন কুমারী অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ), অন্য সকলেই হয় বিধবা, নয়তো তালাক প্রাপ্তা।

মসনদে আহমদে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন মহিলা হাযির হলেন এবং তাঁকে বিয়ে করার জন্যে আত্ম নিবেদন করলেন। সেই মহিলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। তখন একজন সাহাবী দন্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন, 'যদি আপনি তাঁকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক না হন, তবে তাঁকে আমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিন'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেনমোহর আদায়ের জন্যে তোমার নিকট কিছু আছে কি'? উক্ত সাহাবী জবাব দিলেন, 'এ লুঙ্গিটি ব্যতীত আর কিছুই নেই'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তুমি যদি ঐ লুঙ্গিটি তাকে দিয়ে দাও, তবে তোমার পরিধেয় বস্ত্র কিছুই থাকবেনা, অতএব অন্য কিছুর অন্বেষণ কর'। সাহাবী আরজ করলেন, 'আমার কাছে আর কিছুই নেই'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তুমি চেষ্টা কর, যদি একটি লৌহ নির্মিত আংটিও হয়, তবে হাযির

কর'। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কিছুই সংগ্রহ করতে পারলেন না, তখন তিনি এরশাদ করলেন 'পবিত্র কোরআনের কোন সূরা কি তুমি কণ্ঠস্ত করেছ'? তখন ঐ সাহাবী বললেন, 'জ্বি হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা আমি শিখেছি', প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তাহলে এ সূরাগুলো তাকে শিখিয়ে দেবে, এটিই হবে তোমার বিয়ের দেনমোহর। আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্র আবদ্ধ করে দিলাম'।[১]

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

'স্ত্রী এবং দাস-দাসী সম্পর্কে আমি যে বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছি তা আমি ভাল ভাবেই জানি, (হে রসূল!) আপনার পক্ষে যেন কোন অসুবিধা না হয়, এজন্যেই এ ব্যবস্থা, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

আবদুর রাজ্জাক, আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক বিবাহ সম্পর্কে যে বিধান প্রবর্তন করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো, কোন স্ত্রীলোক অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে বসবেনা। এমনিভাবে, দেন মোহর ও সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে শুদ্ধ হবেনা, এমনিভাবে কোন পুরুষ একসঙ্গে চারজনের অধিক সংখ্যক স্ত্রী রাখবেনা। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক বিবাহ সম্পর্কিত যে বিধানের কথা এরশাদ করেছেন তা হলো, কোন পুরুষ একই সঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক বিবাহ সম্পর্কীয় যে বিধান ঘোষণা করেছেন তা হলো, 'অভিভাবক, দু'জন সাক্ষী এবং দেনমোহর ব্যতীত কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ শুদ্ধ হবেনা'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, 'অভিভাবক এবং দু'জন সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে শুদ্ধ হবেনা'।[২]

لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে বিবাহ সম্পর্কীয় যে বিশেষ বিধান ইতোপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে, এর কারণ হলো, '(হে রসূল!) আপনার যাতে কোন অসুবিধা না হয়'।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, '(হে রসূল!) বিবাহ সম্পর্কে আপনার যে কর্তব্য এবং স্ত্রীদের ব্যাপারে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-২০
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৭

আপনার যে দায়িত্ব তা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আর আপনার উম্মতের যে বিধান রয়েছে সে সম্পর্কে আমি অবগত আর তা হলো অভিভাবক ব্যতীত, দেনমোহর ব্যতীত এবং দু'জন সাক্ষী ব্যতীত কোন বিয়ে শুদ্ধ হবেনা'।

'আর (হে রসূল!) আপনার জন্যে যে বিধান পেশ করা হয়েছে তার কারণ হলো, আপনার যেন কোন অসুবিধা না থাকে এবং আপনার অন্তর যেন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহী গ্রহণের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং মানুষের নিকট আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী পৌঁছানোর কাজে আপনি সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতে পারেন'।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত বিধান পালনের ক্ষেত্রে যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তবে তিনি তা ক্ষমা করবেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, আর তিনি অতীব দয়াবান।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۭ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ
وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ
مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৫১) হে নবী! আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে আপনার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন এবং আপনি যাকে পৃথক করে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন দোষ নেই। এতে তাদের নয়ন জুড়াবে এবং তাদের কোন দুঃখ হবেনা এবং আপনি তাদেরকে যা

দেবেন, এতে তাদের প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের মনের কথা সবই আল্লাহ পাক জানেন এবং তিনি সব বিষয়ে অবগত, তিনি অত্যন্ত সহনশীল।

(৫২) (হে রসূল!) এরপর আপনার জন্যে অন্য কোন নারী হালাল নয় আর আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়; যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করে, তবে আপনার অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। আর আল্লাহ্ পাক সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে,

اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا......................

দেনমোহর ব্যতীত যদি কোন নারী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ের জন্যে আত্মনিবেদন করে, তবে তিনি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য নন; বরং এটি সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছাধীন, তিনি চাইলে তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন, অন্যথায় প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যাঁরা তাঁর স্ত্রী ছিলেন, তাঁদের সকলের জন্যে সমানভাবে সময় নির্ধারণেও তিনি বাধ্য নন, কম বেশী অথবা আগে পরে করার অধিকার তাঁর রয়েছে। এমনকি, যাকে পৃথক করে রেখেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁকেও পুনরায় গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাম্পত্য জীবনে এমন অবাধ স্বাধীনতা দেয়া সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও তাঁদের কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করেননি; বরং প্রত্যেক স্ত্রীর জন্যেই পালাক্রমে সময় নির্ধারিত ছিল। সমগ্র জীবনে এক্ষেত্রে কখনও তিনি কম বেশী করেননি।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, সারা জীবনে কখনো তিনি সমদর্শিতার উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিন্দুমাত্রও কসুর করেননি। বোখারী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হবার পরও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অনুমতি নিতেন, যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তখন আমি বলতাম, “যদি আমার শক্তি থাকত, তাহলে আমি আপনাকে কোন স্ত্রীর নিকট যেতে দিতাম না”।

মসনদে অহমদে রয়েছে, যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দাম্পত্য জীবনে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ রূপে সুবিচার করতেন, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাকের দরবারে এ পর্যায়ে আরজী পেশ করতেন, ‘হে পরওয়ারদেগার! আমার সাধ্য মোতাবেক আমি সুবিচার করেছি আর যা আমার সাধ্যাতীত, তার ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করোনা’।

তফসীরকারগণ বলেছেন, একথার তাৎপর্য হলো, প্রকাশ্য ব্যবহার সবার সঙ্গেই সমান করা যায় কিন্তু মন যদি কারো প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়, তবে তা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। আর আল্লাহ্ পাক সবার মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা স্বামীর জন্যে ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তা অবশ্য কর্তব্য ছিল না; বরং উম্মাহাতুল মোমেনীন যেন যে যা পান তাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন এবং পরস্পর হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, রেষারেষি বিদ্বেষের কারণে কোন রকম ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না হয়, তার জন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করা হয়েছে। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রেসালতের যে মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে পালনে এ ধরনের অবস্থা ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে, এ কারণেই তাঁর স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ ছিল দুনিয়ার আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য করোনা; বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহে ব্যস্ত হও।

কিন্তু তারপরও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের জন্যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং স্বামীসুলভ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালনেও তিনি তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। অবশ্য হযরত সওদা (রাঃ) বার্ধক্যের কারণে তাঁর সময়টি হযরত আয়েশা (আঃ)-এর জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। এজন্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীনের চেয়ে একটু বেশী সময় পেতেন।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط

'(হে রসূল!) এরপর আপনার জন্যে অন্য কোন নারী হালাল নয়; আর আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণও বৈধ নয়; যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করে, তবে আপনার অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়'।

শানে নুযুল

এবনে সা'দ একরামা (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর স্ত্রীগণকে তাঁর সাথে থাকার বা না থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেন, আর তাঁর স্ত্রীগণ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভকে সৌভাগ্য মনে করেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-২২

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যত প্রকার নারীকে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, তার অতিরিক্ত কোন নারীকে বিয়ে করা (হে রসূল!) আপনার জন্যে বৈধ নয়। বর্তমানে যারা আপনার স্ত্রী রয়েছেন অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে তাদের কাউকে পরিবর্তন করারও অধিকার আপনার নেই। অবশ্য বাঁদীদের ব্যাপারে এ বাধ্যবাধকতা নেই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আরোপিত এ নিষেধাজ্ঞা অবশেষে প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীর অদল-বদল করেননি। এমনকি, কোন বাঁদী-দাসীও তিনি রাখেননি, তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর সমস্ত স্ত্রীগণ তাঁর দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

কিন্তু বাঁদী দাসীর এ বাধ্যবাধকতা নেই, অর্থাৎ বাঁদী দাসীর অনুমতি রয়েছে, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সুযোগও গ্রহণ করেননি, হযরত মারিয়া কিবতিয়া এবং রাইহানা নাম্নী দু'জন বাঁদীই তাঁর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। আর তাঁরা বাঁদী হলেও দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মারিয়ার গর্ভে তাঁর পুত্র হযরত ইব্রাহীমের জন্ম হয়। উম্মুল মোমেনীন হযরত সফিয়্যা (রাঃ) মূলতঃ ইহুদী ছিলেন, বন্দী হয়ে আসলে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভাগে পড়েন, ইসলাম গ্রহণের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন। আর হযরত মারিয়া কিবতিয়া ছিলেন খৃষ্টান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাঁদী হবার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, ইতোপূর্বে যে সব মহিলাদের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, তাদের ব্যতীত অন্যদেরকে বিয়ে করা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে বৈধ ছিলনা। হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি এমন হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমস্ত স্ত্রীগণের এন্তেকাল হয়ে যায়, এমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে কি নতুন করে বিয়ে করা বৈধ ছিল? হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, বিয়ে করতে বাধা কি? তখন বলা হয়, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ

'এরপর আপনার জন্যে অন্য কোন নারী হালাল নয়'।

তখন উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বললেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বিশেষ কয়েক প্রকার মহিলাদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁদেরকে তাঁর জন্যে হালাল করা হয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতে যারা হারাম তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো মোমেন নারীদের সঙ্গে বিয়ের পর কোন ইহুদী বা খৃষ্টান নারীকে বিয়ে করা তাঁর জন্যে বৈধ নয়। আর কোন মুসলমান স্ত্রীকে বাদ দিয়ে কোন অমুসলিম নারীকে বিয়ে করাও তাঁর জন্যে বৈধ নয়। একথার তাৎপর্য হলো কোন ইহুদী বা খৃষ্টান নারী উম্মুল মোমেনীন বা মোমেন-জননী হবার যোগ্যতা রাখেনা।

অবশ্য আহলে কিতাব বাঁদী হতে পারে।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, যে সব মহিলাগণ তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে হালাল নয়। এর তাৎপর্য হলো, যাঁরা তখন তাঁর স্ত্রী ছিলেন, তাঁদের তালাক দেয়া অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, কেননা তাঁদেরকে 'উম্মাহাতুল মোমেনীন' বা মোমেন-জননী হবার গৌরব প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁদেরকে বিয়ে করা অন্যদের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে।[১]

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا

'আর আল্লাহ পাক সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ কে কিভাবে পালন করে আর কে অমান্য করে, তা আল্লাহ পাক লক্ষ্য করছেন। তাই তোমরা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন কর যত্নসহকারে, আর তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করোনা।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক সব বিষয় সম্পর্কে অবগত ও সব কিছুকে তিনি সংরক্ষণ করেন এবং পৃথিবীর সব কিছু তাঁর কর্তৃত্বাধীন রয়েছে।[২]

বরের পক্ষে কণেকে দেখা বৈধ

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে একথার প্রমাণ রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীকে বিয়ে করতে চায় তবে বরের পক্ষে কণেকে দেখা বৈধ। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪০৮-০৯
তফসীরে তাবারী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২২-২৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৯
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২২৩

এরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে চায় তবে সে যেন তাকে দেখে নেয়। (আবু দাউদ)

হযরত মুগীরা এবনে শোবা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একজন স্ত্রীলোককে বিয়ের পরগাম দেই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি তাকে দেখে নিয়েছ'? আমি আরজ করলাম 'না'। তিনি এরশাদ করলেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে বনিবনা হওয়ার জন্যে এটি উত্তম পন্থা।

(আহমদ তিরমিজী, এবনে মাজা, দারমী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তুমি তাকে দেখে নাও"। কেননা, আনসারী মহিলাদের চোখে কিছু-হয় অর্থাৎ কারো কারো চক্ষুর বর্ণ অস্বাভাবিক হয়।[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا
أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا
دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِن
تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

তরজমা

(৫৩) হে মোমেনগণ! তোমরা অনুমতি ব্যতীত নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) গৃহে প্রবেশ করোনা, কিন্তু যদি খাবার গ্রহণের জন্যে বলা হয়, তবে যেতে পার। খাবার প্রস্তুত হবার অপেক্ষায় বসে থাকতে পারবেনা; বরং যখন তোমাদের ডাক পড়বে তখন যাবে, আর যখন পানাহার শেষ হবে তখন চলে এস,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪১০

কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়োনা। তোমাদের এ আচরণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়, তিনি তোমাদেরকে বলতে সংকোচ করেন, কিন্তু আল্লাহ পাক সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। আর যখন তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পত্নীদের নিকট থেকে কোন কিছু চাইবে, তবে পর্দার অন্তরাল থেকেই চাইবে, তোমাদের এবং তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্যে এটিই উত্তম ব্যবস্থা, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়ার অধিকার তোমাদের নেই, তাঁর অবর্তমানে কখনো তাঁর কোন স্ত্রীকে তোমরা বিয়ে করতে পারবেনা। তোমাদের এমন আচরণ আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত বড় অপরাধ।

(৫৪) তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বিবাহ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। আর সেসব বিষয় নিষিদ্ধ করা হয় যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণ হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণ হয়েছিল।

শানে নজুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যখন জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর বিয়ে হয় তখন তিনি লোকদেরকে 'ওয়ালীমা'র দাওয়াত দেন, লোকেরা একত্রিত হয়, পানাহার করে, এরপর গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে পড়ে যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণ হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে তারা খোশ গল্পে মেতে উঠেছে, বিদায় হবার কোন লক্ষণ নেই, তখন তিনি নিজেই মজলিশ থেকে উঠে পড়েন, তাঁর দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনজন বসে গল্প-গুজবে লিপ্ত রইলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বাইরে তশরিফ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখলেন, তারা এখনো গল্প-গুজবেই মত্ত রয়েছে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় বাইরে তশরিফ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ

পর তারা বিদায় নিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বগৃহে তশরিফ আনেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আদব-কায়দা ও ভদ্রতার শিক্ষা

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে মুসলমানদেরকে আদব-কায়দা, ভদ্রতা এবং শিষ্টাচারের তা'লিম দেয়া হয়েছে।

(১) দাওয়াত ব্যতীত কোথাও খাবারের অনুষ্ঠানে যেতে নেই,

(২) খাবারের জন্যে আহবান করা না হলে সেখানে গিয়ে বসে থাকবেনা, এতে দাওয়াতকারী নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন।

(৩) পানাহারে শেষ হলে মজলিসে অহেতুক বসে থেকে গল্প-গুজবে মেতে উঠবেনা; বরং আহার শেষ হলে সেখান থেকে বের হয়ে পড়। কেননা যদি পানাহারের পর মেহমানগণ ঘরে বসে গল্প-গুজব করে, তবে গৃহকর্তা তার ব্যবস্থাপনাতেও অসুবিধার সম্মুখীন হন।

অতএব, পানাহারের পর বসে থেকে তাদের কষ্টের কারণ হয়োনা।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশ সমূহ যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহের ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু তবুও এর দ্বারা সমগ্র উম্মতকে সার্বজনীন ভদ্রতা, শিষ্টাচার এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এভাবে যদি মেহমানরা আসর জমিয়ে বসে, তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কষ্ট হয়, তিনি এ অবস্থায়ও তাঁর ভদ্রতা-নম্রতা এবং উদারতার কারণে মেহমানদেরকে কিছু বলতে সংকোচ করেন, কিন্তু আল্লাহ পাক তোমাদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কোন সত্য প্রকাশ করতে আদৌ সংকোচ করেন না।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, ইমাম বোখারী (রঃ), এবনে জরীর এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! 'আপনার নিকট ভাল-মন্দ সবাই আসে, যদি উম্মাহাতুল মোমেনীনকে পর্দা করার আদেশ দিতেন, তবে ভাল হতো'। ঠিক তখনই পর্দা সম্পর্কীয় এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত ঐ হাদীসও সংকলন করেছেন যা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

---

১ তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১০

এবনে আবি হাতেম, তেবরানী, এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং অনেকক্ষণ বসলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে করে সে-ও দাঁড়িয়ে যায় এবং চলে যায়। কিন্তু সে তা করলো না, ঐ মুহূর্তে হযরত ওমর (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলেন। তখন তিনি বসে থাকা ঐ লোকটির দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'মনে হয় তুমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছ'। তখন লোকটি অবস্থা উপলব্ধি করলো এবং দাঁড়িয়ে গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, 'আমি একাধিকবার দাঁড়িয়েছিলাম, যাতে করে সে আমার অনুসরণ করে, কিন্তু তা করেনি'। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'যদি আপনি পর্দার ব্যবস্থা করতেন, তবে ভাল হতো' কেননা, আপনার স্ত্রীগণ সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। আর এ ব্যবস্থা তাঁদের অন্তরের পবিত্রতার জন্যে উত্তম, তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বর্ণনায় আরো কিছু তথ্য সংযোজন করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সকল মেহমানদের চলে যাওয়ার পরও তিন ব্যক্তি গল্প-গুজবে মশগুল রইলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বের হয়ে পড়লেন এবং উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং 'আসসালামু আলাইকুম, আহলাল বায়েত ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' বললেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর সালামের জবাব দিলেন। এরপর কিছু সংক্ষিপ্ত কথা হলো। এভাবে তিনি অন্যান্য স্ত্রীগণের নিকটও তশরিফ নিয়ে গেলেন, এরপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন, ঐ তিন ব্যক্তি এখনও বিদায় নেয়নি; বরং গল্প-গুজবে মেতে আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে যেহেতু ভদ্রতা, উদারতা এবং লজ্জাশীলতা অনেক বেশী ছিল, তাই তিনি তাঁদেরকে কিছুই বললেন না, এরপর তিনি পুনরায় হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর যখন ঐ তিন ব্যক্তি চলে গেল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরিফ আনলেন এবং ঘরের চৌকাঠের মধ্যে কদম মোবারক রেখে পর্দা টেনে দিলেন। ঐ মুহূর্তে পর্দা সম্পর্কীয় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[২]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩০-৩১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪১২
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-২৪-২৫

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একথাও লিখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, তিনটি কথা আমি বলেছিলাম, আল্লাহ পাক পরবর্তীতে সে মোতাবেক পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

১. আমি আরজ করেছিলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম'! যদি 'মকামে ইব্রাহীম'কে কেবলা বানানো হতো তবে ভাল হতো। তখন কেবলা সম্পর্কীয় এ আদেশ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى নাযিল হয়।

২. আমি আরজ করেছিলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম'! আমার ভাল লাগেনা যে আপনার গৃহে সব ধরনের লোকই প্রবেশ করুক, আপনি যদি আপনার স্ত্রীগণকে পর্দা করার আদেশ দিতেন, তবে ভাল হতো'। এরপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পর্দার আদেশ নাযিল হলো।

৩. যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহিয়সী স্ত্রীগণ অভিমানের কারণে কিছু কথা-বার্তা বলতে লাগলেন, তখন আমি বলেছিলাম- 'আপনারা অহংকার করবেন না, যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাদেরকে বিদায় করে দেন, তবে আল্লাহ পাক আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী তাঁকে দান করবেন'। তখনও এ মর্মে আয়াত নাযিল হয়।[১]

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াত হযরত জয়নব (রাঃ)-এর বিয়ের ওলীমায় দাওয়াত উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, এতে পানাহার সম্পর্কীয় নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে, কারো বাড়িতে দাওয়াত হলে যাওয়া-আসার নিয়ম নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। আর একথাও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পর কষ্ট দেয়া হারাম বা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ আয়াত সমূহে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা শুরু করা হয়েছে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করার মাধ্যমে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

(হে ঈমানদারগণ!) এ সম্বোধনের মধ্যেই যে আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া-মায়ার ভাব প্রকাশিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট।

মূলতঃ এ সূরার শুরু থেকেই আল্লাহ পাক বিশেষভাবে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর অনন্ত অসীম দান-দক্ষিনায় এ সূরাটি পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। যেমন সর্বপ্রথম এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-২৪

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ

১. (হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

২. (হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর) এরপর পুনরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

৩. (হে নবী!) আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যদি দুনিয়ার এ জিন্দেগীকে প্রাধান্য দেয়ার ইচ্ছা করে।

৪. এরপর দু'বার يٰنِسَاءَ النَّبِىِّ বলে উম্মাহাতুল মোমেনীনকে সম্বোধন করে তাঁদের ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

৫. এরপর পুনরায় মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং তাঁর তসবীহ পাঠ কর সকাল সন্ধ্যায়।

৬. এরপর পুনরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا.............

(হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষী স্বরূপ)

৭. এরপর আবার মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ

(হে মোমেনগণ! যখন তোমরা মোমেনা নারীদেরকে বিয়ে কর, এরপর এ আয়াতে বিয়ে এবং তালাকের নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে)

৮. এরপর পুনরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ.........

(হে নবী!) আমি আপনার জন্যে হালাল করেছি, আপনার সে স্ত্রীগণকে যাদের দেন মোহর আপনি আদায় করে দিয়েছেন।) এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পর্কে যে বিশেষ নিয়ম-কানুন রয়েছে, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

৯. এরপর আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে মজলিসের আদব-কায়দা, নিয়ম কানুনের তা'লিম দেয়া হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ

'হে মোমেনগণ! তোমরা অনুমতি ব্যতীত নবীগৃহে প্রবেশ করোনা, তবে যদি তোমাদেরকে পানাহারের জন্য দাওয়াত করা হয় তবে যেতে পার। অতএব, অনুমতি ব্যতীত এবং দাওয়াত ব্যতীত নবী গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর যদি দাওয়াত দেয়া হয় তখনো সময়ের পূর্বে যাওয়া উচিত নয় এবং পানাহার শেষ হলে সেখান থেকে বিদায় নেয়া উচিত। গল্প-গুজবে মশগুল হওয়া অনুচিত। এসব কাজ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতীত নবীগৃহে প্রবেশ করা, দাওয়াত ব্যতীত যাওয়া, আর দাওয়াত হলেই খাবার প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই হাযির হয়ে যাওয়া এবং পানাহার শেষে গল্প-গুজবে মশগুল হওয়া অনুচিত। আল্লাহর নবীর কষ্টের কারণ হয়, অতএব তোমরা তাকে এমন অন্যায় আচরণের মাধ্যমে কষ্ট দিও না। তিনি ভদ্রতার কারণে তোমাদেরকে এসব ব্যাপারে কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন কিন্তু আল্লাহ পাক সত্য কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। তাই তিনি হক্ব কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কেননা এতেই রয়েছে তোমাদের কল্যাণ'।

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

আর যখন তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) পত্নীদের নিকট থেকে কোন কিছু চাইবে তবে পর্দার আড়াল থেকেই চাইবে, তোমাদের এবং তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্যে এটি উত্তম ব্যবস্থা। মোমেনদেরকে সম্বোধন করে ইতোপূর্বে সভ্যতা ভদ্রতার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতেও ভদ্রতা এবং সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ পর্দা প্রথা প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়া

হয়েছে। পর নারীর ক্ষেত্রে বা পর পুরুষের ক্ষেত্রে পর্দা অবশ্যই পালনীয় বিধান। এমনকি উম্মাহাতুল মোমেনীন বা মোমেন-জননীদের ব্যাপারেও এ বিধান অবশ্যই কার্যকর হবে। তাই মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি মোমেন-জননীদের নিকট কোন কিছু চাইতে হয়, তবে তাদের সম্মুখে যেতে পারবেনা; বরং পর্দার আড়াল থেকে তাদের নিকট চেয়ে নিতে হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর উম্মাহাতুল মোমেনীনের দিকে চোখ তুলে চাওয়ার অনুমতি কারো জন্যে ছিলনা, এটি আল্লাহ পাকের বিধান, অবশ্য পালনীয়।

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

(পর্দার এ বিধান তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে এক অনুপম ও অত্যাবশ্যকীয় সার্থক ব্যবস্থা।)

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ط

'আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়ার কোন অধিকার তোমাদের কারোই নেই, তাঁর অবর্তমানে কখনও তাঁর কোন স্ত্রীকে তোমরা বিয়ে করতে পারবে না, তোমাদের এমন আচরণ আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত বড় অপরাধ'।

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম এবনে যায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বলেছিল যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি তাঁর অমুক স্ত্রীকে বিয়ে করবো। এরপরই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তালহা এবনে আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি এমন অন্যায় কথা বলেছিল। সুফিয়ান (রঃ) বলেছেন, সে একথাটি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কেই বলেছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি তার কথার জন্য পরবর্তীতে তওবা করে একটি গোলাম আযাদ করেছিল এবং দশটি উট আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্যে দিয়েছিল এবং পদব্রজে হজ্জ করেছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সঙ্গে বিয়ে অবৈধ

যাহোক, এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পর এমন কোন আচরণ বৈধ

নয়, যা তাঁর মনে কষ্টের কারণ হতে পারে। কাফের, মুশরেক, মুরতাদ, মুনাফেক যে আচরণই করুক কিন্তু কোন মুসলমানের পক্ষে এমন কোন কাজ বৈধ নয়; যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে কষ্টদায়ক বা বিরক্তিকর হতে পারে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা ও মহিমার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ আদেশ জারি হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ মোমেনদের জননী, তাঁদের মর্যাদা অপরিসীম, তাঁরা সর্বজন শ্রদ্ধেয়া, তাঁরা সারা জীবন শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে উম্মতে মোহাম্মদীয়া তাঁর মহান আদর্শের অনেক মূল্যবান তথ্য উম্মাহাতুল মোমেনীনের মাধ্যমেই জানতে পেরেছে, যারা জননীর ন্যায় পরম শ্রদ্ধেয়া এবং চির শ্রদ্ধেয়া তাদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের কথা কল্পনাতীত। এজন্যে তা অবৈধ। দ্বিতীয়তঃ যদি এ কাজটি অবৈধ ঘোষিত না হত তথা উম্মাহাতুল মোমেনীনের সাথে বিয়ের অনুমতি হত তবে অনেকেই এভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দাবী করতো। উম্মতের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি হত। এজন্যে উম্মাহাতুল মোমেনীনের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ যদি মোমেন-জননীদের সাথে বিয়ের অনুমতি থাকতো তবে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা এবং কলহ দ্বন্দের সৃষ্টি হত। প্রত্যেকেই চেষ্টা করতো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীর সঙ্গে পরিণয় সম্পর্ক স্থাপন করে স্বনামে প্রাধান্য বিস্তার করতে। এজন্যে ইসলামে এ কাজকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। চতুর্থতঃ যদি উম্মুল মোমেনীনের সাথে বিয়ে বৈধ হত তবে তাঁদের উচ্চ মর্যাদা ক্ষুন্ন হত। পঞ্চমতঃ যদি তাঁদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ হত তবে তাঁদের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করতো এবং তারা মনে করতো, তাঁরা তাদের নতুন স্বামীদের কথাই হয়তো বলছেন। এমন অবস্থায় জ্ঞানের যে সম্ভার উম্মাহাতুল মোমেনীনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, তা থেকে উম্মত মাহরূম হয়ে যেত।[১]

এজন্যেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا

অর্থাৎ উম্মাহাতুল মোমেনীনের সাথে বিয়ের ব্যাপারটি আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত বড় অপরাধ।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠ-৫৪০

আর পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا

অর্থাৎ তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর বা গোপন কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত, তোমরা আল্লাহর রসূলের স্ত্রীদের সাথে বিয়ের কথা প্রকাশ কর বা মনে মনে রাখ সবই আল্লাহ পাক জানেন, এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাক তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সে ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বিয়ের কথা মনে মনে চিন্তা করেছিল। তার সম্পর্কেই এ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার আরও একটি কারণ হল, তাঁর দ্রব্য সামগ্রীর কেউ ওয়ারিশ হননি, আর তাঁর স্ত্রীগণও বিধবা হননি।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে এসে দরুদ পাঠ করে আমি তা নিজেই শ্রবণ করবো, আর যে দূর থেকে দরুদ পাঠ করে, সে দরুদ আমার নিকট পৌছানো হবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৬

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ
وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ
لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

তরজমা

(৫৫) নবী পত্নীগণের জন্যে তাদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতঃষ্পুত্রগণ, ভগ্নিপুত্রগণ এবং নিজেদের স্ত্রীলোকগণ এবং তাদের নিজেদের মালিকানাধীন গোলামদের সম্মুখে বের হওয়ায় কোন দোষ নেই। আর তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করে চল, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

(৫৬) নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্যে রহমতের দোয়া করে; হে মোমেনগণ! তোমরাও নবীর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

(৫৭) নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে 'লা'নত' দেন, আর তিনি তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি।

(৫৮) আর যারা মোমেন পুরুষ ও নারীদেরকে বিনা দোষে অপবাদ দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন পর্দা সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হলো তখন উম্মাহাতুল মোমেনীনের পিতা-ভ্রাতাসহ সকল নিকটাত্মীয়গণ বললেন, 'আমরাও এখন থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ থেকে পর্দা করবো, কথা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকেই বলবো, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে উম্মাহাতুল মোমেনীনকে পর্দায় থাকতে বলা হয়েছে এবং মোমেনগণকে তাঁদের সম্মুখে যেতে বারণ করা হয়েছে, তাই এ আয়াতে যাদের জন্যে উম্মাহাতুল মোমেনীনের সম্মুখে যাবার অনুমতি রয়েছে, তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যেই এসেছে। ইসলামে সংকীর্ণতা সম্পূর্ণ অপরিচিত, পিতা-ভ্রাতা বা নিকটাত্মীয় তথা 'মুহরেম'দেরকেও পর্দা করতে হবে এমন কথা ইসলাম বলেনা, ইসলামের প্রতিটি বিধান যুক্তিপূর্ণ, অতি সুন্দর, অতি কল্যাণকর অতএব, যা অযৌক্তিক তার স্থান ইসলামে নেই। তবে পর্দা করার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা পূর্বের ন্যায় আজকের পৃথিবীর মানুষও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। এজন্যে আল্লাহ পাককে ভয় করে পর্দা প্রথা উত্তমভাবে পালন করাই কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত ওরওয়া এবনে যোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ পর্দার আয়াত নাযিল হবার পর আবুল কোয়ায়েছের ভ্রাতা আফলাহ আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি চায়, আমি বললাম, যতক্ষণ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে অনুমতি না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অনুমতি দিতে পারিনা। আমাকে আবুল কোয়ায়েছের ভ্রাতা দুধ পান করায়নি, আবুল কোয়ায়েছের স্ত্রী দুধ পান করিয়েছিল, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গৃহে তশরিফ আনলেন, তখন আমি আরজ করলাম, আবুল কোয়ায়েছের ভাই আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু আমি আপনার সম্মতি ব্যতীত অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি,' তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'তুমি তোমার চাচাকে অনুমতি দাও'। আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এ পুরুষ লোকটি দুধ পান করায়নি; বরং আবুল কোয়ায়েসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'সে তোমার চাচা, তুমি তাকে অনুমতি দাও'।

হযরত ওরওয়া বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মত ছিল এই, যে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে কোন ব্যক্তি একজন স্ত্রীলোকের 'মুহরেম' হয়, দুধ পানের সম্পর্কের ভিত্তিতেও তেমনি 'মুহরেম' হতে পারে।

وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط

অর্থাৎ পর্দার বিধান পালনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, এ বিধান অমান্য করার শাস্তি সম্পর্কে সাবধান হও,

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا

'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন'।

গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি লক্ষ্য করেন, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকেনা। আল্লাহ্ পাক সর্বত্র বিরাজমান, বিশ্ব সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি সৎ কাজের পুরস্কার দান করবেন, মন্দকাজের শাস্তি অবধারিত। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক শুধু যে মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেন তাই নয়; বরং মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব ভাবনার অবতারণা হয়, তাও তিনি দেখতে পান। অতএব, সতর্কতা অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাকাই একান্ত কর্তব্য।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ..........

'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্যে রহমতের দোয়া করে, হে মোমেনগণ! তোমরাও নবীর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবা এবং শানের বিবরণ ছিল এবং উম্মাহাতুল মোমেনীনের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল, আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবা এবং শান বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ রয়েছে।

দরুদ শরীফ পাঠের গুরুত্ব ও মাহাত্ম

কেয়ামতের ময়দানের মহা বিপদের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফায়াতই হবে নাজাতের 'উসিলা'। অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া বা তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম বা অবৈধ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত নাযিল করেন, আর ফেরেশতাগণ তাঁর জন্যে রহমতের দোয়া করে, আর এ আয়াতে মোমেনগণকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে, হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ কর এবং তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অবশ্য কর্তব্য, যদিও সে দরুদ শরীফ জীবনে একবারই হোক না কেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের তাশাহহুদের পর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম আহমদ (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর নিকট তাশাহহুদের পর দরুদ শরীফ পাঠ করা সুন্নত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, যখনই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনা হয় তখন তাঁর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব।

ইমাম কারখী (রঃ) বলেছেন, যে সব ওলামায়ে কেরাম নামাজে দরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব বলেন, তাদের দলিল হলো সেই হাদীস যা এবনে সা'দের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'যে ব্যক্তি নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করলো না, তার নামাজ হয় না'।

আবু মসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ পড়লো কিন্তু আমার প্রতি বা আমার 'আহলে বায়েতে'র প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তার নামাজ কবুল করা হয়না।

হাকেম এবং বায়হাকী ইয়াহয়া এবনে সাবাকের সূত্রে বর্ণনা করে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তাশাহহুদ পাঠ করে তবে সে যেন বলে,

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى
ال محمد وارحم محمدا وعلى ال محمد كما صليت وباركت
وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এই হাদীসের এ ব্যাখ্যা করেছেন, যে আমার প্রতি দরুদ পড়লো না তার নামাজ পরিপূর্ণ হয়নি।

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এ পর্যায়ে ফোজালা এবনে ওবায়েদ বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাজের পর দোয়া করতে দেখলেন, কিন্তু সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করেনি, তখন তিনি এরশাদ করলেন, এ ব্যক্তি দোয়া করার ব্যাপারে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করেছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ নামাজ আদায় করে, সে যেন সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের 'হামদ' ও 'সানা' পেশ করে, এরপর আমার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করে, এরপর যা ইচ্ছা দোয়া করে।

(আবু দাউদ, নেসায়ী, তিরমিজী, এবনে খোজায়মা, এবনে হাব্বান, হাকেম)

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত ফোজালা বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামাজ আদায় করলো, এরপর বললো, 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'হে নামাজী! তুমি তাড়াহুড়া করে ফেলেছ, যখন তুমি নামাজ শেষ করে বসবে তখন আল্লাহ পাকের এমন 'হামদ' ও 'সানা' বর্ণনা করবে, যার তিনি অধিকারী, এরপর আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, এরপর তুমি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করবে'।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আরো এক ব্যক্তি আসলো এবং নামাজ আদায় করলো, আল্লাহ পাকের 'হামদ' বর্ণনা করলো এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করলো। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, এখন তুমি দোয়া কর, তোমার দোয়া কবুল হবে।

(তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার প্রতি সালাম পেশ করার পন্থা আমার জানা রয়েছে, কিন্তু দরুদ পেশ করার পন্থা কি? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ

اللهم صل على محمد........... পাঠ কর।

এই হাদীস দ্বারা একথা জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে দরুদের আদেশ রয়েছে তা হলো, নামাজে তাশাহহুদের পর যে দরুদ পাঠ করা হয়। আর যেহেতু এর আদেশ রয়েছে, তাই এটি ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত।

যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন যে, যখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখিত হয় তখনই তাঁর প্রতি দরুদ পেশ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তাদের দলিল হলো হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি যার সম্মুখে আমার আলোচনা হয় আর সে আমার প্রতি দরুদ পেশ না করে।

আর সে ব্যক্তিও ধ্বংস হোক যে রমজানের মাস পেল, অথচ তার মাগফেরাত হলোনা।

আর সে ব্যক্তিও ধ্বংস হোক, যে তার পিতা মাতা উভয়কে বা তাদের একজনকে জীবিত পেল, আর তারা সে ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের 'উসিলা' হলোনা (অর্থাৎ পুত্র বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমত না করার কারণে তারা ঐ পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট রইল, আর সে জান্নাত থেকে মাহরুম হয়ে গেল)। –তিরমিজী, এবনে হাব্বান

হযরত যাবের এবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার সম্মুখে আমার কথা উল্লেখিত হলো আর সে আমার প্রতি দরুদ পেশ করলো না, পরিণামে সে দোযখে চলে যাবে (আল্লাহ পাক তা থেকে দূরে রাখুন)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার নিকট জীব্রাঈল এসেছেন এবং বলেছেন, 'যে ব্যক্তির সম্মুখে আপনার আলোচনা হয় আর সে আপনার প্রতি দরুদ পেশ না করে আর এ কারণে সে দোযখে প্রবেশ করে, আল্লাহ পাক তাকে দূরে রাখুন'।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার সম্মুখে আমার নাম উল্লেখ করা হলো আর সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করলো না, সে বদনসীব হয়ে গেল।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির সম্মুখে আমার উল্লেখ করা হয় আর সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ না করে, সে কৃপণ।

তেবরানী হযরত ইমাম হোসায়েন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির সম্মুখে আমার উল্লেখ হলো, সে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা ছেড়ে দিল, সে জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেলবে।

নেসায়ী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার সম্মুখে আমার আলোচনা হয়, তার কর্তব্য হলো আমার প্রতি দরুদ পাঠ করা। কেননা, যে আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন (অথবা দশবার রহমত নাযিল করবেন)।

হযরত আবদুর রহমান এবনে আবি লায়লা বর্ণনা করেন, আমার সঙ্গে হযরত কা'ব এবনে আজুরাহ্র মোলাকাত হলো, তিনি আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে হাদীসের একটি 'তোহফা' দান করবো? যা আমি নিজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। আমি বললাম, "কেন নয়; অবশ্যই", (এমন 'তোহফা' আমাকে দান করুন।)

কা'ব (রাঃ) বললেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনাকে সালাম করার পন্থা তো আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আপনার প্রতি ও আপনার 'আহলে বায়েতে'র প্রতি আমরা দরুদ কিভাবে পাঠ করবো? তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ বল,

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد-اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد

হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা আপনার প্রতি দরুদ কিভাবে

পাঠ করবো, তখন তিনি এরশাদ করলেন, বলঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وازواجه وذرياته كما صليت على ابرهيم وبارك على محمد وازواجه وذرياته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد

মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পেশ করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্তবা বুলন্দ করবেন। তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীস। (বোখারী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার প্রতি সর্বাধিক দরুদ শরীফ পাঠ করবে। (তিরমিজী)

অন্য একখানি হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের কিছু ফেরেশতা পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে থাকে, তারা আমার নিকট আমার উম্মতের সালাম পৌঁছায়। (নেসায়ী, দারমী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখনই কেউ আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে তখনই আল্লাহ পাক আমার রুহ আমাকে ফেরত দেবেন, যেন আমি তার সালামের জবাব দেই। (আবু দাউদ)

অন্য একখানি হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নিজেদের গৃহগুলোকে কবর বানাবেনা (অর্থাৎ সেখানে নামাজ পড়বেনা, এমন যেন না হয়)। আর আমার কবরকে মেলা বানাবেনা এবং আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছবে।

হযরত আবু তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়, তাঁর চেহারা মোবারকে খুশীর ভাব ছিল, তখন তিনি এরশাদ করলেন, এই মাত্র জীব্রাঈল (আঃ) এসে আমাকে বলেছেন, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মতের কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি (একবার) দরুদ পেশ করলে আমি তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবো। আর আপনার উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি আপনার প্রতি একবার সালাম পেশ করে, আমি তার প্রতি দশবার শান্তি ও সান্ত্বনা নাযিল করবো। -(নেসায়ী, দারমী)

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার প্রতি অনেক দরুদ পেশ করি, আপনিই বলুন, কতবার দরুদ পেশ করবো? তখন তিনি এরশাদ করলেন, যত ইচ্ছা ততবার। আমি আরজ করলাম, আল্লাহ পাকের জিকর এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করার জন্যে যে সময় ব্যয় করি, তার এক চতুর্থাংশ দরুদ শরীফের জন্যে নির্দিষ্ট করি? তিনি এরশাদ করলেন, তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার, তবে তার চেয়ে বেশী করলে তোমার জন্যে উত্তম হবে। তখন আমি আরজ করলাম, যা কিছু জিকরের জন্যে সময় বের হয়, তার অর্ধেক সময় ব্যয় দরুদ শরীফের জন্যে করি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, যা ইচ্ছা কর তবে কি, তার চেয়ে বেশী করলে তোমার জন্যে উত্তম হবে। তখন আমি আরজ করলাম, তাহলে আমার দোয়ার দু' তৃতীয়াংশ সময় দরুদ শরীফ পাঠ করি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, যা ইচ্ছা কর তবে কি তার চেয়ে বেশী করলে তোমার জন্যেই উত্তম হবে। তখন আমি আরজ করলাম, তাহলে আমি আমার দোয়ার সমস্ত সময়ই আপনার প্রতি দরুদ শরীফ পেশ করবো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তাহলে তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং তোমার সব কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং তোমার সমস্ত গুনাহ দূরীভূত হবে। (তিরমিজী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি ৭০টি রহমত নাযিল করবেন।

হযরত রুআইফা (রাঃ) বণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে এবং এরপর এ দোয়াটি পাঠ করে,

اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى

(হে আল্লাহ! তাঁকে কেয়ামতের দিন দান কর তোমার নৈকট্যের 'মাকাম'।) তার জন্যে আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাসভবন থেকে বের হয়ে একটি বাগানে পৌছলেন এবং সেখানে সেজদারত হলেন, আর তাঁর সেজদা এত সুদীর্ঘ ছিল যে, আমার দুশ্চিন্তা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেল কি-না! আমি তাঁর অবস্থা দেখার জন্যে তাঁর নিকট পৌছলাম, তিনি তখন সেজদা থেকে মস্তক মোবারক উত্তোলন করলেন এবং এরশাদ করলেন, 'কি হয়েছে'? আমি আমার দুশ্চিন্তার কথা আরজ করলাম। তখন তিনি এরশাদ করলেন, জীব্রাঈল (আঃ) এসে আমাকে বলেছেন, আমি কি আপনাকে এ সুসংবাদ দেবনা যে, আল্লাহ্ পাক আপনার সম্মান বৃদ্ধির জন্যে এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার রসূলের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি রহমত নাযিল করবো। আর যে আমার রসূলের প্রতি সালাম পেশ করবে, আমি তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবো। (আহমদ)

হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, দোয়া আসমান ও জমীনের মাঝখানে বাধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে যতক্ষণ তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ না কর। দোয়ার কোন অংশই উপরের দিকে যায় না। (তিরমিজী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমের রবীয়া (রাঃ) তাঁর পিতার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি যত দরুদ শরীফ পাঠ করবে, ফেরেশতাগণ তার প্রতি ততই রহমত নাযিল করতে থাকবে, এখন বন্দার ইচ্ছা সে কম পাঠ করবে কি বেশী। (বগভী)

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্যে এক 'কিরাত' সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়, আর এক 'কিরাত' হলো ওহোদ পাহাড়ের সমান।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় দশবার করে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, আমার শাফাআত সে পেয়ে যাবে।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট হাযির হয়ে সালাম করলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সালামের জবাব দিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দে তাঁকে তাঁর পার্শ্বে বসতে দিলেন, যখন ঐ ব্যক্তির কাজ শেষ হলো, তখন তিনি চলে গেলেন। ঐ সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে আবুবকর! সারা পৃথিবীর অধিবাসীদের যত আমল উপরে ওঠে, একা এই ব্যক্তির আমল তার সমান ওঠে (আল্লাহর পাকের দরবারে যায়)।

(হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ) আমি আরজ করলাম, এমন কেন হয়? তিনি এরশাদ করলেনঃ যখন সকাল হয় তখন সে আমার প্রতি দশবার দরুদ পাঠ করে, আর তার দরুদ এমন হয়, যেমন সমগ্র সৃষ্টি জগতের দরুদ (অর্থাৎ তার দরুদ সমগ্র বিশ্ববাসীর দরুদের সমান মর্যাদা রাখে)।

আমি আরজ করলাম 'তা কোন্ দরুদ শরীফ'? তিনি এরশাদ করলেন, সে পাঠ করে–

اللهم صل على محمد النبى عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد كما ينبغى لنا ان نصلى عليه وصل على محمد النبى كما امرتنا ان نصلى عليه

হযরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ গুনাহকে এভাবে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি অগ্নিকে নিভিয়ে দেয়।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি 'সালাত' প্রেরণের তাৎপর্য

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর প্রতি 'সালাত' প্রেরণ করেন'। অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। আর সে রহমতও সাধারণ রহমত নয়; বরং বিশেষ রহমত আর যা তাঁর উচ্চ মর্তবা এবং শান মোতাবেক হয়। আর ফেরেশতাদের 'সালাত' প্রেরণের অর্থ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্তবা বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ দোয়া অর্থাৎ ফেরেশতাগণ সর্বদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্তবা বৃদ্ধির জন্যে দোয়া করতে থাকে এবং তাঁর মর্তবা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বদা বৃদ্ধি হতে থাকে।

১। তাফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪১৯-২৪

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আঃ)-কে সম্মানসূচক সেজদা দিয়েছিলো, আর এটি ছিল নিঃসন্দেহে তাঁর বিশেষ মর্যাদা এবং ফজিলত। কিন্তু সে বিষয়টি ছিল একটি সাময়িক ব্যাপার। পক্ষান্তরে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে ফেরেশতাদের দোয়া করা সাময়িক ব্যাপার নয়; বরং এটি একটি স্থায়ী বিষয়, কেননা কেয়ামত পর্যন্ত ফেরেশতাদের এ দোয়া অব্যাহত থাকবে। এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চতম মর্তবা সর্বদা বৃদ্ধি হতে থাকবে, এতে তাঁর শান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে ফেরেশতাদের অনুসরণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ 'হে মোমেনগণ! তোমরাও ফেরেশতাদের ন্যায় আমার নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর'।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ পাকের 'মা'রেফাত' হাসিল করার তথা হেদায়েত ও কল্যাণ লাভ করা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যম ব্যতীত সম্ভবই নয়; তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে এহসান উম্মতের উপর রয়েছে, সেজন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উম্মতী মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য, কিন্তু তবুও তাঁর এহসানের হক্ব আদায় হবেনা, এজন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর মর্তবা বৃদ্ধির জন্যে আরজী পেশ করতে থাকা মোমেন মাত্রেরই পবিত্রতম দায়িত্ব। সমগ্র জীবনে একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা ফরজ, এমনভিাবে কোন মজলিসে তাঁর মোবারক নাম শ্রবণ করলে একবার তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা ওয়াজিব। এভাবে সারা জীবন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করতে থাকলেও তাঁর যে এহসান উম্মতের প্রতি রয়েছে, তার বদলা কখনো হবেনা; বরং দরুদ ও সালাম হলো উম্মতের পক্ষ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সামান্যতম 'হাদীয়া' মাত্র।

যেহেতু আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে 'হাদীয়া' পেশ করারও যোগ্য নই; এজন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারেই আমরা বিনীতভাবে এভাবে আরজী পেশ করি ঃ

اللهم صلى على محمد। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে আপনার পেয়ারা হাবীব হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত নাযিল করুন, আমাদের সালাত ও সালাম তাঁকে পৌছে দিন, আমরা গুনাহগার উম্মত, এর যোগ্য নই যে, তাঁর শান মোতাবেক কোন 'হাদীয়া তোহফা' তাঁর জন্যে প্রেরণ করতে পারি।

প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক তো সর্বদা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত নাযিল করছেনই, এমতাবস্থায় আমাদের একথার সার্থকতা কোথায়?

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাবে বলেছেন, এর দৃষ্টান্ত হলো কোন চাকর যদি তার মুনীবের আপনজনের জন্যে সুপারিশ করে, তবে মুনীবের নিকট আপনজনের পাশাপাশি সুপারশকারী এ চাকরও প্রিয় হয়ে ওঠে, ঠিক এমনিভাবে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে তারা প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়, এটিই কাম্য, আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করার এতো ফজিলত ও মাহাত্ম।[১]

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

'যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে 'লা'নত' দেন এবং তিনি তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি'।

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করার এবং তাঁর জন্যে কষ্টদায়ক কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে।

আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয় তারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই অভিশপ্ত, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া যেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাককে কষ্ট দেয়া, আর আল্লাহ্ পাককে কষ্ট দেয়ার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যাদের কথা এ আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলো ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরেক, কেননা তারাই এমন আপত্তিকর কথা বলতো যা আল্লাহ পাকের শানে বেআদবীপূর্ণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লা আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে কষ্টদায়ক হতো, যেমন ইহুদীরা বলতো, عزير ابن الله (ওজায়ের আল্লাহ্ পুত্র, (নাউজুবিল্লাহ.....) ان الله فقير ونحن اغنياء (আল্লাহ্ ফকীর, আমরা ধনী,

১। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালামের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে পড়ুন এই লেখকের অনূদিত "দরুদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম" গ্রন্থখানি।

(নাউজুবিল্লাহ......) আর খৃষ্টানরা বলতো, المسيح بن الله। (ঈসা (আঃ) হলেন আল্লাহর পুত্র, (নাউজুবিল্লাহ......) তারা আরও বলতো, ان الله ثالث ثلثة। (আল্লাহ তিন জনের একজন (নাউজুবিল্লাহ...) আর পৌত্তলিকরা বলতো, ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর কন্যাগণ, মূর্তি হলো তাদের পূজনীয় এবং আল্লাহর শরীক (নাউজুবিল্লাহ....)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ 'আদম সন্তানরা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আর তা তাদের জন্য বৈধ ছিলনা, 'আদম সন্তানরা আমাকে গালি দিয়েছে, আর তা-ও তাদের জন্যে বৈধ ছিলনা'। 'আমাকে মিথ্যাজ্ঞান' করা হলো এই, আদম সন্তানরা বলে, 'আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না'। অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন। আর 'আমাকে 'গালি' দেয়া হলো' এই, আদম সন্তানরা বলে, 'আল্লাহ পাক সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই, কারো পিতা নই, আমি কারো সন্তান নই, আমার কোন দৃষ্টান্ত নেই'। এ মর্মে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা হলো এরূপ ঃ 'আমাকে গালি দেয়া হলো', আদম সন্তানরা বলে, 'আমার সন্তান রয়েছে, অথচ আমি স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র'। (বোখারী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ 'আদম সন্তানরা সর্বদাই আমাকে গালি দিয়ে দুঃখ দিয়েছে, অথচ আমার হাতে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা, আমিই রাত এবং দিনকে পরিবর্তন করে থাকি'।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, 'আল্লাহকে 'কষ্ট' দেয়া'র তাৎপর্য হলো, 'আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম এবং গুণাবলীর মধ্যে বক্র অর্থ অনুসন্ধান করা'।

একরামা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাককে কষ্ট দেয় চিত্র অংকনকারীরা।

বিখ্যাত মোহাদ্দেস আবু জুরআ (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ 'সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে যে আমার সৃষ্টির মধ্যে 'সৃষ্টি' করে, যদি সে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা তৈরী করতে পারতো, অথবা একটি 'দানা' বা একটি 'যব' তৈরী করে দিত'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি চিত্র অংকন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে শাস্তি দেবেন এবং চিত্রে প্রাণ দেয়ার

জন্যে তাকে বলবেন, কিন্তু সে কখনো প্রাণ দিতে পারবেনা এবং শাস্তি থেকেও কখনো রেহাই পাবেনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ পাককে কষ্ট দেয়ার তাৎপর্য হলো পাপচারে লিপ্ত হওয়া, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করা, কেননা আল্লাহ পাক সকল সুখ-দুঃখ থেকে পবিত্র।

وَرَسُوْلَهٗ

'যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় (তারাও অভিশপ্ত)'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া'র তাৎপর্য হলো লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারককে আহত করেছে, (ওহোদের যুদ্ধের দিন) তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ করেছে, মক্কাবাসী কাফেররা তাঁকে যাদুকর, কবি, পাগল বলেছে (নাউজুবিল্লাহ...)। এসবই হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা এমন কাজ করে যা আল্লাহর রসূলের অপছন্দনীয়, আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'আল্লাহকে কষ্ট দেয়া'র কথা বলা হয়েছে এজন্যে যে, তারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত, আর এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্যে 'আল্লাহকে কষ্ট দেয়া'র কথা বলা হয়েছে'।

এবনে আবি হাতেম উফীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হযরত সফিয়্যা বিনতে হাইকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবং তার সঙ্গীদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তারা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদ দিয়েছিল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ভাষণ দান করলেন। তিনি এরশাদ করলেন ঃ 'এ ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয় এবং যারা আমাকে কষ্ট দেয় তাদেরকে নিজের বাড়ীতে একত্রিত করে, তার পক্ষ থেকে আমার সম্মুখে কে কৈফিয়ত পেশ করতে পারে'? তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয় তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের 'লা'নতের কথা ঘোষণা করা হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ 'যে আমার কোন ওলীকে

অপমানিত করে' (আর অন্য বর্ণনায় রয়েছে) 'যে আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা করে, সে যুদ্ধের জন্যে আমার মোকাবেলায় আসে'। (আল হাদীস)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন এরশাদ করবেন ঃ 'হে বনী আদম! আমি অসুস্থ হয়েছি, কিন্তু তুমি আমার খোঁজ-খবর করোনি', বন্দা আরজ করবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমার খোঁজ-খবর নেব, তুমি যে বিশ্ব প্রতিপালক (তুমি যে সকল ব্যাধি থেকে পবিত্র)'। আল্লাহ পাক তখন এরশাদ করবেন, 'তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বন্দা অসুস্থ হয়েছিল, যদি তুমি তার খোঁজ-খবর নিতে তবে আমাকে সেখানে পেতে'। (আল হাদীস)

পূর্ববর্তী হাদীসে 'আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে শত্রুতা' করাকে 'আল্লাহ পাকের সঙ্গে 'মোকাবেলা'র নামান্তর বলা হয়েছে। এমনিভাবে, আল্লাহর কোন বন্দার রোগকে 'আল্লাহর রোগ' বলা হয়েছে (অথচ তিনি এসব দুর্বলতা থেকে পবিত্র), ঠিক তেমনি 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া' স্বয়ং 'আল্লাহ পাককে কষ্ট দেয়া'র শামিল বর্ণনা করা হয়েছে।

لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাতে উভয় জাহানে লা'নত দেন (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করেন) এবং তাদের জন্যে তিনি অপমানজনক শাস্তি তৈরী করেছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি

যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোনভাবে কষ্ট দেয়, তাদের পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ। শরীয়তের ভাষায় এটি 'কুফর'। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সে অভিশপ্ত। আল্লাহ পাকের 'লা'নত' তার প্রতি পতিত হয় অহরহ। তার শাস্তি অবধারিত। এ আদেশ শুধু সে যুগের জন্যেই নয়; বরং আধুনিক কালেও যারা এমন জঘন্য অপরাধ করে তাদের শাস্তিও নিশ্চিত। কুখ্যাত সালমান রুশদী সহ যারাই এ অপরাধ করেছে বা করবে, তারা অবমাননা, 'লা'নত' বা কঠিন শাস্তি থেকে কখনো রেহাই পাবেনা।

এবনে হুমাম লিখেছেন ঃ যে ব্যক্তি মনে মনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে মন্দ ধারণা রাখে, সে মুরতাদ হয়ে যায়।

আর যে হতভাগা তাঁকে মন্দ বলার ধৃষ্টতা দেখাবে, ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। পরবর্তীতে সে তওবা করলেও নির্ধারিত মৃত্যুদন্ড থেকে রেহাই পাবেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ মত পোষণ করেন ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এবং ইমাম মালেক (রঃ)। একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবুবকর (রাঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন। যদি এমন কোন অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে আসে, অথবা অপরাধকে অস্বীকার করে আর তা প্রমাণিত হয়, তবে উভয় অবস্থায় তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, যদি কেউ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলার ধৃষ্টতা দেখায়, তবু তাকে ক্ষমা করার অবকাশ নেই। তার মৃত্যুদন্ড বহাল থাকবে। অবশ্য এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যাবে যে, নেশাকর পানীয় সে স্বেচ্ছায় পান করেছে? নাকি এজন্যে তাকে বাধ্য করা হয়েছে, যদি স্বেচ্ছায় নেশাকর বস্তু পান করে থাকে, তবে তার মৃত্যুদন্ডের শাস্তি বহাল থাকবে। কিন্তু যদি তাকে নেশাকর বস্তু পানে বাধ্য করা হয় তবে তাকে পাগল হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং ঐ শাস্তি থেকে সে অব্যাহতি পাবে।[১]

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

'এবং যারা বিনা দোষে মুসলমান পুরুষ এবং নারীকে অপবাদ দেয় তারা মিথ্যার বোঝা এবং প্রকাশ্য গুনাহ বহন করে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা দোষারোপ করার ধৃষ্টতা দেখায় তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা ঈমান আনে, তাদের প্রতি যারা অপবাদ দেয় তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াত সম্পর্কে তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত খানি হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, কেননা মুনাফেকরা হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছিল। এভাবে কিছু লোক হযরত আলীকে মন্দ বলেছিল। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'হে আলী! তুমি আমার থেকে, আর আমি তোমার থেকে'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২৮

তফসীরকারগণ বলেছেন, যার সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হোক, কিন্তু এর বিধান সবার ব্যাপারেই প্রযোজ্য। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোগাফফাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার সাহাবাদের ব্যাপারে, কেউ আমার সাহাবাদেরকে তিরস্কার করবে না। যে আমার সাহাবাদের সঙ্গে মহব্বত রাখবে তা আমার মহব্বতের কারণেই রাখবে, আর যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখবে সে আমার সাথেই শত্রুতা রাখবে। যে আমার সাহাবাদেরকে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করলো। আর যে আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করলো, তাকে আল্লাহ পাক অচিরেই আযাবে গ্রেফতার করবেন।

যাহ্যাক এবং কালবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে কয়েকজন মুনাফেক দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে, এরা রাত্রিবেলা মদীনা শরীফের রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করতো, মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করতো, যদি মেয়েরা তাদেরকে ধমক দিত তবে তারা বিরত হত, আর যদি মেয়েরা নীরব থাকতো তবে তাদেরকে কষ্ট দিত। বিশেষতঃ তারা মুসলিম বাঁদীদের পেছনে পড়তো। মদীনাবাসী মহিলারা তাদের স্বামীদের নিকট ঐ দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, স্বামীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে আরজী পেশ করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং এ আয়াতে এমন দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

যারা মোমেন নর-নারীকে কষ্ট দেয়, তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদের প্রতি মিথ্যা কলহ চাপিয়ে দেয়, তাদের এ মহা পাপের দুর্বহ বোঝা তাদেরকেই বইতে হবে এবং এর কঠিন শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি যারা অপবাদ আরোপ করেছে, তারা শুধু যে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে তাই নয়; বরং স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও তারা কষ্ট দিয়েছে। অতএব, এর ভয়াবহ পরিণতি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

এমনিভাবে হযরত আলী (রাঃ)-কে যে গালি দেয় সে শুধু হযরত আলী (রাঃ)-কেই কষ্ট দেয়না; বরং স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও কষ্ট দেয়। তাই এমন লোকের শাস্তি অবধারিত। যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলার ধৃষ্টতা দেয়ায়, তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন নবীকে গালি দেয় তাকে মৃত্যুদন্ড দাও'। (বোখারী)

'আর কোন ব্যক্তি যদি আমার সাহাবাদের মধ্যে কাউকে গালি দেয় তবে তার যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা কর'।

হাদীস শরীফে কুখ্যাত কা'ব এবনে আশরাফ এবং আবু রাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করার শাস্তি স্বরূপই তাদের ব্যাপারে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের দিন যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল, তখনও এবনে খতল নামক এক দুর্বৃত্ত ও তার বাঁদীদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল, কেননা ঐ বাঁদীরা গীতের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করতো, আর এই একই অপরাধে মক্কার কুখ্যাত আকাবা এবনে আবি মুয়ীতকেও মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল।

বনী খতমা গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করতো, তাকেও অনুরূপ শাস্তি দেয়া হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ একজন অন্ধ ব্যক্তির একটি বাঁদী ছিল। সে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করতো, ঐ অন্ধ ব্যক্তি এ অপরাধে ঐ বাঁদীকে হত্যা করে, এ ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হলে তিনি কোন শাস্তির কথা ঘোষণা করেননি।

আবু বারজা আসলামী বর্ণনা করেন যে, আমি প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করছিল, তখন আমি আরজ করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খলীফা! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ লোকটির ব্যাপারে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করি', তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'এ বৈশিষ্ট্য শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের, তাঁকে কেউ গালি দিলে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড, অন্য কারো ব্যাপারে এ শাস্তি নয়'।

হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ) তাঁর কুফার শাসনকর্তাকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'যদি কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করে তবে তার ব্যাপারে মৃত্যুদন্ড কার্যকর কর, কিন্তু আর কাউকে গালি দিলে এ শাস্তি দেয়া হবেনা'।

খলীফা হারুন-অর-রশীদ যখন এ সম্পর্কে ইমাম মালেক (রঃ)-এর মত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন ইমাম মালেক (রঃ) লিখেছিলেন ঃ 'যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করে, তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া ওয়াজিব, আর যে কোন সাহাবীকে মন্দ বলে তাকে যেন বেত্রাঘাত করা হয়'।

আল্লামা কাজী ইয়াজ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আস শিফা বেতা'রীফে হক্কুল মোস্তফা'র ২য় খন্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।[১]

يٰٓاَيُّهَا

النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ

وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ

لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ

اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي

الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

তরজমা.

(৫৯) হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে ও কন্যাদেরকে ও মোমেনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, যেন তারা চাদরকে নিজেদের উপরে একটু নীচু করে টেনে দেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করতে পারবেনা, আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৬০) মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং মদীনা শরীফে যারা মিথ্যা গুজব রটায়, যদি তারা বিরত না হয় তবে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল করে দেব। এরপর এ শহরে তারা আপনার প্রতিবেশী রূপে অল্প সময় ব্যতীত থাকতে পারবেনা।

(৬১) তারা অভিশপ্ত, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

(৬২) এটি আল্লাহর বিধান, ইতোপূর্বে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যেও আল্লাহ পাকের এ বিধান কার্যকর ছিল, আর আল্লাহ পাকের বিধানে আপনি কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেন না।

১। আস শিফা খন্ড-২, পৃষ্টা-৪৮৫-৪৯৭ দ্রষ্টব্য

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মোমেনদেরকে যারা কষ্ট দিত, সাধারণভাবে তাদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াত থেকে বিশেষভাবে যারা বিভিন্নমুখী অপ-তৎপরতার মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রীগণসহ মোমেনগণকে কষ্ট দিত, তাদের উল্লেখ রয়েছে। এ পর্যায়ে মুনাফেক এবং কাফেররা দু'টি পন্থা অবলম্বন করতো ঃ

(১) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তথা উম্মাহাতুল মোমেনীনসহ অন্যান্য মোমেন নারীগণকে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করতো।

(২) আর এমন ভিত্তিহীন গুজব রটিয়ে দিত, যা মুসলমানদের জন্যে অশান্তি ও দুশ্চিন্তার কারণ হতো।

আলোচ্য আয়াত সমূহে মুনাফেক ও কাফেরদের এ দু'টি অপকর্মের দ্বার রুদ্ধ করার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে।

শানে নুযুল

এবনে সা'দ 'তবকাতে' হযরত আবু মালেক (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, আর এমনি বর্ণনা হযরত হাসান এবং মোহম্মদ এবনে কা'ব কারযীর সূত্রেও এসেছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার প্রয়োজনে রাত্রিকালে যখন বের হতেন, তখন মুনাফেক দুর্বত্তরা তাঁদেরকে উত্ত্যক্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হতো। তাঁরা এ মর্মে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অভিযোগ করলেন এবং তিনি তখন মুনাফেকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা বললো, 'আমরা উম্মাহাতুল মোমেনীনের শানে এমন বেআদবী করিনা, তবে বাঁদীদের সঙ্গে এসব আচরণ করা হয়'। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

'হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে এবং কন্যাগণকে ও মোমেন স্ত্রীগণকে আদেশ দিন যেন তারা চাদরের কিছু অংশ মাথা থেকে নামিয়ে মুখের উপর ঝুলিয়ে দেয় এবং ঘোমটা টেনে রাখে। তাদেরকে চিনতে পারার জন্যে এটি উত্তম পন্থা, এর ফলে কেউ তাদেরকে আর উত্ত্যক্ত করতে পারবেনা'।

পর্দা প্রথার গুরুত্ব

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক মুসলিম মহিলাদেরকে এ আদেশ দিয়েছেন যেন তারা তাদের মাথা এবং চেহারা এবং সারা শরীর ঢেকে রাখে, যাতে করে জাহেলিয়াতের যুগের মহিলাদের থেকে তারা স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারেন। এভাবে দাসী বাঁদী ও আযাদ মহিলাদের মধ্যেও পার্থক্য প্রকাশ পায়।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হবার পর যখনই একান্ত প্রয়োজনে মুসলিম মহিলাগণ ঘর থেকে বাইরে যেতেন, তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ এভাবে ঢেকে রাখতেন যে, তাদের দু'টি চক্ষু ব্যতীত অন্য কিছুই দেখা যেতনা। আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতেও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কর্তব্য হলো, নিজেকে ঢেকে রাখা এবং নিতান্ত প্রয়োজনে বাইরে গেলেও নিজেদের সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সজাগ, সতর্ক এবং সাবধান থাকা। বাঁদী দাসীদের ব্যাপারে পর্দার এমনি কড়াকড়ি নেই, কেননা কর্তব্য পালনে তাদেরকে অনেক সময় বাইরে যাওয়া আসা করতে হয়। পর্দা প্রথার উপর আমল করা হলে অনেক অশান্তি দূর হতে পারে। সমাজ ও জাতীয় জীবনে শান্তি শৃংখলা ফিরে আসতে পারে। স্মরণ রাখা দরকার, পর্দাহীনতাই অবশেষে বেহায়াপনার কারণ হয়, আর সে বেহায়াপনাই অশ্লীলতার কারণে পরিণত হয়, আর তা আল্লাহ পাকের গজবকে ডেকে আনে, এমন অবস্থায় সমাজ ও জাতির ধ্বংস হয় অনিবার্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

متى يفشوا الزنا يكثر الهزل

'(কোন সমাজে) যখনই ব্যাভিচার প্রসার লাভ করবে, তখনই হত্যাকান্ড বেড়ে যাবে'।

আজকের পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই হাদীসের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে এতটুকু বিলম্ব হয়না। আর এজন্যে কোরআনে করীমে নারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

'আর তোমরা ঘরেই থাক এবং জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা'। আর পুরুষদেরকে এ আদেশ দেয়া হয়েছে,

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ..........

'তোমরা সালাম এবং অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ করোনা'।

যদি বিষয়টিকে কোন বুদ্ধিমান লোক বাস্তব দৃষ্টিতে দেখে তবে কোরআনের এ বিধান তথা পর্দা প্রথাকে সে নারীর সম্মান-মর্যাদা এবং ইজ্জত আব্রুর হেফাজতের দিক থেকে 'রক্ষাকবচ' মনে করবে। পর্দা প্রথার অভাবে নারীর মান-ইজ্জত, সতীত্ব-পবিত্রতা বিপন্ন হতে বিলম্ব হয় না। এমনকি, পর্দাহীনতার কারণে ক্ষেত্র বিশেষে সংসার হয় ছারখার, জীবন হয় অশান্ত এবং দুর্বিষহ। মানব সভ্যতার এ পতনোম্মুখ যুগে পর্দাহীনতার তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কিছু অপরিণামদর্শী লোকেরা পর্দা প্রথাকে 'নারীর গোলামী' মনে করে, আর নারীকে ঘরের বাইরে টেনে আনাকেই 'নারী স্বাধীনতা' মনে করে, অথচ নারী প্রগতির তথাকথিত পীঠ স্থান পাশ্চাত্য জগতে নারী চরম অবহেলিত, তাদেরকে গৃহ-বিমুখ করে রাখা হয়েছে, কঠোর কায়িক পরিশ্রমে বাধ্য করা হচ্ছে, অর্ন্তজ্বালার অগ্নিকুন্ডে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, নারী স্বাধীনতার নামেই এসব কিছু করা হচ্ছে, পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নারী জাতির জন্যে যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার উপর আমল করার মাধ্যমেই শুধু মানব সভ্যতা রক্ষা পেতে পারে। নারী সমাজ তার প্রাপ্য অধিকার লাভ করতে পারে এবং সমাজ ও জাতীয় জীবনে ফিরে আসতে পারে শান্তি ও শৃংখলা।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

অর্থাৎ নারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষায় পর্দা প্রথার প্রচলনে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, তবে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই, কেননা আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি অতীব দয়াবান, মানুষ যদি কৃত অন্যায় স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়, আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং আত্মসংশোধনে ব্রতী হয়, তবে করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা-ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। আল্লাহ্ পাক তাঁর গুনাহগার বন্দাকে মাফ করে থাকেন।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ

'মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা মদীনা মোনাওয়্যারায় মিথ্যা গুজব রটায় যদি তারা তাদের অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তবে (হে রসূল!) আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল করে দেব। এরপর তারা এ শহরে আপনার প্রতিবেশী রূপে অল্প সময় ব্যতীত থাকতে পারবে না'।

মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে শাস্তির ঘোষণা

মুনাফেকরা মোমেন নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করার যে ঘৃণ্য অপকর্মে লিপ্ত ছিল এবং গুজব রটিয়ে মুসলমানদেরকে যেভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতো, তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এ আয়াতে। পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেন নারীগণকে পর্দা প্রথা প্রচলনের এবং সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এরপরও যদি মুনাফেকরা তাদের অসভ্য আচরণ থেকে বিরত না হয় তবে অচিরেই আল্লাহ পাক মুসলমানদের এত শক্তিশালী করে দেবেন এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যে, এ দূরাত্মা মুনাফেকরা প্রাণের মদীনা থেকে পলায়নে বাধ্য হবে। (হে রসূল!) যদি এ মুনাফেকরা মিথ্যা গুজব রটিয়ে সাধারণ মুসলমানকে আতংকিত করার অপচেষ্টা পরিহার না করে তবে আল্লাহ পাক এমন অবস্থা সৃষ্টি করবেন যে, এ দূরাত্মা মুনাফেকরা তাদের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হবে। আপনার কাছেও আসতে পারবে না, আর যেখানেই থাকবে অভিশপ্ত জীবনই যাপন করবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا

'তারা অভিশপ্ত, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে তাদেরকে হত্যা করা হবে'।

দূরাত্মা মুনাফেকরা একদিকে রাস্তাঘাটে মোমেন নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করতো, অন্যদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে যখন কোথাও জেহাদের জন্যে প্রেরণ করতেন তখন তারা এ গুজব রটাতো, 'যারা এ অভিযানে গিয়েছে সকলেই শেষ হয়ে গেছে'। অথবা এ গুজব রটাতো যে 'তারা পরাজিত হয়ে গেছে', আর কখনও এ ভিত্তিহীন কথা বলতো যে, 'অদূর ভবিষ্যতে দুশমনরা মদীনা শরীফ আক্রমণ করবে'। এসব গুজব রটিয়ে তারা মদীনা শরীফের অধিবাসীদের আতংকিত করতে চেষ্টা করতো, তাদের উদ্দেশ্যেই এ সতর্কবাণী।

لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا

'(হে রসূল!) আমি আপনাকে তাদের উপর এমনভাবে প্রবল করে দেব যে তারা আর বেশী দিন আপনার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে না'। কেননা হয়তো তাদেরকে মদীনা মোনাওয়্যারা থেকে বহিস্কার করা হবে অথবা তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

'এটি আল্লাহর বিধান', ইতোপূর্বে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যেও আল্লাহ্ পাকের এ বিধান কার্যকর ছিল, আর আল্লাহ্ পাকের বিধানে আপনি কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেন না'।

অর্থাৎ দূরাত্মা মুনাফেকদের সম্পর্কে যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা নতুন কিছু নয়; বরং ইতোপূর্বেও নবী রসূলগণের বিরুদ্ধে যারা এমন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে অনিবার্য কারণেই অনুরূপ শাস্তি দেয়া হয়েছে। এটি আল্লাহ্ পাকের চিরাচরিত নিয়ম, শাশ্বত নীতি। এতে কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি নিজে এতে কোন পরিবর্তন করেন না, আর কোন সৃষ্টির এ শক্তি নেই যে, আল্লাহ্ পাকের নিয়ম-নীতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন করতে পারে।[১]

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا
يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَٰفِرِينَ
وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَا أَطَعْنَا
اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ
لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا
مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

তরজমা

(৬৩) (হে রসূল!) লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, 'এর কথা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন', আপনি তা কি করে জানবেন? হয়তো সে মুহূর্তটি অতি নিকটেই রয়েছে।

(৬৪) আল্লাহ্ পাক কাফেরদেরকে লা'নত করেছেন, আর তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৩১-৩২

(৬৫) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, আর কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।

(৬৬) যেদিন তাদেরকে উপুড়মুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে সেদিন তারা বলবে, 'হায়! যদি আমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলতাম তবে কতই না ভাল হতো'!

(৬৭) তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের নেতা ও প্রধানদের কথা মেনেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল'।

(৬৮) হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাঁদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত দাও'।

(৬৯) হে মোমেনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ্ পাক তাঁকে তাদের উক্তি থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন, আল্লাহ্ পাকের নিকট তিনি ছিলেন সম্মানিত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে যারা অস্বীকার করে এবং মুসলমানদের যারা কষ্ট দেয় তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, যারা কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই তাদেরকে বলতেন, আখেরাতে প্রতিটি মানুষকে তার এ জীবনের কার্যকলাপ সম্পর্কে জবাবদেহী করতে হবে এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তখন তারা বিদ্রুপ করে বলতো, 'কেয়ামত কবে হবে'? 'এ বিচার কবে অনুষ্ঠিত হবে'? আর ইহুদীরা হয় শত্রুতাবশতঃ অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্যে এমন প্রশ্নের অবতারণা করতো। তাদের এসব প্রশ্নের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক বর্ণনা করে বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার জীবনে অপমানজনক শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন, আর এ আয়াতে তাদের আখেরাতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে,

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ط

'(হে রসূল!) লোকেরা আপনার নিকট কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, 'কেয়ামত কবে হবে'?

তফসীরকারগণ লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের বিদ্রুপাত্মক প্রশ্ন করা হতো।

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, কেয়ামতের সঠিক সময় শুধু আল্লাহ পাকই জানেন', তিনি এ সম্পর্কে কোন নবীকে বা কোন ফেরেশতাকে অবহিত করেননি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

بعثت انا والساعة كهاتين

তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'আমার আগমন এবং কেয়ামতের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান রয়েছে, যতটুকু এ দু' অঙ্গুলির মধ্যে আছে'। অবশ্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন।

কেয়ামতের আলামত

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন শাসনকর্তারা জমিনের কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ রূপে গণ্য করবে, যখন যাকাতকে জরিমানার ন্যায় আদায় করা হবে, যখন আমানতের সম্পদকে গণীমতের মাল বা জেহাদ লব্ধ সম্পদ মনে করা হবে, যখন স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি অন্যায়ভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকবে, যখন সন্তানরা তাদের পিতা মাতার অবাধ্য হয়ে যাবে এবং মন্দ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করবে, যখন সমাজ ও জাতির চরিত্রহীন, লোভী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, যখন দায়িত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অযোগ্য লোকের হাতে অর্পিত হবে, যখন ক্ষতির আশঙ্কায় এমন লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে যারা শরীয়ত বিরোধী জীবন যাপনে অভ্যস্ত, যখন প্রকাশ্যে মদ্যপান হতে থাকবে, যখন গান-বাজনার উপকরণ এবং নাচ-গানের চর্চা সাধারণ ভাবে হবে, যখন ব্যভিচার প্রসার লাভ করবে, যখন উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের নিন্দাবাদ করবে, তখন আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর। সেই আযাবের মধ্যে রয়েছে জমীন ধ্বসে যাওয়া, আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ, আকৃতির পরিবর্তন এমনি আরো বহু আলামত

প্রকাশিত হবে। তসবীহের রশি ছিন্ন হলে যেভাবে একের পর এক দানা পড়তে থাকে ঠিক তেমনি বালা-মসিবত বিপদাপদ আসতে থাকবে।–(তিরমিজী শরীফ)

অন্য হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের আরো আলামত এরশাদ করেছেনঃ যেমন, মূর্খ ও নব্য ধনবানদের ক্ষমতা লাভ করা, শরীয়তের এলম কম হয়ে যাওয়া, মিথ্যাকে ভাল জানা, মানুষের মন থেকে আমানতদারীর অনুভূতি বিদায় হওয়া, পাপকার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান অর্জন করা, লজ্জা-শরম বিদায় গ্রহণ করা, কাফেরদের একত্রিত হয়ে মুসলমানদের উপর অমানবিক জুলুম করা, ধর্মীয় বাতিল পন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া- এসবও কেয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, '(কেয়ামতের পূর্বে) এমন সময় আসবে যে, হাতের তালুতে জ্বলন্ত অংগার রাখা এত কঠিন হবেনা, যত কঠিন হবে ঈমান রক্ষা করা'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, 'ঠিক কখন কেয়ামত সংঘটিত হবে' এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো জানা নেই। মুনাফেক ও কাফেররা যখন আখেরাতের আযাবের কথা শ্রবণ করতো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিরক্ত করার লক্ষ্যে বিদ্রুপ করে বলতো, 'সেই কঠিন মুহূর্ত কবে আসবে?' তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

وَمَا يُدْرِيكَ

'আপনি কি করে জানবেন, 'কেয়ামত কবে আসবে'?

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيبًا

'হয়তো সেই কঠিন মুহূর্তটি নিকটেই রয়েছে', হয়তো শীঘ্রই তা এসে পড়বে, যখন আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সমস্ত নবী রসূলগণ বিদায় গ্রহণ করেছেন, এমনকি অবশেষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরও আগমন হয়েছে, তখন এ সত্য অনুধাবন করতে হবে যে কেয়ামত নিকটবর্তী। মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে যাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা একে একে যখন সকলেই বিদায় গ্রহণ করেছেন তখন কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, এতে আর সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারেনা। এজন্যেই কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

'মানুষের হিসাব নিকাশের সময় সমাগত, কিন্তু তারা বেখবর, গাফলতের কারণে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে'।

অতএব, 'কেয়ামত কবে আসবে'? এ প্রশ্ন অবান্তর, বরং কেয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হল কর্তব্য। কিন্তু কাফেররা এ কর্তব্য পালনে বিমুখ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের প্রতি নির্যাতনে তৎপর, তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا

চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে 'লা'নত' দিয়েছেন', তথা তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। 'আর তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নির আযাব'। অর্থাৎ দোযখের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত। আর এ শাস্তি সাময়িক হবেনা, বরং

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ج

'তারা চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে'। কখনও তারা দোযখের কঠিন কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই পাবেনা। আর দূরাত্মা কাফেরদেরকে ঐ মহা বিপদে কেউ সাহায্য করতেও পারবেনা, তাই ঘোষণা করা হয়েছে,

لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

তারা পাবেনা কোন অভিভাবক, যে তাদেরকে দোযখের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে এবং কোন সাহায্যকারীও তারা পাবেনা, যে তাদেরকে ঐ মহাবিপদে সাহায্য করতে পারে বা তাদের শাস্তিকে বিন্দুমাত্রও লাঘব করতে পারে।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ

'সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন তাদেরকে উপুড়মুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখানে তাদের চেহারাকে ওলট-পালট করা হবে (যেমন মাছ গোশ্ত ভুনার সময় তা করা হয়)'।

يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا

'তখন তারা বলবে, 'হায় আক্ষেপ! যদি আমরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলতাম তবে কত ভাল হত'!

পবিত্র কোরআনে মানুষের এমনি আক্ষেপের কথা অন্যত্রও উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া মোহে মুগ্ধ অবস্থায় আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে কোন সম্বল সংগ্রহ করেনা, আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলেনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়না, এমনকি আখেরাতের জীবনের বাস্তবতাকেও তারা অস্বীকার করে তাদের সেদিনের আক্ষেপের ভাষা হবে এমন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়,

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ

(সূরা ওয়াল ফাজর)

'তারা বলবে, 'হায় আক্ষেপ! যদি আমরা এ জীবনের জন্যে কিছু করে পাঠাতাম তবে কত ভাল হত'!

এমনিক, কাফেররা এমন আক্ষেপও করবে, 'যদি তারা মানবরূপ ধারণ না করতো তবু তাদের জন্যে ভাল হত'! পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

'কাফেররা বলবে 'হায়! যদি আমি মাটি হতাম'।

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন কাফেররা তাদের সারা জীবনের যাবতীয় পাপাচারের ভয়াবহ পরিণতি দেখবে তখন ভয়ে আতংকে এবং অনুতাপে বলতে থাকবে, 'হায়! যদি মানুষ না হয়ে মাটি হয়ে যেতাম তবে এমন বিপদের সম্মুখীন হতাম না'।

দোযখে নিক্ষিপ্ত হবার পর কাফেররা আরো বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا

'তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও প্রধানদের কথা মেনেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল'।

কুফরী ও নাফরমানীর পথ, অন্যায় অনাচারের পথ আমাদের নেতারাই আমাদেরকে দেখিয়েছিল, আমরা তাদের অনুসরণ করি এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে।

সেদিন কাফেররা তাদের দলপতি মোড়ল-মাতব্বরদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে বলবে যে, তারাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছে এবং আমাদের সর্বনাশ করেছে, আমাদের এ ভয়াবহ পরিণতির জন্যে তারাই দায়ী, হে পরওয়ারদেগার! আজ যদি তুমি আমাদেরকে শাস্তি দাও তবে তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا

'হে পরওয়ারদেগার! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা-অভিশম্পাত দাও'।

প্রথমতঃ এজন্যে যে তারা কাফের মুশরেক বে-দ্বীন ছিল।

দ্বিতীয়তঃ তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, তাদেরকে মহা-অভিশম্পাত দাও এবং তাদের উপর বিরাট এবং ভয়ংকর আযাব নাযিল কর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى

'হে মোমেনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা; যারা মূসাকে (আঃ) কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁকে তাদের উক্তি থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। আল্লাহ পাকের নিকট তিনি ছিলেন সম্মানিত'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যেভাবে বনী ইসরাঈলীরা তাঁদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, হে মোমেনগণ! তোমরা তাদের মত হয়োনা; আল্লাহ পাকের মনোনীত নবী রসূলগণ তাঁর মহান দরবারে চির প্রিয়; চির সম্মানিত এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, অতএব তাদের শানে বেআদবী করা, তাঁদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতে মৃত্যুদন্ড এবং আখেরাতে দোযখে চিরকালীন কঠোর আযাব।

তাই আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'হে মোমেনগণ'! অর্থাৎ হে সে সব লোক, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ এবং আল্লাহ পাকের নবীর প্রতি ঈমান এনে তাঁর অনুসরণের শপথ করেছ, খবরদার! কখনো তোমরা বনী ইসরাঈলের সে পথভ্রষ্ট লোকদের মত হয়োনা, যারা তাদের নবীকে কষ্ট দিয়েছে। যদি তোমরা তোমাদের নবীকে এমন কষ্ট দাও তবে তোমাদেরকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-কে কী কষ্ট দিয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন তফসীরকারগণ।

১. বনী ইসরাঈলের দুষ্ট লোকেরা তাঁর প্রতি অপবাদ দিয়েছে যে, তিনি তাঁর ভাই হযরত হারুন (আঃ)-কে নির্জন প্রান্তরে নিয়ে হত্যা করেছেন।

২. দূরাত্মা বনী ইসরাঈলীরা প্রকাশ্যে নগ্ন অবস্থায় গোসল করতো, কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তাঁদের মত প্রকাশ্যে কাপড় খুলে গোসল করতেন না, সেজন্যে তারা এ অপবাদ দিয়েছিল যে, মূসা (আঃ)-এর দেহে কোন খুঁত, শ্বেত বা কুষ্ঠ বা এমন কিছু রয়েছে, যার দরুণ তিনি প্রকাশ্যে আর দশজনের মত গোসল করেন না। আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে তাদের অপবাদ বা উক্তি থেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে ব্যবস্থা করলেন। একদিন হযরত মূসা (আঃ) নির্জনে গোসল করছিলেন। তাঁর পোষাক একটি পাথরের উপর রাখা ছিল। এ সময় পাথরটি মূসা (আঃ)-এর পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে ছুটতে লাগল। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর পোষাকের জন্যে পাথরটির পেছনে ছুটতে ছুটতে লোকদের সম্মুখে এসে পড়লেন, তখন সকলেই দেখলো যে, তাঁর দেহ রয়েছে নিখুঁত, নিঃস্কলংক (আহমদ, এবনে জরীর, বোখারী, তিরমিজী, মসনদে এবনুল মুনজের)। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْاؕ

'আল্লাহ্ পাক তাঁকে তাদের উক্তি থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন'।

বর্ণিত আছে যে, মূসা (আঃ) তখন পাথরের উপর থেকে পোষাক নিয়ে পরিধান করলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরকে প্রহার করলেন। ফলে পাথরের উপর প্রহারের চিহ্ন পড়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাই হযরত হারুন (আঃ) ময়দানে তীহে ইন্তেকাল করেন। এদিকে বনী ইসরাঈলী দুর্বৃত্তরা বলতে লাগলো যে মূসা (আঃ) তাঁকে হত্যা করেছেন। তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলেন যেন হারুন (আঃ)-এর লাশ বনী ইসরাঈলের সম্মুখে আনা হয়, তাই করা হলো। এভাবে আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে নির্দোষ নিঃস্কলংক প্রমাণ করলেন (এবনে জবীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম)।

৩. হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস এবং হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কারুন হযরত মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে এক চরিত্রহীনা স্ত্রীলোককে অর্থ-সম্পদ দিয়ে ফুসলিয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু জনসমক্ষে যখন স্ত্রীলোকটিকে দাঁড় করানো হয় তখন আল্লাহ্ পাক তার রসনা থেকে সত্য প্রকাশ করে দেন। কারুন তাকে যা বলতে বলেছিল সে তা বলেনি; সে বলেছে, 'মূসা (আঃ) আমার সঙ্গে মন্দ কাজ করেছেন' একথা বলার জন্যে কারুন আমাকে তৈরী করে এনেছে। অথচ একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি আল্লাহর নবীর

বিরুদ্ধে মিথ্যা বলতে পারবো না'। এভাবে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত সফল হয়না, আল্লাহ পাক তা ব্যর্থ করে দেন, সত্য হয় উদ্ভাসিত, মিথ্যা নেয় বিদায়। এটিই আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান।[১]

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে কিছু মাল পত্র বিতরণ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, 'এ বিতরণ সঠিক হয়নি'। ঐ ব্যক্তির এ আপত্তিকর মন্তব্যটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে জানানো হলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। রাগান্বিত ভাব তাঁর চোহারায় ফুটে ওঠে। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর প্রতি রহমত নাযিল করুন, তাঁকে লোকেরা এর চেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন'।

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا

'আর মূসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত সম্মানিত'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে যে আরজী পেশ করতেন, তাই কবুল হতো। হযরত হাসান বসরী (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো মূসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দনীয়।[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২৩৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৩৩-৩৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৯৪
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৩০

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ
حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

তরজমা

(৭০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

(৭১) তিনি তোমাদের কার্যাবলীকে সংশোধন করে নেবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহকে মাফ করবেন। যারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের কথা মেনে চলবে তারা অবশ্যই বিরাট সাফল্য অর্জন করবে।

(৭২) নিশ্চয় আমি আসমান জমিন এবং পাহাড়-পর্বতকে এ আমানত অর্পণ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করে এবং তাতে ভয় পায়। আর মানুষ তা বহন করে। মানুষ বড়ই জালেম, অতিশয় অজ্ঞ।

(৭৩) আল্লাহ পাক মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশরেক পুরুষ ও মুশরেক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদেরকে ক্ষমা করতে মর্জি করেন, আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে, যেভাবে বনী ইসরাঈলীরা মূসা (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছে সেভাবে তোমরা তোমাদের নবীকে কষ্ট দিওনা। আর এ আয়াতে মোমেনদেরকে পুনরায় সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, হে মোমেনগণ! তোমরা দু'টি কর্মসূচী গ্রহণ কর (১) আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক। (২) সঠিক কথা বল।

আল্লাহকে ভয় করা অন্তরের কাজ। আর কথা বলা রসনার কাজ। যদি অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে আল্লাহ পাকের ভয় জাগ্রত থাকে তথা অন্তর যদি সঠিক হয়ে যায়, তবে রসনা দ্বারা সঠিক কথাই প্রকাশ পাবে। অসত্য কথা বের হবে না। আর এ দু'টি কর্মসূচী গ্রহণ করলে তথা অন্তর ও রসনাকে যদি সঠিক করা যায় তবে আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়, আত্মোন্নতি লাভ করা সহজ হয়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, একথার তাৎপর্য হল হে মোমেনগণ! তোমরা যখন ঈমান এনেছ তবে আল্লাহকে ভয় কর, আর যে কথা আল্লাহর অপছন্দনীয় এমন কথা থেকে বিরত থাক আত্মরক্ষা কর। যে কথা বা আচরণে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কষ্ট হতে পারে, এমন কিছু থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাক।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে قولا سديدا অর্থ হল "সঠিক কথা"।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, ন্যায় বিচারের কথা।

আর কেউ কেউ বলেছেন, "এর অর্থ হলো সত্য পর্যন্ত পৌছার কথা"। এসব কিছুর মর্ম হল সঠিক কথা।

হাদীস শরীফে রয়েছে.....اذا اصبح ابن ادم আদম সন্তান যখন সকালে ওঠে তখন তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ রসনাকে বলে, হে রসনা! আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, কেননা আমরা তোমার সাথেই রয়েছি, যদি তুমি সঠিক থাক তবে আমরা সঠিক থাকবো, আর যদি তুমি বক্র পথ ধর, তবে এমন অবস্থায় আমরা সঠিক থাকতে পারবো না। এজন্যেই কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মানব দেহের সকল অঙ্গ এক সময় ক্লান্ত হয়ে যায়, কিন্তু রসনা ক্লান্ত হয়না, সে কথা বলতেই থাকে। তাই সঠিক কথা বলতে হলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করার পন্থা হল, আল্লাহকে ভয় করা।[১]

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, হযরত জয়নব (রাঃ)-এর সম্পর্কে যারা না-হক্ব কথা বলেছিল এবং যারা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদ দিয়েছিল তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাককে ভয় করার এবং সঠিক কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এমন কথা কখনও যেন না বলা হয় যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানের খেলাফ হয় এবং তাঁর মনোঃকষ্টের কারণ হয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৩৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৮-৪৯

একরামা (রঃ) বলেছেন, قولا سديدا অর্থ হল, لا اله الا الله محمد رسول الله আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, গোপন ও প্রকাশ্য এক হওয়া অর্থাৎ যা মনে আছে তাই প্রকাশ করা। মনে এক কথা, আর মুখে অন্য কথা না হওয়া।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁর মোমেন বন্দাদেরকে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এভাবে আল্লাহ পাকের এবাদতের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা আল্লাহ পাককে সচক্ষে দেখছে। আর এ নির্দেশও দিয়েছেন যে তোমরা সর্বদা সঠিক কথা বল, তোমাদের মনে থাকবে আল্লাহর ভয়, আর মুখে থাকবে শুধু সত্য কথা।[২]

ইমাম তবরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর কোন অবস্থাতেই তাঁর নাফরমানী করোনা, যদি তা কর তবে তাঁর শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রে এক কথায় সর্ব ক্ষেত্রে সঠিক কথা বল, কখনও এমন কথা বলোনা যা সঠিক নয়, যার ভিত্তি নেই। যখনই কথা বল তা যেন হয় সত্য ও ন্যায় এবং গোপন ও প্রকাশ্য উভয়ের মধ্যে যেন থাকে সুসামঞ্জস্য, কথায় এবং কাজে যেন কোন পার্থক্য না থাকে'।[৩]

বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান কত বেশী তা এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কেননা এতে সত্য-নিষ্ঠা এবং সত্যবাদীতার মহিমা বর্ণিত হয়েছে অতি সুন্দরভাবে। আত্মশুদ্ধি লাভের এবং আত্মসংস্কারের যে পথ-নির্দেশ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অনুপম এবং অভিনব, আধুনিক সভ্যতায় যা দুর্লভ আর এজন্যেই আজকের পৃথিবীতে যদি আল্লাহর ভয় এবং সত্যবাদীতার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবন গড়ে ওঠে তবে কোথাও অশান্তি থাকতে পারেনা এবং কোন সমস্যা থাকলে অবশ্যই সমাধান হয়। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সমাজ ও জাতি গড়ে তুলেছেন, তার বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাকওয়া পরহেযগারী বা আল্লাহর ভয়, সত্যবাদীতা, উদারতা, মহানুভবতা, ভদ্রতা, নম্রতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। বলাবাহুল্য, মুসলিম জাতির উত্থান হয়েছিল সেদিন এসব গুণাবলীর অধিকারী হবার কারণেই। আর বর্তমান যুগে এ জাতির যে অবনতি হচ্ছে তার কারণও এসব গুণের অভাবই।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৯৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৩৯
৩। তফসীরে তাবারী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৩৮

يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ

অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে যে পথ-নির্দেশ করা হয়েছে এবং যে কর্মসূচী দেয়া হয়েছে যদি তোমরা তার বাস্তবায়ন কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলীকে সঠিক করে দেবেন, তথা তোমাদেরকে ত্রুটি মুক্ত করে দেবেন। তোমরা সঠিক পথের অনুসারী হবে, এভাবে তোমাদের সাফল্য হবে সুনিশ্চিত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক তোমাদের নেক আমল সমূহ কবুল করবেন।

আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাক তোমাদের কৃতকর্মকে পবিত্র করবেন এবং তা কবুল হওয়ার ও সওয়াব লাভের যোগ্য করে দেবেন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হল, আল্লাহ পাক তোমাদের নেক আমল করার তৌফিক দান করবেন।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط

আর তিনি তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন, তোমাদের কথা ও কাজের মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকবে এবং তোমাদের সংকল্পে যে দৃঢ়তা থাকবে, তাকে তোমাদের গুনাহর কাফ্ফারা বানিয়ে দেবেন।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

'আর আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের কথা যে মেনে চলবে সে বিরাট সাফল্য লাভ করবে'।

অর্থাৎ দুনিয়াতে সে প্রশংসিত এবং অভিনন্দিত হবে, আর আখেরাতেও হবে সে ভাগ্যবান। কেননা যারা এ জীবনে আল্লাহ পাকের অনুগত হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাফল্য হয় সুনিশ্চিত।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا

'নিশ্চয় আমি আসমান জমীন এবং পাহাড়-পর্বতকে এ আমানত অর্পণ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করে এবং তাতে ভয় পায়। আর মানুষ তা বহন করে। মানুষ বড়ই জালেম, অতিশয় অজ্ঞ'।

পুর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ ছিল। আর এ নির্দেশ পালনই মানুষের প্রতি এক প্রকার আমানত। আলোচ্য আয়াতে সেই আমানত রক্ষা করার তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি আসমান জমিন, পাহাড়-পর্বতের উপর আমার 'আমানত' অর্পণ করেছিলাম। আসমান জমিন এ দুর্বহ বোঝা বহন করতে সাহস পায়নি, কিন্তু মানুষ তা মাথায় তুলে নিল'।

আমানতের তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতের 'আমানত' শব্দটির তাৎপর্য কী? এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এখানে 'আমানত' অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে সব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তা যথাযথ ভাবে পালন করা, যে তা করবে তাকে আল্লাহ্ পাক সওয়াব দান করবেন। আর যে না করবে তার শাস্তি হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'আমানত' শব্দের অর্থ হলো নামাজ আদায় করা, যাকাত দেয়া, রমজানের রোজা রাখা, হজ্জ করা, সত্য কথা বলা, ন্যায় বিচার কায়েম করা এবং গচ্ছিত আমানতের হেফাজত করা। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আমানত হলো সকল ফরজ আদায় করা এবং দ্বীনের হেফাজত করা।

আবুল আলিয়া (রঃ) বলেছেন, আমানত হলো যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা।

যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'আমানত' শব্দটির ব্যাখ্যা হলো রোজা ব্রত পালন করা, ফরজ গোসল সম্পাদন করা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করা যেমন হিংসা না করা, কোন মুসলমানের সঙ্গে শত্রুতা না করা, লোক দেখানোর জন্যে কাজ না করা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বলেছেন, মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার নিকট আল্লাহ্ পাকের আমানত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি এর কোন একটিও যেন আল্লাহর না-ফরমানীতে ব্যয় না করা হয় এটিই 'আমানত'। আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত কোন শক্তিকে তাঁর না-ফরমানীর কাজে ব্যয় করাই হলো আমানতের খেয়ানত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আমানত হলো অন্যের গচ্ছিত ধন-সম্পদের হেফাজত, অঙ্গীকার রক্ষা করা, ছোট-বড় কোন কাজেই প্রতারণা না করা।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, শরীয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করাই হলো 'আমানত'।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এখানে 'আমানত' অর্থ হলো আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এ আমানত হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি অর্পণের পূর্বে আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বতের উপর পেশ করা হয়। কিন্তু তারা এ দুর্বহ ভার বহনে অপারগতা প্রকাশ করে। তখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট তা অর্পণ করেন। আদম (আঃ) আরজ করেন, 'এতে কী রয়েছে'? আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'যদি আমার বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন কর তবে সওয়াব পাবে। আর যদি তা না কর তবে শাস্তি পাবে'। আদম (আঃ) বললেন, 'আমি এর জন্যে প্রস্তুত রয়েছি'।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ) আছরের সময় এ আমানতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন আর মাগরেবের পূর্বেই তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে যায়।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, নারীর সতীত্ব রক্ষা করাও একটা আমানত, ফরজ গোসল করাও একটা আমানত।

যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) বর্ণনা করেনঃ তিনটি জিনিস আল্লাহর আমানতঃ ফরজ গোছল, রোজা এবং নামাজ।

অর্থাৎ এসব কিছুই আল্লাহ পাকের আমানত। সকল বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করা 'আমানত'। আর এসব কিছু মানুষের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত কর্তব্য। যে কর্তব্য পালন করবে সে সওয়াব পাবে, আর যে এ কর্তব্য পালন করবে না তথা পাপাচারে লিপ্ত হবে সে শাস্তি পাবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, লক্ষ্য কর আসমান এত মজবুত, সুদৃঢ়, সুন্দর এবং ফেরেশতাদের আবাস-স্থল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের 'আমানতে'র দায়িত্ব বহন করতে সাহস করেনি, কেননা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে শাস্তি হবে। জমিন এত বিস্তৃত এবং প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের আমানত গ্রহণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে। পাহাড়-পর্বত এত সুউচ্চ এবং শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের আমানত গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছে এবং শাস্তির ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছে অথচ মানুষ তা গ্রহণ করেছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, সর্ব প্রথম আসমান জবাবে আরজ করেছে, 'হে পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার অনুগত, কিন্তু 'আমানত' গ্রহণের সাধ্য

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা- ৪৩৬

আমাদের নেই। এরপর জমীন এবং পাহাড়-পর্বতও স্ব-স্ব অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছে। এরপর হযরত আদম (আঃ)-কে বলা হয়েছে, তিনি আরজ করেছেন, 'ইয়া রব! যদি আমানত রক্ষা করি তবে কী পাওয়া যাবে'। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "সম্মান এবং জান্নাত পাবে, দয়া মায়া এবং রহমত পাবে। আর যদি আমানত সঠিকভাবে রক্ষা না কর তবে কঠিন শাস্তি হবে, দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। আদম (আঃ) আরজ করেছেন, 'দায়িত্ব দেয়া হোক'।[১]

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক এ সূরায় মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে يايها الذين امنوا 'হে মোমেনগণ!' বলে ডাক দিয়েছেন। আর ঈমান আমানতদারী ব্যতীত কল্পনাতীত, এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

الا لا ايمان لمن لا امانة له

'যার মধ্যে আমানতের গুণ নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই'। এজন্যে এ সূরার পরিসমাপ্তিতে আমানতের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং আমানতদারীর গুণ অর্জন করার তাগিদ করা হয়েছে।

আমানত হল সকল চারিত্রিক গুণের মূল উৎস। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অনেক সাহাবায়ে কেরামের মতে, আমানত হল শরীয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা, এটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বন্দার প্রতি আমানত। যদি তোমরা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চল তবে সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে, যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে তথা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করবে, তারা আযাব ভোগ করবে। এ আমানত আসমান জমিন ও পাহাড়-পর্বতকে গ্রহণের আহবান জানানো হয়, আর এ দায়িত্ব গ্রহণ করার ও না করার অধিকার দেয়া হয়। তখন আসমান জমিন ও পাহাড়-পর্বত আরজী পেশ করে, এ আমানত গ্রহণের সাধ্য আমাদের নেই। আমরা সওয়াব চাইনা, আর আযাব ভোগ করার সাহসও রাখিনা।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যেভাবে ইবলীসকে আদেশ দেয়া হয়েছিল আদম (আঃ)-কে সেজদা দেয়ার জন্যে, কিন্তু ইবলীস তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আসমান জমিনের আমানত গ্রহণের অস্বীকৃতি তেমন নয়, কেননা ইবলীস অস্বীকৃতি জানিয়েছিল অহংকারের কারণে। আর আসমান জমিন আমানত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আল্লাহর আযাবের ভয়ের কারণে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর আদেশের কারণে সেজদা করা ইবলীসের উপর ফরজ ছিল, আর আসমান জমিনের উপর আমানত

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৪০-৪১

গ্রহণ ফরজ ছিলনা; বরং আমানত গ্রহণ করা না করা তাদের ইচ্ছাধীন ছিল। সেজন্যে তারা বিনীত হয়ে আমানত গ্রহণে অপারগতা জানিয়েছে।[১]

وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ

'আর মানুষ তা বহন করে'।

অর্থাৎ আদম (আঃ)-কে যখন এ দায়িত্ব অর্পণ করার কথা বলা হল তখন তিনি তা মাথায় তুলে নিলেন।

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

'নিশ্চয় মানুষ বড়ই জালেম, অতিশয় অজ্ঞ'।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি রেখেছেন, যদি সে তার হেফাজত করে এবং সাধনা করে তবে সে আল্লাহ পাকের 'মা'রেফাত' হাসিল করতে পারে, তাঁর নৈকট্য-ধন্য হতে পারে এবং এমন অবস্থায় মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। ঈমান এবং নেক আমলের পর মানুষ এ সাধনা করতে পারে, মানুষের মধ্যে এ শক্তি নিহিত রয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহ পাকের এ গচ্ছিত সম্পদের অনাদর করে এবং ঈমান ও নেক আমলের পথ পরিহার করে, তবে তার দ্বারা আমানত রক্ষা হয়না, সে আল্লাহ পাকের সন্তোষ ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারেনা। বিখ্যাত সাহাবী হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ان الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القران والسنة

অর্থাৎ 'আমানত' মানুষের অন্তরে নাযিল হয়েছে, এরপর কোরআন নাযিল হয়েছে এবং সুন্নতে রসূল এসেছে'। মানব মনে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সত্যকে গ্রহণ করার এবং অসত্যকে বর্জন করার বীজ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এ বীজই হল মূলতঃ 'আমানত'। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর বারি বর্ষণে এ বীজের উন্মেষ হয়, শক্তি অর্জন করে, আর ধীরে ধীরে তা ইসলামের মহীরূহে পরিণত হয়। মানুষ যদি আমানতের অংকুরিত এ চারায় পবিত্র কোরআন ও সুন্নতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রস ও স্বাদের যথারীতি ব্যবহার করতে পারে, শুধু এ অবস্থায়ই তা অবশেষে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হতে পারে। এ আমানতের গুরুভারই আল্লাহ পাক আসমান জমিন, পাহাড়-পর্বতের সম্মুখে পেশ করেন। কিন্তু তারা ভীত শঙ্কিত হয়ে আল্লাহ পাকের আমানত গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করে। মানুষ এ আমানত গ্রহণ ও

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২৩৫

সংরক্ষণের দুঃসাহস করে। এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, মানুষ বড় জালেম এবং অতিশয় অজ্ঞ। কেননা অধিকাংশ লোক আল্লাহ পাক প্রদত্ত সে যোগ্যতাকে গাফলতের কারণে বিনষ্ট করে ফেলে। আর এভাবে সে নিজের প্রতিই নিজে জুলুম করে আর কি সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে এবং তাতে তার কি ক্ষতি হয়েছে সে তা জানেও না। তাই মানুষ অতিশয় অজ্ঞ বা জাহেল।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানব দেহে একটি গোশ্‌ত খন্ড রয়েছে, যখন তা ঠিক হয় তখন সারা দেহ ঠিক হয়। আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন সারা দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। খুব ভাল করে জেনে রাখ তা হ'ল 'ক্বলব' বা অন্তর। আর এজন্যে কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

'যে নিজের প্রবৃত্তিকে পবিত্র করেছে, সে-ই সফল হয়েছে, আর যে প্রবৃত্তিকে অপবিত্র করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে'।

একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে যে, শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথা ইসলামের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে প্রবৃত্তির পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হয়। এজন্যে চাই আল্লাহ পাকের জিকরের সাধনা এবং এস্তেগফারের আরাধনা।

পক্ষান্তরে, যারা শরীয়তের বিধান পালনের সাধনায় রত হয়না তারা আল্লাহ পাক প্রদত্ত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। পরিণামে তাদের প্রবৃত্তি পবিত্রতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত 'আমানত' আদায়ের তৌফিক অর্জনে তারা বঞ্চিত হয়। এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে এবং মূর্খতার পরিচয় দেয়, অথচ প্রবৃত্তির পবিত্রতার উপরই জান্নাত ও দোযখের সিদ্ধান্ত হয়। অতএব, যারা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত আমানত আদায়ের সাধনা করে জীবন যাপন করে তাদের জীবন-সাধনা সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম হয়। আর যারা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত 'আমানত' সংরক্ষণে যত্নবান হয়না, তাদের জীবন-সাধনা ব্যর্থ হয়।

আর শুধু ব্যর্থই হয়না; বরং মহা বিপদের কারণ হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের রাহে প্রাণ উৎসর্গ করলে তথা 'শাহাদত' বরণ করলে সর্বপ্রকার গুনাহ নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু আমানতের খেয়ানত অবশিষ্ট থাকে। কেয়ামতের দিন এমন লোকদেরকে বলা হবে, 'তাদের আমানত আদায় কর,' তখন তারা আরজ করবে, 'হে পরওয়ারদেগার! ঐ আমানত কোথা থেকে আদায় করা হবে? দুনিয়া তো এখন আর নেই'। তিনবার এ প্রশ্নোত্তর হবে। এরপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হুকুম হবে, তাদেরকে 'হাবীয়া' দোযখে

নিয়ে যাও। তখন ফেরেশতাগণ ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে দোযখে ফেলে দেবেন এবং তারা দোযখের তলদেশে পৌঁছে যাবে। তারা দোযখের ভেতর দুনিয়াতে তাদের নিকট যে আমানত রাখা হয়েছিল, তার ন্যায় দোযখের আগুনের তৈরী কোন জিনিস দেখতে পাবে এবং তা নিয়ে উপরের দিকে আসবে, যখন তারা দোযখের এক প্রান্তে আসবে তখন পা পিছলে পুনরায় নীচে পড়ে যাবে। এভাবে তাদের প্রতি আযাব হতে থাকবে।

অতএব, কারো নিকট যদি কোন সম্পদ আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকে, তবে তা যথারীতি মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া একান্ত কর্তব্য। এতেই রয়েছে ঈমানদারী এবং সাফল্য। কিন্তু যদি এতে অবহেলা করা হয় অথবা ভুলবশতঃ গচ্ছিত সম্পদ বিনষ্ট হয় তবে তার খেসারত দিতে হয় অনেক বেশী।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ অজুতেও আমানত রয়েছে, নামাজেও আমানত রয়েছে, কথাবার্তায়ও আমানত রয়েছে, তবে সবচেয়ে বড় কঠিন আমানত হলো, যদি কারো নিকট কোন কিছু আমানত হিসেবে রাখা হয়, তবে তার হেফাজত করা অবশ্য কর্তব্য।

সাধারণতঃ 'আমানত' বলা হয় অন্যের গচ্ছিত সম্পদের সংরক্ষণকে অর্থাৎ তাতে যেন কোন প্রকার আত্মসাত না করা হয়, ভোগের লিপ্সাকে চরিতার্থ না করা হয়, এটি হলো 'আমানত'। যদি অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকে এবং পরকালীন জিন্দেগীতে হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হওয়ার দুশ্চিন্তা থাকে, তাহলে আমানতের সংরক্ষণ সহজ হয়, অন্যথায় আখেরাতের কঠিন আযাব অবধারিত থাকে।

হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে 'আমানতে'র উল্লেখ রয়েছে, তা হলো সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহ্ পাক যে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, যে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছেন তা সঠিকভাবে মেনে চলা। শরীয়তের এ বিধান যে মেনে চলবে, সে সফলকাম হবে।

আর যে অমান্য করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। এটিই 'আমানত'। আর এ 'আমানত'ই আসমান জমীন, পাহাড়-পর্বতকে অর্পণ করা হয়েছে, কিন্তু তারা এ বোঝা বহনের সাহস করেনি, বিনীত হয়ে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এরপর যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মুখে এ 'আমানত' অর্পণ করেন, তখন তিনি অম্লান বদনে তা গ্রহণ করেন।

বিখ্যাত সুফী-সাধক হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বলেছেন, হযরত আদম (আঃ)-এর দৃষ্টি ছিল এ বিষয়ের উপর যে, মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা তাঁর প্রতি একটি

দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, অতএব তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। 'আমানতে'র ভার কত বেশী ছিল সেদিকে তিনি নজর দেননি, বরং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে প্রস্তাবনা এসেছে, তার স্বাদে তিনি এত মুগ্ধ ছিলেন যে, 'আমানতে'র গুরুভার বহন করা সম্ভব হবে কি-না তা চিন্তা করার অবস্থাই তাঁর ছিলনা। এজন্যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তখনই এরশাদ হয়েছেঃ 'হে আদম! আমানতের গুরুভার বহন তোমার তরফ থেকে আর তোমার দেখা-শুনা আমার তরফ থেকে হবে। যেহেতু তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে আমার 'আমানত' বহন করেছ, তাই আমিও তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নির্বাচন করেছি'।

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط

'আল্লাহ্ পাক মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশরেক পুরুষ ও মুশরেক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদেরকে ক্ষমা করবেন'।

অর্থাৎ আমানতের এ ব্যবস্থার কারণে মুনাফেক নারী-পুরুষ ও মুশরেক নারী পুরুষ শাস্তি ভোগ করবে। কেননা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে 'আমানত' আদায়ের জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান, যেহেতু মুশরেক ও মুনাফেকরা আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি ঈমান আনেনি; তাই 'আমানত' আদায়ের পথেই তারা আসেনি, আর এজন্যেই পরকালীন জীবনে তাদের শাস্তি হবে। কিন্তু মোমেন নারী-পুরুষকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করবেন কেননা, ঈমানের কারণে তারা 'আমানত' আদায়ের শপথ করেছে, কিন্তু 'সৃষ্টিগত দুর্বলতা'র কারণে তাদের দ্বারা যে ভুল-ক্রুটি হবে, তা আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করবেন।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল,' এজন্যে তিনি মোমেনদের ভুল-ক্রুটি ক্ষমা করবেন। 'তিনি অতীব দয়াবান' তাই মোমেনদের এবাদত ও আনুগত্যের সওয়াব দান করবেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানুষের দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন (১) মানুষ বড় জালেম আর (২) সে অতিশয় অজ্ঞ। এ আয়াতেই আল্লাহ্ পাক নিজের দু'টি গুণ এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেনঃ তিনি 'গফুর' এবং (২) তিনি 'রহীম'।

যে নিজের প্রতি জুলুম করেছে তথা যে পাপাচারের মাধ্যমে নিজের প্রতি জুলুম করেছে তার জন্যে আল্লাহ্ পাক 'গফুর' অর্থাৎ তিনি 'ক্ষমাশীল' আর যে বন্দা অজ্ঞ, তার জন্যে তিনি 'রহীম, অর্থাৎ 'দয়াবান'।

আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীমে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সমস্ত গুনাহ ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন কিন্তু শেরক মাফ করবেন না, অতএব, মুশরেকরা মাফ পাবেনা, আর তাদের দোসর মুনাফেকরাও ক্ষমা পাবেনা, আর যারা অজ্ঞতার কারণে মোমেন হওয়া সত্ত্বেও গুনাহগার হয়েছে, আল্লাহ্ পাক দয়া করে তাদেরকে ক্ষমা করবেন।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১০ জিলক্বদ, ১৪১৫ হিজরী মোতাবেক ১১ই এপ্রিল, ১৯৯৫, ২৮শে চৈত্র, ১৪০১ রোজ মঙ্গলবার বেলা ১টায় 'সূরা আহযাবের' তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ্! দয়া করে এ সাধনা কবুল কর, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় 'তফসীরে নূরুল কোরআন'কে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২৩৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ রুকু-৬, আয়াত-৫৪, বাক্য ৮৮৩, অক্ষর ১,৫১২

سُوْرَةُ سَبَاٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيْهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا
السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ
ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٣ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ اُولٰۤئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নামে (শুরু করছি)।

তরজমা

(১) সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই, আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর এবং তাঁরই প্রশংসা আখেরাতেও। আর তিনিই মহাজ্ঞানী, সব বিষয়ে তিনি অবগত।

(২) তিনি জানেন যা কিছু মাটিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু মাটি থেকে বের হয় এবং যা কিছু আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু আসমানে উত্থিত হয়। আর তিনিই পরম দয়ালু, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(৩) আর কাফেররা বলে, 'আমাদের নিকট কেয়ামত আসবেনা', (হে রসূল!) আপনি বলুন, 'কেন নয়, অবশ্যই আসবে', শপথ আমার প্রতিপালকের! নিশ্চয় তা তোমাদের নিকট আসবে। তিনি অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আসমানে ও জমীনে কোন কিছু অনু পরিমাণ বা তার চেয়ে ছোট বা বড় তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারেনা। এর সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে সুস্পষ্ট গ্রন্থে। তা এজন্যে যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তিনি তাদেরকে পুরস্কার দান করবেন। তাদেরই জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং সম্মানজনক জীবিকা।(৪)

তফসীরুল কোরআন

সূরা সাবা প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতবী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একমত যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু একখানি আয়াত সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একদল অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এটি মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতখানি হলোঃ

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُو الْعِلْمَ......وَيَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

আর এ আয়াতের الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন। আর তত্ত্বজ্ঞানীদের আরেক দল উপরোক্ত আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হবার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। আর الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ বাক্য দ্বারা 'আহলে কেতাবে'র আলেমদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মোকাতেল (রঃ) এ মত পোষণ করতেন। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সকল মোমেন বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

নামকরণ

এ সূরার নাম 'সাবা'। এটি একটি স্থানের নাম। 'সাবা' এলাকার অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তারা ছিল অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। আল্লাহ পাক তাদেরকে অনেক সমৃদ্ধি দান করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে তারা সেখানে রাজত্ব করেছিল। ইতোপূর্বে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনায় রাণী বিলকিসের কথা

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৫৫

উল্লেখিত হয়েছে। বিলকিস এ সাবারই রাণী ছিল। সাবা এলাকাবাসীর সমৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ পাকের প্রতি শোকর গুজার হওয়া ছিল তাদের কর্তব্য, কিন্তু এ কর্তব্য পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছিল এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়েছিল। পরিণামে তারা হয়েছিল অভিশপ্ত, ভাগ্য বিড়ম্বিত। এ সূরায় তাদের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেন অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ তাদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে 'আমানতে'র উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় আমানতে খেয়ানতকারীদের শোচনীয় পরিণাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন সাবা জাতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছিল, কিন্তু নাফরমানী, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা এবং অহংকার তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছিল, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণে অবহেলা করবে, সেই মুশরেক ও মুনাফেকদেরকে আযাব দেয়া হবে। এ পর্যায়ে 'সাবা' জাতির মুশরেক ও মুনাফেকদের শাস্তির ঘটনা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

'সাবা' জাতির ঘটনার পূর্বে এ সূরায় হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ পাকের এ দু'জন মনোনীত বন্দা কিভাবে তাঁদের প্রতি অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণ করেছেন, তার বিবরণও দেয়া হয়েছে। এ সূরায় এরশাদ হয়েছে, হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) শুধু নবীই ছিলেন না; বরং সে যুগের বাদশাহও ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। আর সে ক্ষমতা সাধারণ রাজা-বাদশাহর ক্ষমতার অনুরূপ নয়; বরং অসাধারণ ক্ষমতা তাঁদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। জ্বীন জাতি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত ছিল, পশু-পক্ষী তাঁর তাবেদার ছিল, আল্লাহ পাক বাতাসকেও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত থাকতেন, আল্লাহ পাকের এবাদত-বন্দেগীতে সর্বদা মশগুল থাকতেন, তাঁর শোকর গুজারীতে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন।

আলোচ্য সূরায় হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনার পরই 'সাবা' জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা সমগ্র মানব জাতির জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।[১]

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৫৫-৫৭

এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী 'দালায়েলে' এর উল্লেখ করেছেন।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, কাতাদা (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) আরো লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে এরশাদ হয়েছেঃ

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ

অর্থাৎ কাফেররা বিদ্রূপ করে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে? আর এ সূরায় এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ

অর্থাৎ কাফেররা কেয়ামতকে সরাসরি অস্বীকার করে বলতো যে, 'কেয়ামত আমাদের নিকট আসবেনা' –তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে এ সূরায়।

শানে নুযুল

পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াত لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ। যখন নাযিল হলো (আল্লাহ পাক মুনাফেক ও মুশরেক নারী পুরুষকে শাস্তি দেবেন) একথা শ্রবণ করে আবু সুফিয়ান সহ মক্কার অন্যান্য কাফেররা বললো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে যে, 'আমাদের মৃত্যু হবে এবং এরপর কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হাযির করা হবে এবং আমাদের শাস্তি হবে', অথচ কেয়ামত কখনও আমাদের নিকট আসবেনা। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, 'কেন নয়; অবশ্যই আসবে, শপথ আমার প্রতিপালকের! নিশ্চয় তা তোমাদের নিকট আসবে'। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর দ্বারাও উভয় সূরার মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়।[২]

তফসীরুল কোরআন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

যিনি আসমান জমীনের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি যাঁর কর্তৃত্বাধীন, তাঁরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১০২-০৩

লক্ষ্যণীয়, সূরা সাবা শুরু করা হয়েছে الحمد। দ্বারা তথা 'প্রশংসা মাত্রই এক আল্লাহ পাকের জন্যে' একথা দ্বারা। পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে (৫) পাঁচটি সূরা 'আল্হামদু' বাক্য দ্বারা শুরু করা হয়েছে (১) সূরা ফাতেহা, (২) সূরা আনআম, (৩) সূরা কাহাফ, (৪) সূরা সাবা। (৫) সূরা ফাতের।

মূলতঃ মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত অনন্ত অসীম। এ নেয়ামতের উল্লেখ যেখানে করা হয়েছে সেখানে আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত দু' প্রকার (১) যে নেয়ামত সৃষ্টি করা হয়েছে এবং (২) যে নেয়ামত অব্যাহত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত নেয়ামত ইতোপূর্বে ছিলনা তা সৃষ্টি করা হয়েছে, আর শেষোক্ত নেয়ামত ইতোপূর্বে ছিল আর তা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ নেয়ামত সমূহ পুনরায় দু' প্রকার (১) দুনিয়ার নেয়ামত (২) আখেরাতের নেয়ামত।

এমনিভাবে আরো দু' প্রকার নেয়ামত রয়েছে (১) দৈহিক, (২) আধ্যাত্মিক।

যে পাঁচটি সূরা 'আলহামদু' দ্বারা শুরু করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রত্যেকটিতে কোন এক প্রকার নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি সূরায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন এ সূরা শুরু করা হয়েছে 'আলহামদু' দ্বারা এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে, আসমান জমীনের যাবতীয় নেয়ামত ও সকল রহমত আল্লাহ্ পাকেরই দান। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আসমান জমীনে যা কিছু আছে তার একচ্ছত্র মালিকানা শুধু আল্লাহ পাকেরই। সমগ্র সৃষ্টি জগতে তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত কার্যকর রয়েছে এবং সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই। আর শুধু যে আসমান জমীনের নেয়ামত সমূহই আল্লাহ্ পাকের তাই নয়; বরং আখেরাতের নেয়ামত সমূহও শুধুমাত্র তাঁরই, এজন্যে আখেরাতের সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারীও তিনিই।

বস্তুতঃ যেভাবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সমস্ত নেয়ামত আল্লাহ পাকের, ঠিক তেমনি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সমস্ত প্রশংসার অধিকারীও একমাত্র আল্লাহ পাকই, পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুনিয়াতে কারো কারো কোন গুণের প্রশংসা করা হয়, কিন্তু যেহেতু এ গুণ ঐ ব্যক্তির নিজস্ব নয়; বরং তার প্রতি তা আল্লাহ পাকেরই দান, তাই কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা হলেও প্রকৃত অবস্থায় তা আল্লাহ পাকেরই প্রশংসা হয়।

অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই। আর এ কারণেই সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ পাকের 'তসবীহ' পাঠে মগ্ন, তাঁর প্রশংসায় মুগ্ধ, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় ব্যস্ত, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যাপৃত।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ط

'আর আল্লাহ পাকের জন্যেই সমস্ত প্রশংসা আখেরাতেও'। আর আখেরাতে কোন আড়াল থাকবেনা, কোন মাধ্যম থাকবেনা; বরং সরাসরি আল্লাহ পাকেরই 'হামদ' করা হবে।

দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের 'হামদ' করা হয় তাঁর এবাদতের মাধ্যমে যা মানুষের ইচ্ছাধীন, যার ইচ্ছা সে আল্লাহ পাকের এবাদত করে, তাঁর নৈকট্য-ধন্য হয়, আর যার ইচ্ছা আল্লাহ পাকের এবাদত না করে অভিশপ্ত হয় তথা এবাদতের জন্যে দুনিয়াতে কাউকে বাধ্য করা হয়না। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ পাকের 'হামদ' বা তাঁর এবাদত কারো ইচ্ছাধীন হবেনা; বরং নিঃশ্বাসের ন্যায় তা হতে থাকবে। আর আল্লাহ পাকের 'হামদ' আখেরাতে হবে অত্যন্ত মধুময়, সুস্বাদু।

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

'আর তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনি সব বিষয়ে অবগত'। তিনিই সর্বজ্ঞানী, তিনিই অন্তর্যামী। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর জ্ঞানে সমান অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। তাঁর প্রতিটি আদেশ নিষেধ হেকমত পূর্ণ, তাৎপর্যবহ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। সৃষ্টি মাত্রেরই নিগুড় রহস্য তাঁর নিকট সম্পূর্ণ প্রকাশ্য। যত ফোটা পানি বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে পড়ে তা তাঁর জানা আছে। আর যত বীজ জমীনে বপন করা হয়, যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা কিছু মাটিতে প্রবেশ করানো হয়, আর যা কিছু মাটি থেকে বের করা হয় যথা বৃক্ষ-তরুলতা বা খণিজ দ্রব্য, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। আর যত নেক আমল বন্দাগণের তরফ থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে যায় এবং যত রহমত ও বরকত আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসে, সবই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا

অর্থাৎ তিনি জানেন যা কিছু মাটিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু মাটি থেকে বের হয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে নাযিল হয় আর যা কিছু আসমানে উত্থিত হয়। যেমন ওহী, তকদীরের লিখন প্রভৃতি, যা উপর থেকে জমিনে অবতীর্ণ হয়, এমনিভাবে যা জমীন থেকে উপরে উত্থিত হয় যেমন মানুষের দোয়া, আমল এবং আল্লাহ পাকের অগণিত ফেরেশতা যারা কখনো উপর থেকে নীচে আসে, আর

কখনো নীচ থেকে উপরের দিকে যায়। এর কোন কিছুই আল্লাহ পাকের জ্ঞানের বাইরে নয় কেননা, তিনি মহাজ্ঞানী।

وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ

'আর তিনি অত্যন্ত দয়াবান', তিনি মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন করেন, আর মানুষের কল্যাণার্থে তিনি সব কিছু করছেন। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

'তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সবকিছু'।

الْغَفُوْرُ

তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের শোকর গুজারীতে যে ত্রুটি হয়, তা তিনি ক্ষমা করেন।

এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য তা হলো এ বিশ্ব-সৃষ্টি, তার স্থিতি, শোভা সৌন্দর্য, মানুষের জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ, মানুষের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্য সব কিছুই নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের মহান দান, তাঁর বিশেষ রহমত, অশেষ অনুগ্রহ। যদি আল্লাহ পাক দয়া না করতেন তবে এমন অবস্থায় কারোই কিছু থাকত না, আল্লাহ পাক বড় দয়াবান, আর এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

'যদি আল্লাহ পাক মানুষের অপকর্মের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাদের শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে একটি প্রাণীও থাকত না, কিন্তু যেহেতু তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, অনন্ত অসীম করুণাময়, তাই অহরহ সর্বত্র তাঁর করুণা-ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে আছে এবং স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করছে, তাই সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ

'আর কাফেররা বলে, আমাদের নিকট কেয়ামত আসবে না, (হে রসূল!) আপনি বলুন, কেন নয়? অবশ্যই আসবে। শপথ আমার প্রতিপালকের! নিশ্চয় তা তোমাদের নিকট আসবে'।

কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের হামদ এবং তৌহিদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা রয়েছে। বিশেষতঃ যারা হাশর নশর ও কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আখেরাতের জিন্দেগীকে অবিশ্বাস করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

নিখিল বিশ্বের যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি বিরাট বিশ্ব কারখানার নির্মাতা, নীল আকাশের ছাদ থেকে শুরু করে ধরার ধূসর শয্যা পর্যন্ত যাঁর কর্তৃত্বাধীন, তিনি এ মহা বিশ্ব অযথা সৃষ্টি করেছেন এমন তো হতে পারে না; বরং এর পেছনে রয়েছে এক বিরাট উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি-না মহান স্রষ্টা তা অবশ্যই দেখবেন। অতএব, বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় কর্মকান্ডের একটা চূড়ান্ত পরিণতি অনিবার্য। আর এ অনিবার্য পরিণতির নামই আখেরাত। বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হলো কি-না তার বিচারই হবে কেয়ামতের কঠিন দিনে। যেদিন প্রত্যেকটি মানুষ দেখতে পাবে তার যাবতীয় কর্মকান্ড। আর সেদিনের কথাই পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকটি মানুষ দেখবে সে কী করে পাঠিয়েছে।—সূরা নাবা

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'আর সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে, সেদিন প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না'।

অতএব, কেয়ামত অবশ্যই আসবে এবং প্রতিটি মানুষকে সেখানে হাযির করা হবে এবং প্রত্যেকের ভাল-মন্দ আমলের পুরস্কার বা শাস্তি অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে।

عٰلِمِ الْغَيْبِ

বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক 'গায়ব' বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানী।

তফসীরকারগণ বলেছেন, علم الغيب শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামতের বিষয়টি অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানতে পারে না। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সম্পর্কে ঘোষণাই যথেষ্ট। যিনি গোপন ও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁরই নামে শপথ করে বলছি যে, কেয়ামত অবশ্যই আসবে। তবে তার দিন-ক্ষণ আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন রসূল বা ফেরেশতারও জানা নেই। মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকই তা জানেন।

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ

আসমান জমিনে ক্ষুদ্রতম অনু-পরমাণু যেখানেই থাক না কেন তা আল্লাহ পাকের নিকট থেকে গোপন নেই, কোন কিছুই তাঁর আগোচরে নেই। তাই মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে গেলে তথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও নতুন করে সৃষ্টি করা আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়, কোন সৃষ্টিকে মৃত্যুর পর পুড়িয়ে তার ছাইগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিলেও তাকে নতুন করে একত্রিত করা এবং হাযির করা আল্লাহ পাকের পক্ষে অতি সহজ। এটি শুধু তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত সৃষ্টি মাত্রেরই সকল অবস্থার বিবরণ সুস্পষ্ট গ্রন্থে তথা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। আর তা আল্লাহ পাকের জ্ঞানের আওতার মধ্যেই রয়েছে। কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর কুদরত হেকমত যেমন অপরিসীম তেমনি তাঁর জ্ঞানও অনন্ত অসীম। কে, কোথায়, কী অবস্থায়, কোন্ পর্যায়ে রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের জানা। তাই আল্লাহ পাক মানুষ মাত্রকে পুনর্জীবন দান করবেন, কেয়ামতের ময়দানে হাযির করবেন। যে এ জীবনে ভাল কাজ করেছে তাকে পুরস্কৃত করবেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لِّيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

'তা এজন্যে যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তিনি তাদেরকে পুরস্কার দান করবেন, তাদেরই জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং সম্মানজনক জীবিকা'।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে মানুষের দু'টি গুণের উল্লেখ করেছেন (১) ঈমান। অর্থাৎ যার মধ্যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান থাকে। (২) আমলে ছালেহ অর্থাৎ যে সেই ঈমান মোতাবেক নেক আমল করে তাদের জন্যে দু'টি পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

অর্থাৎ 'তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক জীবিকা'।

ঈমানের পুরস্কার হলো মাগফেরাত। কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করতেও পারেন'।

এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

من قال لا اله الا الله فقد دخل الجنة

'যে কলেমা তৈয়েবা পাঠ করে তথা আল্লাহ পাকের তৌহীদ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি ঈমান আনে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে'।

যাহোক, ঈমানের পুরস্কার হলো মাগফেরাত, আর নেক আমলের পুরস্কার হলো সম্মানজনক রিযক।

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তা হলোঃ

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ

'আসমান জমিনে অনু-পরমাণু পরিমাণ কোন বস্তুও আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই'।

মানুষের নিকট দু'টি জিনিস রয়েছে। দেহ এবং আত্মা। মৃত্যুর পর আত্মা (যদি নেককার হয়) আসমানে থাকে। আর দেহ মাটিতে মিশে যায়। তাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ মানুষের মৃত্যুর পর তার রুহ কী অবস্থায় রয়েছে এবং দেহ কী অবস্থায় রয়েছে তা আল্লাহ পাক জানেন। শুধু তাই নয়; বরং সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছেঃ

فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ লওহে মাহফুজে, তথা সরকারী রেজিষ্ট্রারে সবকিছুই লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষিত রয়েছে। অতএব, কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তিকে হাযির করা আদৌ কঠিন কিছু নয়।[১]

আলোচ্য আয়াতের 'আলিমুল গায়েব' শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক যেমন মহাজ্ঞানী তেমনি সর্বজ্ঞানীও। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এর কোন কালই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়; তাই কেয়ামত কবে আসবে একথা শুধু তিনিই জানেন, আর কেউ নয়। আল্লাহ পাক স্বয়ং

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২৪১

স্থান ও কালের উর্দ্ধে কেননা, এসব তাঁরই সৃষ্টি, তাই স্থান ও কালের বিস্তৃত পরিধিতে কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক তাঁর নবী রসূলগণকে যতখানি এলম দান করেছেন, তাঁরা ততখানিই জানতেন। যেমন হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণীর উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি আখেরাতের তথা জান্নাত দোযখের অনেক অবস্থা দুনিয়াতে থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, এটি তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকেরই দান।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্য গ্রহণ হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নিয়ে নামাজে দন্ডায়মান হন এবং সুদীর্ঘ সময় ঐ অবস্থায় থাকেন। নামাজ শেষে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা দেখেছি যে, আপনি স্ব-স্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় কোন কিছু নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, এরপর আমরা দেখেছি, আবার থেমে গেছেন'। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমি জান্নাত দেখেছিলাম'। আর জান্নাতের ফলের একটি ছড়া নিতে আমি হাত বাড়িয়েছিলাম, যদি তা আমি নিতে পারতাম তবে যতদিন পৃথিবী থাকত, ততদিন পর্যন্ত তোমরা (সমস্ত মুসলমান) খেতে পারতে (আর তা কখনও শেষ হতোনা)। এরপর আমি দোযখ দেখেছি, আজকের মত আর কখনো এত ভয়াবহ দৃশ্য আমি দেখিনি। দোযখীদের মধ্যে অধিকাংশ সংখ্যক নারীদেরকে আমি দেখেছি।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই, কেয়ামতের পরই মানুষ জান্নাত ও দোযখে যাবে, অথচ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জান্নাত ও দোযখের সে দৃশ্য আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন। যেভাবে মানুষ স্বপ্নে অনেক কিছু দেখে, তেমনি আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বাস্তবেই জান্নাত দোযখ দেখিয়েছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথা যে, 'যদি ঐ ফল আমি নিতে পারতাম তবে যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা খেতে পারতে', উক্তিটি এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, তিনি বাস্তবেই জান্নাত এবং দোযখ দেখেছিলেন।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি জান্নাতকে দেখেছি, তার মধ্যে আবু তালহার (রাঃ) স্ত্রীকেও দেখা গেছে। আমি পদক্ষেপ গ্রহণের শব্দ শুনলাম, পরে দেখতে পেলাম, সে ছিল বেলাল'।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মসনদে আহমদে এবং আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার পরওয়ারদেগার যখন আমাকে উপরে (শবে মে'রাজে) নিয়ে গেছেন, তখন আমি এমন লোকদের এলাকা অতিক্রম করেছি, যাদের নখ ছিল তামার ন্যায়, তারা ঐ নখ দিয়ে তাদের চেহারা এবং বক্ষকে চিরছিল'। আমি জীব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এরা কারা?' জীব্রাঈল বললেন, 'এরা সে সব লোক, যারা মানুষের গোশ্ত ভক্ষণ করতো (গীবত বা পরনিন্দা করতো)'।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার সম্মুখে দোযখকে আনা হয়। তাতে বনী ইসরাঈলের একটি স্ত্রীলোককে দেখানো হয়। ঐ স্ত্রীলোকটিকে একটি বিড়ালের জন্যে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটিকে বেধে রেখেছিল, তাকে কোন খাবার দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে করে সে কীট-পতঙ্গ খুঁজে খাবে, অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধার কারণে মারা যায়। (আল-হাদীস)

এই হাদীস সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরকালের অনেক দৃশ্য দেখিয়ে দিয়েছেন। আর শবে মে'রাজের সম্পর্কে তো আল্লাহ পবিত্র কোরআনে নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا

(আমি তাঁকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখাতে চাই) আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আখেরাতের অনেক কিছু দেখিয়েছেন, তবে 'কেয়ামত কবে হবে'? দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে তা জানানো হয়নি। এ সম্পর্কে কেবলমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৪৭-৪৮

وَالَّذِيْنَ ⑤
سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ
اَلِيْمٌ ⑤ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑥
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ
اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑦

তরজমা

(৫) যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত, তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৬) আর যাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তারা দেখতে পায় যে আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার নিকট যা নাযিল হয়েছে তা-ই সত্য, আর তা পথ প্রদর্শন করে পরম পরাক্রমশালী স্বয়ং প্রশংসিত আল্লাহ পাকের পথের দিকে।

(৭) আর কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে এ খবর দেয়, যখন তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা। আর এ আয়াতে কাফেরদের অপকর্ম এবং ভীষণ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ

'যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত, তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

'আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার' অপচেষ্টা তারা কিভাবে করতো?

তফসীরকারগণ এর জবাব দিয়েছেন, কাফেররা এ অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত যেন কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া না দেয়, ইসলাম'কে উপলব্ধি করতে না পারে, এমনকি হজ্বের মওসুমে কাফেররা বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকদের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অপপ্রচার করে বেড়াত যেন কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে। এ পর্যায়ে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মক্কার একজন দুঃস্থ বৃদ্ধা মহিলা জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে তার বোঝা মাথায় নিয়ে আসছিল। প্রখর রোদ্রে বৃদ্ধার এ কষ্ট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দয়াদ্র অন্তর সইতে পারেনি, তাই তিনি বৃদ্ধার মাথার বোঝা নিজেই বহন করে, তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। তখন বৃদ্ধার আনন্দের সীমা ছিলনা, তাই সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আপ্যায়ন করতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু তার গৃহে খাবার বলতে কিছুই ছিলনা, তাই সে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললো, 'হে যুবক! তুমি আমার এত বড় উপকার করলে, আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তোমাকে একটু আপ্যায়ন করাই কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আমার ঘরে এমন কিছুই নেই যা দ্বারা তোমাকে আপ্যায়ন করা যায়। তবে আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিতে চাই যা তোমার জন্যে উপকারী হবে। বর্তমানে এই শহরে একজন যুবক নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করে, তাঁর নাম "মোহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। সে আমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলে, তার বক্তব্য হলো যে মূর্তিপূজা অন্যায়, তাই তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি যে তুমি কখনও ঐ যুবকের কাছেও যাবেনা, অন্যথায় সে তোমাকে তোমার পূর্ব পুরুষদের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে তার কথা শুনছিলেন, এরপর তিনি এরশাদ করলেনঃ 'এছাড়া তোমার আর কোন কথা আছে কি'? বৃদ্ধাঃ 'না,' এটিই তুমি স্মরণে রেখ'। এরপর তিনি এরশাদ করেলেনঃ 'আপনি যে যুবক সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করছেন, আমিই তো সেই যুবক'। আমারই নাম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। আমিইতো মানুষকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করার আহবান জানাই এবং নিজেদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর পূজা-অর্চনা বর্জন করার কথা বলি'।

একথা শ্রবণ করে বৃদ্ধা যেন নতুন জীবন ফিরে পেল। অত্যন্ত কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিই কি সেই যুবক'? তিনি এরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ, আমিই'।

বৃদ্ধা বললোঃ 'যদি তুমিই সে যুবক হও, তবে তোমার সত্যবাদী হবার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই'। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করি। আমি পড়ি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ'।

এ ঘটনায় একথা প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা এ অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত যেন কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ করতে না পারে। আর এটিই হলো وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ বাক্যটির ব্যাখ্যা।

একরামা (রঃ) এবনে যায়েদ (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণও অনুরূপ মতই পোষণ করতেন। তখন কাফেরদের একটি মাত্র কর্মসূচীই ছিল আর তা হলো যে কোন মূল্যে মানুষকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখা, মানুষের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো, পবিত্র কোরআনের মহান বাণী শ্রবণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয়া। এমন দূরাত্মা কাফেরদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে শাস্তির ঘোষণা রয়েছেঃ

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ

‘এরাই সে সব লোক যাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’।

অর্থাৎ যারা মানুষকে, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণে বাধা দিত, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ইসলামের প্রচারে বাধা দিত তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ

‘আর যাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে তারা দেখতে পায় যে আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার কাছে যা নাযিল হয়েছে তা-ই সত্য’।

আলোচ্য আয়াতে الذين اوتوا العلم কথাটির দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে (১) সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের অনুসারীগণ আর (২) আহ্‌লে কেতাব আলেমদের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করেছেন, যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ), হযরত কা'ব (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।[১]

আয়াতের মর্মকথা এই, কেয়ামতের আগমন এজন্যে অনিবার্য যে, যারা দুনিয়ার জীবনে জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে তারা কেয়ামতের কথা শ্রবণ করে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু কেয়ামতের দিন পবিত্র কোরআনের সত্যতা তারা সচক্ষে দেখতে পাবে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক যা ঘোষণা করেছেন তা ধ্রুব সত্য। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের প্রতি, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১০৮

এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করেছে তাদের সে বিশ্বাস কেয়ামতের দিন عين اليقين এবং حق اليقين এ পরিণত হবে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, কোরআনে করীমে যা কিছু ঘোষণা করা হয়েছে তা চির সত্য। আর এ কোরআনই মানুষকে পরাক্রমশালী সর্বগুণাকর, স্বয়ং প্রশংসিত আল্লাহ্ পাকের দিকে পথ প্রদর্শন করে তথা ইসলামের দিকে হেদায়েত করে। মূলতঃ যারা পবিত্র কোরআন মেনে চলে তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত। আর যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে নিজেকে দূরে রাখে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তা হারায় তারা নিশ্চয় ভাগ্যাহত, পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ

'আর কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে এ খবর দেয়, যখন তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে'।

দুর্বৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বিদ্রুপ করে বেয়াদবী করতো, তারা একে অন্যকে ডেকে বলতো, আরে শুনেছো? একজন লোক আছে যে এমন কথা বলে যা কেউ কখনও শোনেনি। সে বলে, তোমরা যখন মরে পঁচে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে তখন তোমরা আবার নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করবে। যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করতো তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এভাবে বিদ্রুপ করার ধৃষ্টতা দেখাতো। পবিত্র কোরআনের সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ পাক এর জবাব দিয়েছেনঃ

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۞ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ

'(যে নিজের সৃষ্টিকে ভুলে গিয়েছে) সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পঁচে গলে যাবে? (এর জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন (হে রসূল!) আপনি বলুন, তার মধ্যে তিনিই প্রাণ সঞ্চার করবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই'।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক ইতোপূর্বে এরশাদ করেছেন কাফেররা বলেছেঃ لا تاتين الساعة "আমাদের নিকট কেয়ামত আসবে না"। তখন আল্লাহ পাক তাদের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ لتاتينكم "কেয়ামত অবশ্যই আসবে"। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ কেয়ামত এজন্যে অনিবার্য যে

যারা ঈমানদার, নেককার তাদেরকে তাদের ঈমান ও নেক আমলের জন্যে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করবেন, মাগফেরাত দান করবেন। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের মহান বাণীর বিরোধিতা করে, যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, তাদের শাস্তির বিধান করবেন। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ যারা গুণী-জ্ঞানী, যারা এলম হাসিল করেছে তারা বলে পবিত্র কোরআনই সত্য। আর যারা এলম থেকে বঞ্চিত তথা মূর্খ তারা শুধু যে কেয়ামতের প্রতি, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা তাই নয়, বরং তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রুপ করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে বলে, আমাদের এখানে এমন একজন লোক রয়েছে যে এই খবর দেয়ঃ মানুষ যখন মৃত্যুর পর পঁচে গলে শেষ হয়ে যাবে তারপরও নাকি নতুন সৃষ্টি হিসাবে নব-জীবন লাভ করবে? এভাবে কাফেররা তাদের মূর্খতা প্রসূত কুফরী ও না-ফরমানীর কথা প্রকাশ করতো।[১]

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ
بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ
يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ اعْمَلْ
سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١١﴾

তরজমা

(৮) সে কি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করেছে। অথবা সে কি উম্মাদ? কিছুই নয়, মূলতঃ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা তারা আযাব এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২৪৩

(৯) তারা কি তাঁদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে সহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেব। অথবা তাদের উপর এক খন্ড আকাশও ফেলতে পারি। নিশ্চয় আল্লাহ পাকের অভিমুখী প্রতিটি বন্দার জন্যে নসিহত রয়েছে।

(১০) নিশ্চয় আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ দিয়েছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরাও তার সঙ্গে মধুর স্বরে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাক। আর পাখিরা তোমরাও, অধিকন্ত দাউদের জন্যে আমি লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।

(১১) যাতে করে তোমরা পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার, আর তোমরা নেক আমল কর, তোমরা যা কিছু কর আমি অবশ্যই তা লক্ষ্য করি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কথার উল্লেখ ছিল, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রুপ করে বলেছিল যে, 'আমরা কি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব যে এমন কথা বলে যা কখনও কেউ শোনেনি। সে বলে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর ছিন্ন-ভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা নতুন জীবন লাভ করবে'। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা একথাও বলেছে, এই যে আজগুবী কথা এ ব্যক্তি বলে তার দু'টি কারণ হতে পারে (১) হয়তো সে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করেছে অথবা (২) সে বিকারগ্রস্ত।

তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক কাফেরদের এ অসত্য কথনের প্রতিবাদ করে এরশাদ করেছেনঃ বরং কিছুই নয়, মূলতঃ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, তারা আযাব এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করে, তারা এর জন্যে কখনও কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা, গাফলতের আবর্তে নিপতিত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে আর পথভ্রষ্ট অবস্থায় তারা অনেক দূর চলে যায়। তারা এ জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করলেও পরকালীন জীবনের সত্যতাকে অস্বীকার করে; বরং পুনর্জীবন লাভকে অসম্ভব মনে করে। আর এ কারণেই তারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস দেখায়, অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করার পরিণতি হয় কত ভয়াবহ সে ধারণাও তারা রাখেনা। তাদের এ মূর্খতার কারণেই তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে এমন অন্যায় উক্তি করে। তিনি আল্লাহ পাকের নামে কখনও মিথ্যা কথা রচনা করেন না, আর তিনি বিকারগ্রস্তও নন এজন্যে পূর্ববর্তী

আয়াতে কেয়ামত যে অবশ্যম্ভাবী এবং প্রতিটি মানুষকে যে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে, একথার প্রমাণ উল্লেখিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط

'তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আসমানে জমীনে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে সহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেব, অথবা তাদের উপর এক খন্ড আকাশও ফেলতে পারি'।

বস্তুতঃ আসমান জমীনে আল্লাহ পাকের কুদরতের অনেক জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সমগ্র পৃথিবীকে এক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। কিন্তু কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করে না কেননা, তারা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর চলে গেছে।

إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ط

যদি আমি ইচ্ছা করি তবে জমিন ধ্বসিয়ে তাদেরকে ভূগর্ভে নিক্ষেপ করতে পারি। যেমন কারুনকে জমিন ধ্বসিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। অথবা এই সেদিন (১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে) জাপানের কোবে শহরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাত্র বিশ সেকেন্ডে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। অথবা যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তবে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ করেও তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। মূলতঃ আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তারা কি লক্ষ্য করেনা? আসমান জমিন তাদেরকে কিভাবে পরিবেষ্টন করে রখেছে। আসমান জমিনের মধ্যে তারা আটকা পড়ে আছে। এর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোন পথ তাদের নেই। অতএব, যিনি বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মহাশক্তি, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছু, তিনি কি সমগ্র সৃষ্টি জগতকে নির্মুল করতে পারেন না? আর এমনিভাবে ভাঙা সৃষ্টিকে যদি তিনি পুনরায় গড়ে তুলতে চান কে তাকে বাধা দেবে? তাই কোন মৃত মানুষকে তিনি যদি জীবিত করতে চান তবে কি তা কঠিন হবে? আদৌ নয়। অতএব, মানুষের পুনঃজীবন লাভ করা, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া, বিচারে ঈমানদার ও নেককারের পুরস্কৃত হওয়া এবং বেঈমান ও বদকারদের কোপগ্রস্ত হওয়া সবই অনিবার্য, বাস্তব, ধ্রুব সত্য, অনস্বীকার্য।

কোন কোন তফসীরকার افلم يروا। বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এতে কাফের মুশরেকদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। অর্থাৎ এরা কি অন্ধ, এরা কি দেখে না যে তারা আসমান জমিনের মধ্যে বন্দী রয়েছে, তারা যেখানেই যাক যত দূরই যাক

আসমান জমিনের ভেতরেই থাকবে, এর বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। এমন অবস্থায় এ অবাধ্য, নাফরমান, মুশরেক মুরতাদদের যে কোন সময় আল্লাহ পাক জমিন ধ্বসিয়ে আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করতে পারেন। পৃথিবীর ইতিহাস এমন ধ্বংসের সাক্ষী। আঞ্চলিক ভিত্তিতে পৃথিবীতে বহুবার এমন ধ্বংস এসেছে, তবুও কি তারা ভয় করেনা? আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করার কারণে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করার কারণে এমন শাস্তি বারে বারে এসেছে। আদ জাতি, সামুদ জাতিকে এজন্যেই ধ্বংস করা হয়েছে। ফেরাউন ও তার জাতিকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করা হয়েছে। আর নমরূদকে ধ্বংস করার জন্যে শুধু একটি দুর্বল অসহায় মশা ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ যুগের অন্যতম পরাশক্তি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকেও (১৯৯০) ধ্বংস করা হয়েছে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ

'নিশ্চয় এতে আল্লাহ পাকের অভিমুখী প্রতিটি বন্দার জন্যে রয়েছে নসিহত'।

অর্থাৎ যাদের জ্ঞান বুদ্ধি আছে, আর যারা সে জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে, ধূলার ধরণীর বুকে, নীলাভ আকাশের নীচে তারা দেখতে পায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত এবং জীবন্ত নিদর্শন। আর বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা করার কারণেই বিশ্ব সৃষ্টির ভবিষ্যত তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে তাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। মূলতঃ এ দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের কারণেই তারা আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। আর এ পন্থা হল আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের পর তাঁর মহান দরবারে পূর্ণ আত্ম সমর্পণ, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় সর্বক্ষণ রত থাকা। আর তাঁর হুকুম পালনের জন্যে আত্মোৎস্বর্গ করা। সর্বদা তাঁর হামদ ও সানা, তসবীহ তাহলীল পাঠে রত থাকা, তাঁর মহান দরবারে শোকর গুজার থাকা। অবশ্য এ সমস্ত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সে ব্যক্তিই দেখতে পায় যে আন্তরিকভাবে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা ও অর্থ-সম্পদের দিকে দেখেন না, কিন্তু তিনি লক্ষ্য রাখেন তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তোমাদের কর্মের দিকে'।

অতএব, অন্তরকে আল্লাহ পাকের প্রতি আকৃষ্ট রাখাই সাফল্য লাভের সুনিদৃষ্ট পন্থা।

বস্তুতঃ যার অন্তরে সত্যকে গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা থাকে, যে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে সে সত্যের সন্ধান পায়। আর যার অন্তরে সত্যের অন্বেষণ না থাকে, তথা আল্লাহ পাকের দিকে যে মনোনিবেশ করেনা, সে এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًاؕ

'আর নিশ্চয় আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ দিয়েছিলাম, 'হে পর্বতমালা! তোমরাও দাউদের সাথে মধুর স্বরে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাক, আর হে পাখীরা! তোমরাও'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আসমান ও জমীন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছিলে যে, এ বিশাল বিস্তৃত আসমান জমীনের সৃষ্টিতে আল্লাহ পাকের কুদরতের, তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের বহু বিস্ময়কর জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। অবশ্য এ নিদর্শন আল্লাহ পাকের সে বন্দাদের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবেশ করে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের এমন দু'জন বন্দার আলোচনা স্থান পেয়েছে, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছিলেন, একদিকে তাদেরকে দান করেছিলেন নবুওয়্যত, অন্যদিকে দুনিয়ার বাদশাহাত বা ক্ষমতাও দান করেছিলেন। দ্বীন ও দুনিয়ার এতসব নেয়ামত লাভের পরও তাঁরা গাফ্লতের আবর্তে নিপতিত হননি; বরং সর্বদা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর গুজার থাকতেন। যদি রাষ্ট্র পরিচালনার কঠিন ও জটিল দায়িত্ব পালনের কারণে কখনও কোন ভুল-ত্রুটি বা গাফলত হয়ে থাকে, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত হতেন এবং এস্তেগফার করতেন। আর এটিই হলো প্রকৃত বন্দার বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ এ ঘটনায় শেষ বিচারে দিন বা কেয়ামতকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কথার জবাবও রয়েছে। আল্লাহ পাক যখন কোন বন্দার জন্যে কোন পাহাড়-পর্বতকে অনুগত করে দেন এবং লৌহকে কোমল করে দেন, তিনি কি মৃত মানুষের হাড় অস্থিকে একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবন দান করতে পারেন না? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا

হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিশেষ ফজিলত

আর নিশ্চয় আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছি, তাঁকে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছি, অন্যান্য অনেক বন্দার উপর তাঁকে বিশেষ ফজিলত দান করেছি। কেননা, নবুওয়্যত এবং বাদশাহাত এ দু'টি নেয়ামত সাধারণতঃ একত্রিত হয়না, কিন্তু আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে একই সঙ্গে এ দু'টি নেয়ামত দান করেছেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে যা বলেছিলেন পবিত্র কোরআনেই রয়েছে তার উল্লেখ।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি তাঁর অনেক মোমেন বন্দার উপর আমাদেরকে বিশেষ ফজিলত দান করেছেন'।

এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম আলোচ্য আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁকে আল্লাহ পাক নবুওয়্যত দান করেছেন এবং 'যবুর' নামক আসমানী গ্রন্থও দান করেছেন, এর পাশাপাশি রাষ্ট্র ক্ষমতাও দান করেছেন এবং তাঁকে সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী করেছেন। আর স্পর্শ করা মাত্র তাঁর হাতে লৌহ নরম হয়ে যেত- এ মোজেযাও তাঁকে দান করা হয়েছিল। এসবই হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদা। এমনিভাবে আল্লাহ পাক পাহাড়-পর্বতকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'দাউদ যখন আমার তসবীহ পাঠ করে, আমার পবিত্রতা বর্ণনা করে তখন হে পর্বতমালা! তোমরাও তাঁর সাথে আমার তসবীহ পাঠে মশগুল হও'। আল্লাহ পাক এ আদেশ পক্ষী কূলকেও দিয়েছিলেন। এসবই ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর অনন্য-সাধারণ মোজেযা, আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ। হযরত দাউদ (আঃ) কখনও মাঠে-ময়দানে, জঙ্গলে একাকী আল্লাহ পাকের জিকর করতেন, 'জিকরে এলাহী'তে বিভোর হয়ে ক্রন্দন করতেন, তখন তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বরে অভিভূত হয়ে পাহাড়-পর্বত এবং পাখীরাও আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠে মশগুল হতো।

এ পর্যায়ে কেউ যেন এ ভুল ধারণা পোষণ না করে যে, হয়তো হযরত দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হতো পাহাড় পর্বত থেকে কেননা, প্রকৃত অবস্থা ছিল এই, এটি হযরত দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ছিলনা; বরং পাহাড়-পর্বত এবং পাখীরাও হযরত দাউদ (আঃ)-এর তসবীহ পাঠে মশগুল হতো, আর এটিই হযরত দাউদ (আঃ)-এর মোজেযা, তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) পাহাড়ে আর কখনও নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করে আল্লাহর জিকর করতেন। আর তখন অনুরূপভাবে পাহাড়-পর্বতও তাঁর সঙ্গে তসবীহ্ পাঠ করতে থাকত, পাখীরাও উড়ন্ত অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের জিকর করতো।

তফসীরকারদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, অনেকক্ষণ জিকর করার কারণে হযরত দাউদ (আঃ) কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন আল্লাহ্ পাকের আদেশ ক্রমে পাহাড়-পর্বত অনুরূপভাবে আল্লাহর জিকর শুরু করতো, পাহাড়-পর্বতের জিকর শ্রবণ করে তাঁর ক্লান্তি দূর হয়ে যেত, তিনি নব উদ্যমে পুনরায় তসবীহ-তাহ্লীলে মশগুল হয়ে যেতেন।

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ

'আর আমি দাউদের জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম'।

এটি ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর আরেকটি মোজেযা। হযরত দাউদ (আঃ) লোহাকে যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারতেন, তাঁর হাতে পড়লে লোহা মোম বা আটার মত নরম হয়ে যেত।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন ঃ হযরত দাউদ (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলের বাদশাহ্ হলেন তখন তিনি নিজের জন্যে এ নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, তিনি রাতে বেশ পাল্টিয়ে বের হয়ে পড়তেন, জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতেন এবং যারা তাঁকে চেনেনা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'দাউদ কেমন লোক'? লোকেরা তখন তাঁর প্রশংসা করত এবং তাঁর সম্পর্কে ভালো কথা বলতো। একদিন আল্লাহ্ পাক মানবাকৃতি দিয়ে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাক্ষাত হলো, যথানিয়মে তিনি তাঁকে নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। মানবাকৃতি ধারণকারী ঐ ফেরেশতা বললেন, 'যদি একটি বিষয় না থাকত তবে বাদশাহ্ ভাল মানুষই'।

একথা শ্রবণ করে হযরত দাউদ (আঃ) অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়লেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর বন্দা! সে বিষয়টি কি'? ফেরেশতা বললেন, 'দাউদ! বায়তুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকেই তার পানাহারের ব্যয় বহন করে এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্যেও সে বায়তুল মাল থেকেই অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করে'।

কোতায়বা (রঃ) বলেছেন, এ কারণেই হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার রিয্কের জন্যে অন্য কোন ব্যবস্থা করে দিন যা দ্বারা আমার ও আমার পরিবারবর্গের ব্যয়ভার বহন করতে পারি। আর আমি যেন বয়তুল মালের মুখাপেক্ষী না থাকি'। আল্লাহ্ পাক তাঁর জন্যে লোহাকে

নরম করে দিলেন এবং লৌহবর্ম তৈরী করা শিখিয়ে দিলেন। পৃথিবীতে সর্ব প্রথম যুদ্ধের বর্ম তিনিই তৈরী করেছিলেন, তিনি যে বর্ম তৈরী করতেন তার প্রতিটির মূল্য হতো চার হাজার দেরহাম। এর দ্বারা তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের ব্যয়ভার বহন করা হতো, উপরন্তু তিনি গরীব-মিসকীনকে দান খয়রাতও করতেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, দৈনিক তিনি একটি বর্ম অবশ্যই তৈরী করতেন, যা ছয় হাজার দেরহামে বিক্রয় হতো, তন্মধ্যে দু' হাজার দেরহাম পরিবারবর্গের জন্যে রাখতেন, আর চার হাজার দেরহাম দান খয়রাত করতেন।

হযরত মেকদাম এবনে মাদীকারব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কোন উপার্জনই নেই।

আল্লাহ্র নবী হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর হাতের রোজগার থেকেই আহার করতেন।[১]

হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী করেছিলেন, পৃথিবীর কোন মানুষের কণ্ঠ এত মিষ্টি মধুর ছিলনা, তিনি যখন 'যবুর' তেলাওয়াত করতেন তখন আকাশের পাখী, জ্বীন ও মানুষ এমনকি, অরণ্যের হিংস্র জন্তুরা পর্যন্ত তাঁর সম্মুখে এসে সমবেত হতো। বাঘ আর ছাগল একত্রিত হয়ে তাঁর সুললিত কণ্ঠের যবুর পাঠ শ্রবণ করতো আর যখন তিনি তসবীহ পাঠ করতেন তখন ঘর দুয়ার, বৃক্ষ-তরুলতা, পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে তসবীহ পাঠ করতো। এটিও ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর মোজেযা।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক অসাধারণ সৌন্দর্য এবং রূপ দিয়েছিলেন আর হযরত দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠকে করেছিলেন সুমধুর।

যেভাবে বৃক্ষ-তরুলতা, পাহাড়-পর্বত হযরত দাউদ (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে মশগুল হতো, তেমনি 'উসতোয়ানায়ে হান্নানা।[২] প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরহ সইতে না পেরে ক্রন্দন করেছিল। হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাক যে অসাধারণ অনুগ্রহ করেছিলেন, তা হলো লোহার কাঠিন্য দূর হয়ে যাওয়া, মোমের মত নরম হয়ে যাওয়া। আর লোহা দ্বারা

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৬৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১১৫-১৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৫৩-৫৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৬৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৪৬

২। হিজরতের পর মসজিদে নববীতে একটি মৃত খেজুর বৃক্ষের উপর হেলান দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর খোতবা দিতেন, যখন মিম্বর তৈরী হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাতে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতে শুরু করলেন, তখন 'উসতোয়ানা'-নামের ঐ মৃত খেজুর বৃক্ষ ক্রন্দন করছিল আর এটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা।

কিছু তৈরী করলে আগুনে পোড়ানোর আর কোন প্রয়োজনই হতো না, হযরত দাউদ (আঃ)-এর স্পর্শই যথেষ্ট ছিল।

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًاط

'যাতে করে তোমরা পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার, আর তোমরা নেক আমল করতে থাক'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এ আদেশ দিয়েছেন যে, লৌহ দ্বারা প্রশস্ত যুদ্ধ বর্ম তৈরী কর এবং এর সবকিছু পরিমাণ মোতাবেক কর। তার বুননে এবং এক অংশকে অন্য অংশের সঙ্গে সংযোজনে পরিমাণ ঠিক রাখ, এমন পাতলা যেন না হয় যে, ফেটে যাবে, আর এমন ভারীও যেন না হয়, যে বহন করা কঠিন হবে। আর এত মজবুত হবে যেন তার ব্যবহারকারী তীর এবং তরবারী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। আর তোমরা নেক আমল কর তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ কর, আল্লাহ পাকের অসাধারণ নেয়ামত লাভ করে গাফেল হয়োনা, নিষ্ক্রীয় হয়োনা, বরং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায়ে মশগুল থাক, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আত্মনিয়োগ কর অর্থাৎ যেভাবে দুশমনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে যুদ্ধের বর্ম তৈরী কর, ঠিক তেমনি শয়তানের হামলা থেকে আত্মরক্ষা জন্যেও নেক আমল করতে থাক, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কাজ করতে থাক।

اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছি'। তোমাদের আমলের প্রতিদান আমি অবশ্যই দেব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ পাক পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তুই পছন্দ করেন, তিনি যে হুকুম নবী রসূলকে দিয়েছেন, অনুরূপ হুকুম মোমেনদেরকেও দিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেন ঃ হে পয়গম্বরগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর এবং নেক আমল কর।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৫৪

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَ
اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ
رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾
يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ
اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾

তরজমা

(১২) আর আমি বাতাসকে সোলায়মানের অনুগত করে দেই, যা সকালে একমাসের পথ অতিক্রম করতো, আর সন্ধ্যায়ও একমাসের দূরত্বে পৌঁছে যেত। আর আমি তার জন্যে গলিত তাম্রের ঝর্ণা প্রবাহিত করি এবং তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে জ্বীনদের মধ্যে কিছুসংখ্যক তার সম্মুখে কাজ করতো। তাদের মধ্যে যে কেউ আমার নির্দেশ অমান্য করে, আমি তাকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করিয়ে ছাড়বো।

(১৩) তারা সোলায়মানের ইচ্ছা মোতাবেক তার জন্যে প্রাসাদ, মূর্তি, পুষ্করিণীর ন্যায় বড় বড় পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ তৈরী করতো। (আমি বলেছিলাম) হে দাউদ পরিবার! তোমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কাজ করতে থাক আর আমার বন্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ।

(১৪) অবেশেষে যখন আমি সোলায়মানকে মৃত্যুমুখে পতিত করি, তখন জ্বীনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে শুধু মাটির পোকা জানিয়ে দিল যা সোলায়মানের লাঠিটিকে কুঁড়ে খাচ্ছিল, যখন ঘুণে খাওয়া লাঠিটি পড়ে গেল তখনই জ্বীনেরা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করলো যে, যদি তারা গায়বী খবর জানতো, তবে এমন অপমানজনক কষ্টে পড়ে থাকত না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর পুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীর কথা স্থান পেয়েছে।

পিতা-পুত্র উভয়েই আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য ছিলেন, তাঁদের উভয়ের অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের বন্দেগীর ফজিলত ও মাহাত্মের বিবরণ দেয়া, কেননা তাঁদের বিবরণে একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণ এবং পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয় আল্লাহ পাকের বন্দেগীর মাধ্যমে, বন্দা যতক্ষণ আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে থাকে, মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে আল্লাহ পাকের ভয়, মহব্বত এবং শোকর গুজারীর ভাব জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ পাকের রহমতের বারিধারা তার প্রতি বর্ষিত হতে থাকে, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ

'আর আমি বাতাসকে সোলায়মানের অনুগত করে দেই যা সকালে একমাসের পথ অতিক্রম করতো, আর সন্ধ্যায়ও একমাসের দূরত্বে পৌঁছে যেত'।

আল্লাহ পাক বাতাসকে সোলায়মান (আঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁর মোজেযা। তিনি সকাল বিকাল দু' বেলায় দু' মাসের দূরত্ব অতিক্রম করতেন। তিনি তাঁর সিংহাসন, সৈন্য সামন্ত এবং দরবারের সমস্ত লোক নিয়ে সিরিয়া থেকে ইয়ামন এবং ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সকাল বিকাল আসা-যাওয়া করতেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) সকালে সিরিয়ার দামেশক থেকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করে উড্ডয়ন করতেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পারস্যের 'এস্তাখার' নামক শহরে পৌঁছতেন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, দামেস্ক থেকে 'এস্তাখারে'র দূরত্ব হলো একমাসের। কোন দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে একমাসের প্রয়োজন পড়ত, যা হযরত সোলায়মান (আঃ) অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করতেন।

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) এস্তাখারেই দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন, সন্ধ্যায় এস্তাখার থেকে রওয়ানা হয়ে কাবুল আসতেন, এস্তাখার থেকে

কাবুলের দূরত্বও ঐ সময়ের দ্রুতগামী যানের পক্ষে একমাস সময় লেগে যেত। রাতে তিনি সেখানেই অতিবাহিত করতেন। অর্থাৎ একই দিনে হযরত সোলায়মান (আঃ) দু' মাসের পথ অতিক্রম করতেন। এটি ছিল তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান, যা মোজেযা হিসেবে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে।[১]

আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) 'রে' নামক স্থানে সকালের খাবার গ্রহণ করতেন, আর সন্ধ্যায় আহার করতেন সমরকন্দে।

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

'আর আমি তার জন্যে গলিত তাম্রের ঝর্ণা প্রবাহিত করি'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ ঝর্ণাটি ইয়ামনে প্রবাহিত হয়েছিল। আর জ্বীন জাতিকেও আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করে দিয়েছিলেন। জ্বীনেরা ঐ তাম্রকে ছাঁচে ঢেলে নিত এবং পুকুরের সমান বড় বড় থালা-বাসন এবং বৃহদাকারের ডেগ তৈরী করতো। যেহেতু এগুলো আকারে বড় এবং ওজনে ভারী হতো, তাই বারংবার নাড়াচাড়া করা হতোনা; বরং ঐ ডেগগুলোকে উনুনের উপর বসিয়ে রাখা হতো।

যেভাবে হযরত দাউদ (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ পাক লোহাকে নরম করেছিলেন, তেমনি আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে তাম্রকে নরম করে দিয়েছেন এবং তাম্রের ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে তাম্রের ঝর্ণাকে তিনদিন পর্যন্ত প্রবাহিত রাখেন, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ.........

'এবং কত জ্বীনও তার প্রতিপালকের নির্দেশ মোতাবেক তাঁর সম্মুখে কাজ করতো, তাদের মধ্যে যে কেউ আমার নির্দেশ অমান্য করে, আমি তাকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করিয়ে ছাড়বো'।

জ্বীনদের মত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির সৃষ্টিকেও আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করে দিয়েছিলেন। সাধারণ কুলি মজুরের মত তারা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অধীনে কাজ করতো, কখনো তাঁর অবাধ্য হতোনা। সামান্য অবাধ্য হলে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নির্দেশ ছিল যেন তাদেরকে 'অগ্নির শাস্তি' দেয়া হয়।

১। তফসীরে কুরতবী খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা- ২৬৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৫৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৬৩

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عذاب السعير (অগ্নির শাস্তি) কথাটি দ্বারা দোযখের শাস্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকারের মতে, এটি হলো দোযখের শাস্তি। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে, এ জীবনেই তাদেরকে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়ার কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اذن এবং امر শব্দ দ্বারা যদি শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ উদ্দেশ্য করা হয়, তবে 'অগ্নির শাস্তি' কথাটি দ্বারা আখেরাতের শাস্তিই অর্থ করা হবে, কেননা শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনের পুরস্কার বা শাস্তি লাভের স্থান আখেরাতেই। পক্ষান্তরে, যদি আলোচ্য আয়াতে اذن এবং امر শব্দ দ্বারা 'ইচ্ছা' এবং 'আদেশে'র অনুগত হওয়ার অর্থ করা হয়, তবে عذاب السعير এর দ্বারা তাদের দুনিয়ার শাস্তি উদ্দেশ্য করা সমীচিন মনে করা হবে।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে من الجن এর মধ্যে من অব্যয়টি সাধারণতঃ কিছু সংখ্যক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে এ আয়াতে এর অর্থ হলো 'অধিকাংশ' তথা অধিকাংশ জ্বীনই ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত, আর তা ছিল আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে। এ ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বিশেষ মোজেযা।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ

জ্বীনেরা সোলায়মান (আঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতো, তিনি তাদের দ্বারা যা নির্মাণ করার ইচ্ছা করতেন, তাই তারা নির্মাণ করতো। বড় বড় প্রাসাদ, মূর্তি (হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর শরীয়তে এর অনুমতি ছিল), পুস্করিণীর ন্যায় বড় বড় পাত্র।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, সর্বপ্রথম বয়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন হযরত দাউদ (আঃ)। কিছু অংশ নির্মাণের পর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই ওহী অবতীর্ণ হলো ঃ

'তোমার হাতে এ ইমারত পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত আমি করিনি; বরং তোমার পুত্র যার নাম হবে সোলায়মান, তাকে আমি বাদশাহ বানাবো, তার হাতে এ প্রাসাদকে আমি পূর্ণ করবো'।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর যখন হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন, তখন তিনি বয়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ পূর্ণ করার ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি জ্বীন এবং শয়তানদের একত্রিত করে তাদেরকে একাধিক দলে বিভক্ত করলেন এবং প্রত্যেক দলের উপর কিছু কিছু দায়িত্ব অর্পণ করলেন। জ্বীন শয়তানদেরকে সাদা বর্ণের মর্মর পাথর আনয়নের আদেশ দিলেন, যখন তারা ঐ

পাথরগুলো একত্রিত করলো, তখন তাদেরকে একটি শহর নির্মাণের আদেশ দিলেন, তাদেরকে এরপর বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের জন্যে বারটি আবাস-স্থল নির্মাণের আদেশ দিলেন, যখন শহরের নির্মাণ কার্য শেষ হলো তখন মসজিদের নির্মাণ আরম্ভ হলো, জ্বীন শয়তানদেরকে তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হলো। এক দলকে খণি থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ইয়াকুত পাথর আনয়নের এবং সমুদ্র থেকে মুক্তা বের করে আনার দায়িত্ব দিলেন। আর অন্য দলকে হীরা-জহরতসহ অন্যান্য মূল্যবান পাথর খণি থেকে বের করে আনার আদেশ দিলেন। আর তৃতীয় দলকে কস্তুরী সহ অন্যান্য সুগন্ধি সংগ্রহের আদেশ দিলেন। যখন এসব মূল্যবান বস্তু একত্রিত হলো, যার পরিমাণ আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ অবগত নয়, তখন তিনি নির্মাণকারীদেরকে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। মসজিদ নির্মাণ করা হলো। সাদা এবং সবুজ বর্ণের মর্মর পাথর দ্বারা। আর খুঁটিও পাথর দ্বারাই করা হলো, ছাদে মূল্যবান হীরা জহরত ব্যবহার করা হলো। ইয়াকুত, মারওয়ারিদ এবং অন্যান্য পাথর ব্যবহার করা হলো আর জমিনে ফিরোজা পাথর ব্যবহৃত হলো। তদানীন্তন পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর কোন ইমারত ছিলনা। অন্ধকারে চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের সদৃশ ছিল ঐ ইমারতটি।

বয়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ শেষে হযরত সোলায়মান (আঃ) বনী ইসরাঈলের আলেমদের একত্রিত করে বললেন, এ ইমারত একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নির্মাণ করেছি। এতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের, তিনি ব্যতীত কেউ এর মালিক নন।

মসজিদের নির্মাণ কাজ যেদিন সমাপ্ত হলো সেদিনকে 'বিশেষ দিন' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) বয়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ শেষ হবার পর আল্লাহ পাকের দরবারে তিনটি জিনিসের জন্যে আরজী পেশ করেন, তিনি এর মধ্যে দু'টি তাঁকে দান করেছেন (১) হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজী পেশ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন শক্তি দান কর যার মাধ্যমে আমার সকল সিদ্ধান্ত তোমার সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়। অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত যেন নির্ভুল সিদ্ধান্ত হয়। আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেন। (২) তিনি আল্লাহ পাকের নিকট এমন ক্ষমতা চেয়েছেন, যা তাঁর পরে আর কাউকে না দেয়া হয়। এ দোয়াও কবুল হয়েছে। (৩) সোলায়মান (আঃ) এ দোয়াও করেছিলেন, যে ব্যক্তি বয়তুল মোকাদ্দাসের দু' রাকাত নামাজ আদায় করবে, তাকে যেন গুনাহ সমূহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করা হয়, যেন সে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর

ন্যায় নিঃষ্পাপ হয়ে যায়; আমি আশা করি যে আল্লাহ্ পাক তাঁর এ দোয়াও কবুল করেছেন।[১] (বগভী)

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ নিজের ঘরে মানুষ যখন নামাজ আদায় করে তখন তার এক ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব এক নামাজই হয়। আর মসজিদে কোবায় এক নামাজের পঁচিশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব হয় এবং জামে মসজিদে এক নামাজে পাঁচশ' ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব হয়। আর মসজিদে আকসার এক নামাজে এক হাজার ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব হয়, আর আমার মসজিদে পঞ্চাশ হাজার ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব হয়। আর কা'বা শরীফে এক নামাজে এক লক্ষ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব হয়। (এবনে মাজা)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করোনা (সেই তিন মসজিদ হলো (১) মসজিদে হারাম, (২) মসজিদে আকসা এবং (৩) আমার মসজিদ।

যাহোক, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেক জ্বীনেরা বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করতো, তদানীন্তন কালে মূর্তি তৈরী অবৈধ ছিলনা বলে জ্বীনেরা মূর্তিও তৈরী করতো। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়ত মোতাবেক মূর্তি নির্মাণ এবং প্রতিমা তৈরী করা অবৈধ তথা হারাম, শুধু তাই নয়; ছবি তোলাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, চিত্র অংকনকারী দোযখে যাবে, আর যে চিত্র সে তৈরী করেছে তাতে কেয়ামতের দিন প্রাণ সঞ্চার করা হবে, আর তা তাকে শাস্তি দেবে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যদি তোমার তাই করতে হয় অর্থাৎ ছবি যদি তৈরী করতেই হয় তবে প্রাণহীন বস্তুর ছবি তৈরী কর।

اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ

হে দাউদ পরিবার! তোমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কাজ করতে থাক, অর্থাৎ যদিও তোমরা আমার অনন্ত অসীম নেয়ামতের হক্ব আদায় করতে পারবেনা, কিন্তু তবুও আমরা প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের শোকর গুজারীতে সচেষ্ট থাক। আর এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাক।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৫৫-৫৭

মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযী বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজারী হলো তাকওয়া পরহেযগারী এবং নেক আমল। হযরত দাউদ (আঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ কথায় ও কাজে আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকতেন।

হযরত সাবেত বনানী (রঃ) বলেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর পরিবারবর্গকে নফল এবাদতের এমন কর্মসূচী দিয়েছিলেন যে, সর্বক্ষণ তাঁর পরিবারের কেউ না কেউ নামাজে রত থাকতেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর নামাজ, তিনি অর্ধরাত নিদ্রিত থাকতেন। এরপর রাতের এক তৃতীয়াংশ নামাজে অতিবাহিত করতেন। এরপর রাতের এক চতুর্থাংশ নিদ্রিত থাকতেন। এভাবে সবার রোজার মধ্যে হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোজাই আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় ছিল, তিনি একদিন পর একদিন রোজা রাখতেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মাতা তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, প্রিয় বৎস! অধিক পরিমাণে নিদ্রায় অতিবাহিত করোনা, রাতের অধিক পরিমাণ সময়ের নিদ্রা মানুষকে কেয়ামতের দিন ফকীর বানিয়ে দেয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে আরজ করেছিলেন ঃ ইয়ারব! কিভাবে তোমার শোকর আদায় করবো? কেননা তোমার তৌফিক ব্যতীত শোকর আদায় করা সম্ভব নয়। আর এ তওফিক একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। এভাবে শোকর আদায় করার ইচ্ছা করলেই তোমার নেয়ামতের ফিরিশতী সুদীর্ঘ হয়, আর শোকর গুজারীর ক্ষমতা লোপ পায়, তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ আমার শোকর গুজারীতে তোমার অক্ষমতার উপলব্ধিই আমার শোকর গুজারী।[১]

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

'আর আমার বন্দাদের মধ্যে অতি অল্প সংখক লোকই শোকর গুজার'।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্য শোকর গুজার হয় তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যদিও সর্বক্ষণ শোকর গুজারীতে মশগুল থাকলেও আল্লাহ পাকের শোকর গুজারীর হক্ব আদায় হবেনা, তাই এরশদ হয়েছে, যে ব্যক্তি এ সত্য উপলব্ধি করে যে, সে শোকর আদায়ে অক্ষম, সে-ই শোকর গুজার।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৪৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৬০

ইব্রাহীম তাইমী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-এর সম্মুখে দোয়া করে বললো, 'হে আল্লাহ! 'আমাকে কম লোকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর'। হযরত ওমর (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, 'এটা কেমন দোয়া'! ঐ ব্যক্তি জবাব দিল, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

'আর অতি অল্পসংখ্যক লোকই আমার শোকর গুজার'। তাই আমি এ দোয়া করেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিই ওমর (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক ইসলামী জ্ঞান রাখে'।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ........

'অবশেষে যখন আমি সোলায়মানকে মৃত্যুমুখে পতিত করি, তখন জ্বীনদেরকে তার মৃত্যু সম্বন্ধে শুধু মাটির পোকাই জানিয়ে দিল'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) বয়তুল মোকাদ্দাসের অভ্যন্তরে কখনো মাস, দু' মাসের জন্যে আর কখনও বছর কি দু' বছরের জন্যে এ'তেকাফ রত থাকতেন। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদ পূর্ণ করতেন, তাঁর খাদ্য ও পানীয় মসজিদের ভেতরেই পৌঁছে দেয়া হতো, যথারীতি একবার তিনি বয়তুল মোকাদ্দাসের ভেতরে ছিলেন, এরই মধ্যে সেখানে তাঁর মৃত্যু হলো। ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিল, প্রতি দিন ভোরে বয়তুল মোকাদ্দাসের মেহরাবে একটি উদ্ভিদের জন্ম হতো, তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন, সে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে তার নাম বলে দিত। তিনি তার নিকট তার বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সে তা-ও বলে দিত। তিনি ঐ চারাটিকে কেটে ফেলার হুকুম দিতেন এবং তাকে কোন বাগানে রোপণ করা হতো। যদি তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তবে তা-ও লিখিয়ে দিতেন। একদিন 'খারুবা' নামক একটি বৃক্ষের চারা জন্মায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে'? সে জবাব দিল, 'আমার নাম খারুবা'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ করেছ'? সে বললো, 'আপনার মসজিদকে ধ্বংস করার জন্যে'। হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, এটিতো হবার নয় যে আল্লাহ পাক আমার জীবদ্দশায় এ মসজিদকে ধ্বংস করবেন। তবে মনে হয় প্রথমে আমার মৃত্যু হবে, এরপর তোমার দ্বারা এ মসজিদকে ধ্বংস করা হবে। এরপর কোন ভাল বাগানে চারাটিকে রোপণ করা হলো।

তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুকে জ্বীনদের নিকট থেকে গোপন রেখ, যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে জ্বীনেরা গায়ব জানেনা, অথচ জ্বীনেরা বলে বেড়াত যে আমরা গায়বের খবর রাখি, আর আগামীকাল কি হবে, তা-ও আমরা জানি।

এরপর হযরত সোলায়মান (আঃ) মেহরাবে তথা এবাদতখানায় চলে গেলেন এবং লাঠির উপর ভর দিয়ে দন্ডায়মান হয়ে নামাজে রত হলেন। এ অবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। মেহরাবের মধ্যে তাঁর আগে এবং পেছনে বাতির ব্যবস্থা ছিল, যা দ্বারা জ্বীনেরা দেখতো যে তিনি দন্ডায়মান অবস্থায় নামাজে রত রয়েছেন। যেহেতু তাঁর স্বভাব ছিল যে তিনি সুদীর্ঘ সময় নামাজে মশগুল থাকতেন, কখনও বাইরে বের হতেন না, এজন্যে জ্বীনেরা আদৌ তার মৃত্যুর কল্পনা করেনি। এভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর এক বছর অতিক্রান্ত হলো। জ্বীনেরা যথানিয়মে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিল, অবশেষে মাটির পোকা লাঠিটিকে খেয়ে ফেলল এবং তাঁর শবদেহটি নীচে পড়ে গেল। এভাবে জ্বীনেরা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ইন্তেকালের খবর জানতে পারল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জ্বীনেরা মাটির পোকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো যে, তাদের কারণে জ্বীনেরা অত্যন্ত কঠিন শ্রম থেকে অব্যাহতি পেল, আর এজন্যেই এখনো জ্বীনেরা মাটির পোকার জন্যে কাষ্ঠখন্ডের ভেতর পানি এবং মাটি দিয়ে রাখে।

এবনে আবি হাতেম এবনে এজিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) মালাকুল মওতকে বলে রেখেছিলেন, 'যখন আমার ব্যাপারে কোন হুকুম হয় তখন আমাকে জানিয়ে দেবে'। তখন হযরত আজরাঈল (আঃ) তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, 'আমাকে আপনার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হয়েছে, আপনার জীবনের অত্যন্ত সামান্য সময়ই রয়ে গেছে'। তখন তিনি জ্বীনদেরকে ডাকলেন এবং আয়না দ্বারা একটি গৃহ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা একট গৃহ নির্মাণ করলো, যাতে কোন দরজা রাখা হয়নি। এরপর তিনি ঐ গৃহে দন্ডায়মান হয়ে নামাজ আদায় করতে লাগলেন।

এ অবস্থায় মালাকুল মওত তাঁর রুহ কবজ করে নিলেন এবং মৃত্যুর পরও তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর মাটির পোকা বা ঘুণে তাঁর লাঠিটি খেয়ে ফেলল এবং তিনি পড়ে গেলেন, এরপর লোকেরা ঐ আয়না বিশিষ্ট ঘরের দরজা তৈরী করে তাঁতে প্রবেশ করলো, তাঁর লাঠিটিকে একদিন একরাত মাটির পোকাকে খেতে দেয়া হলো, তখন হিসেব করে দেখা গেল যে, প্রায় এক বছর পূর্বে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছে।

مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ

'তখন জ্বীনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে শুধু মাটির পোকাই জানিয়ে দিল'।

অর্থাৎ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ইন্তেকালের খবর অন্য কোনভাবেই প্রকাশ পায়নি, শুধু মাটির পোকা যখন লাঠি খেয়ে ফেলেছে তখন তাঁর মৃত্যুর কথা জানা গেছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর মৃত্যুর সময় ঘণিয়ে এসেছে, তিনি লাঠি ভর দিয়ে বসে গেলেন। তখন তাঁর রূহ কবজ করা হয়। আর ঐ অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত হলো। তিনি ছিলেন উপবিষ্ট। এজন্যে জ্বীনেরা তাঁকে জীবিত মনে করেছে। তাঁর নিকট আসার সাহস তাদের হয়নি। ফলে তাদেরকে তিনি যে আদেশ দিয়েছিলেন তা পালনে তারা ব্যস্ত ছিল। যখন লাঠিটিকে ঘুণে খেয়ে ফেললো এবং লাঠিটি পড়ে গেল, ফলে তাঁর দেহ পড়ে গেল, তখন জ্বীনেরা উপলব্ধি করলো যে তারা গায়ব জানে না। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا

'যখন ঘুণে খাওয়ার কারণে লাঠিটি পড়ে গেল তখনই জ্বীনেরা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করলো যে, যদি তারা গায়বী খবর জানতো তবে এমন অপমানজনক কষ্টে পড়ে থাকতো না'।

বস্তুতঃ ইতোপূর্বে জ্বীনেরা গায়ব জানার দাবী করে মানুষকে প্রতারণা করতো। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনায় একথা প্রমাণিত হলো যে জ্বীনেরা গায়ব জানেনা। এভাবে তারা অপদস্ত হলো। গায়বী খবর জানে বলে তারা যে বড়াই করতো তার অসারতা প্রমাণিত হলো।

এতদ্ব্যতীত এতে আরেকটি কথাও প্রমাণিত হলো, হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর নিজের ক্ষমতাবলে জ্বীনদেরকে বশীভূত করে রাখেননি; বরং আল্লাহ্ পাকই দুর্ধর্ষ জ্বীন জাতিকে তাঁর অনুগত করে রেখেছিলেন। অবশ্য এটিই ছিল তাঁর মোজেযা। আর এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর পরও জ্বীনেরা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে এবং তাঁর পূর্বে প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক কাজ করতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর পয়গম্বরগণের অসম্পূর্ণ কাজ তাঁদের অবর্তমানেও সম্পূর্ণ করে দেন, এ ঘটনায় একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

১। তাফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৪৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১২২
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৬৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৬২

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ
كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ
غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم
بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ
قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১৫). নিশ্চয় সাবা জাতির জন্যে তাদের আবাস-ভূমিতে বড় বড় নিদর্শন সমূহ ছিল, ডান দিকে এবং বাম দিকে ছিল দু'টি বাগান, তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত রিয্‌ক খেতে থাক এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক। উত্তম নগরী এবং ক্ষমা-প্রিয় প্রতিপালক।

(১৬) কিন্তু তারা আদেশ অমান্য করলো, তাই তাদের প্রতি প্রবল প্রবাহ ছেড়ে দেই, তাদের দু'টি বাগানের পরিবর্তে এমন দু'টি বাগান তাদেরকে দান করি যাতে কিছু সংখ্যক তিক্ত ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু পরিমাণ কূল বৃক্ষ ছিল।

(১৭) তাদের নাফরমানী ও না-শোকরীর কারণেই তাদেরকে এ বদলা দেই।

(১৮) আমি তাদের এবং ঐ সমস্ত জনপদের মধ্যস্থলে বরকত রেখেছিলাম, আর এমন বস্তুও রেখেছিলাম, যা চোখে পড়ত এবং তন্মধ্যে যাতায়াতের মঞ্জিলও আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম, যাতে করে তোমরা রাত দিন তাতে নিরাপদে চলাফেরা করতে পার।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং শোকর গুজার বন্দাদের অবস্থা এবং শুভ-পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতার বর্ণনার পর একটি জাতির ভাগ্য-বিপর্যয়ের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

ইয়ামনের অর্ন্তগত সুখী সমৃদ্ধশালী 'সাবা' এলাকার অধিবাসীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতে। পূর্বে তারা অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল, কিন্তু আল্লাহ পাকের নাফরমানী ও অকৃতজ্ঞতার কারণে তারা হয়েছে অভিশপ্ত এবং ভাগ্য-বিড়ম্বিত। ইতোপূর্বে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সাবার রাণী বিলকিসের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

সাবা জাতির পরিণতি

সাবা জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান ছিল অজস্র, সুদীর্ঘ পথের দু'দিক দিয়ে বাগান ছিল সারি সারি, ফলমূলে সমৃদ্ধ এ বাগান সমূহ যেন মৌন ভাষায় সাবাবাসীকে বলতো, তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত ভোগ কর কিন্তু ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়োনা। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে অগণিত নেয়ামত দান করেছেন, ঠিক তেমনি তোমরাও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আত্ম নিয়োগ কর, তাঁর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট থাক, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ج جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ط

'নিশ্চয় সাবা জাতির জন্যে তাদের আবাস-ভূমিতে বড় বড় নিদর্শন সমূহ ছিল, ডান দিকে এবং বাম দিকে ছিল দু'টি বাগান, তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত রিয্ক খেতে থাক এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক'।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহর প্রেরিত রসূলগণ 'সাবা' জাতিকে উপদেশ দান করেছেন এবং সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করেছেন।

মূলতঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূর্বে যে সব নবী রসূলগণ এসেছিলেন, তাঁরাই সাবা জাতিকে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করেছিলেন।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ আয়াত সমূহের তফসীরে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা করে কাফেরদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যে লক্ষ্য কর, যারা আল্লাহ পাকের নেক বন্দা হয়, তারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় না; বরং তারা দুনিয়ার মালিক আল্লাহ পাকের প্রতিই মনোনিবেশ করে থাকে। আর তারা আল্লাহ পাকের অনুগত এবং শোকর গুজার হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের নেককার বন্দা নয়; বরং যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তাদের অবস্থা ও ভয়াবহ পরিণতিই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। সাবা জাতি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত ছিল অগণিত। সুদীর্ঘ পথের দু' ধারে মাইলের পরে মাইল বাগান ছিল আর

ফলে ফুলে তা ছিল পরিপূর্ণ। তাদের জীবনে বিরাজিত ছিল এক অনাবিল শান্তি, নিরাপত্তা, অখন্ড আনন্দ উল্লাস, কষ্ট বা অশান্তি ছিল তাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত।

كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُۥ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

'তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত রিয্‌ক খেতে থাক এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক। উত্তম নগরী এবং ক্ষমা-প্রিয় প্রতিপালক'।

অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের এ হুকুম ছিল যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত রিয্‌ক খেতে থাক এবং এর পাশাপাশি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক। দাতার দানে ধন্য হয়ে, তাঁর নেয়ামতে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং দাতাকে ভুলে যাওয়া কোন অবস্থাতেই সমীচিন নয়।

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ

অর্থাৎ উত্তম এবং পবিত্র নগরী এবং ক্ষমা-প্রিয় প্রতিপালক। তিনি তোমাদেরকে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছেন, অতএব, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং তাঁর শোকর গুজার হও।

আল্লাহ পাক সাবা জাতির হেদায়েতের জন্যে তাদের নিকট নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁরা সাবা জাতিকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের এবং তাঁর বন্দেগী করার নির্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু সাবা জাতি তৌহীদের প্রতি বিশ্বাসের এ আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়।

বর্ণিত আছে যে, এক সময় তারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, যখন তাদের অবাধ্যতা এবং অকৃতজ্ঞতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল, তখন তারা হলো কোপগ্রস্ত, শাস্তি নেমে এল তাদের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। তারা বিশ্ববাসীর জন্যে পৃথিবীর ইতিহাসে শিক্ষণীয় হয়ে রইল। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

'পরে তারা আদেশ অমান্য করলো, তাই তাদের প্রতি প্রবল প্রবাহ ছেড়ে দেই, তাদের দু'টি বাগানের পরিবর্তে এমন দু'টি বাগান তাদেরকে দান করি, যাতে কিছু সংখ্যক তিক্ত ফল মূল, ঝাউগাছ এবং কিছু পরিমাণ কূল বৃক্ষ ছিল'।

বস্তুতঃ সাবা জাতি আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত নিয়ে মেতে ছিল, নবী রসূলগণের উপদেশের প্রতি তারা কোন গুরুত্বই দেয়নি এমনকি, তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত ছিল, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকেও তারা জরুরী মনে করেনি। এমনি অবস্থায় তাদের উপর নেমে আসে গজবী বন্যা, আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত এ জাতি ধ্বংস হয়, তাদের নির্মিত বাঁধ ভেঙে যায়, প্রবল প্রবাহে সমস্ত

বাগ-বাগিচা ডুবে যায়। সুরভিত উদ্যান এবং উত্তম ফলমূলের স্থলে সেখানে তিক্ত, বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ আর কিছু কূল বৃক্ষ তাদের কপালে জোটে। এটি ছিল তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি।

বর্ণিত আছে যে, সাবা জাতি নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অস্বীকৃতি জানায়, তারা বলে, আমাদের বাগান এবং আমাদের সমৃদ্ধি আল্লাহ পাকের নেয়ামত বলে আমরা জানিনা, এসব তো আমাদের জমিনের উৎপন্ন বস্তু, আমরা যে বাগ-বাগিচা আবাদ করেছি এসব তারই ফল, এমনকি এ দূরাত্মা কাফেররা নাফরমানীর এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা নবী রসূলগণকে বলেছে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক আমাদের নেয়ামতকে বন্ধ করতে পারে তবে করুক (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)'।

বস্তুতঃ সাবা জাতির এ ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতাপূর্ণ নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই তাদের ধ্বংস নেমে আসে।

سَيْلَ الْعَرِمِ

অর্থাৎ অতিবৃষ্টি প্রসূত বন্যা কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি টকটকে লাল বর্ণের গজবী বন্যার পানি প্রেরণ করেছিলেন।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন عرم এর অর্থ হলো, পানিকে আটকে রাখার বাঁধ।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন عرم বলা হয় জংলী ইঁদুরকে। রাণী বিলকিস পানি সংরক্ষণের জন্য বিশাল আকারের এক বাঁধ নির্মাণ করেছিলো, জংলী ইঁদুর তাতে ছিদ্র করে দিয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ عرم ছিল একটি বাঁধ, যা রাণী বিলকিস তৈরী করেছিল। কেননা, সে যুগে পানি নিয়ে মানুষের মধ্যে লড়াই হতো। বিলকিস দেশের এ ফেৎনা-ফ্যাসাদ বন্ধের জন্যে দু' পাহাড়ের মধ্যে এ বাঁধটি নির্মাণ করেছিলেন। পানি বের হওয়ার জন্যে বারটি পথ তৈরী করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি পথ গিয়ে একটি নদীর মধ্যে শেষ হতো। প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন পথ খুলে দেয়া হতো। বৃষ্টির পানি বাঁধের কাছে একত্রিত হতো। এ বাঁধটি অনেক দিন ছিল। কিন্তু যখন দূরাত্মা কাফেররা আল্লাহ পাকের চরম নাফরমানী করলো, তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি গজব নাযিল করলেন এবং তারা সর্বহারায় পরিণত হলো।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ বলেছেন, সাবা জাতিকে কোন একজন গণক বলেছিল, একটি ইঁদুর এ বাঁধকে ধ্বংস করে দেবে। এজন্যে তারা দু' পাথরের

মধ্যখানে একটি করে বিড়াল বেধে রেখেছিল। কিন্তু যখন ধ্বংসের নির্দিষ্ট সময় ঘনিয়ে আসে আর আল্লাহ পাকও তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন লালবর্ণের একটি বড় ইঁদুর আসল এবং বিড়ালের উপর আক্রমণ করলো, ফলে বিড়াল মরে গেল, এ সুযোগে ইঁদুরটি বাঁধে প্রবেশ করলো। এভাবে ধীরে ধীরে পানি প্রবাহিত হতে থাকল, অবশেষে বাঁধ ভেঙে গেল এবং সমগ্র এলাকা প্লাবিত হলো। সাবা জাতির যথাসর্বস্ব ধ্বংস হয়ে গেল এবং তাদের এ ধ্বংস আরববাসীর প্রবাদ বাক্যে পরিণত হলো।[১]

وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ

'তাদের দু'টি বাগানের পরিবর্তে তাদেরকে এমন দু'টি বাগান দিয়ে দেই, যাতে কিছু সংখ্যক তিক্ত ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু পরিমাণ কূলবৃক্ষ ছিল'।

সাবা জাতির অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামীর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন দু'টি বাগান দিলেন, যাতে কিছু সংখ্যক তিক্ত ফল ছিল। আরবী ভাষায় সুবিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থে 'খামতুন' শব্দটির অর্থ হলো তিক্ত বস্তু।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যে কূল বা বরই সাধারণতঃ মানুষ খেয়ে থাকে, سدر শব্দ দ্বারা তা উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং যে কূল বনে-জঙ্গেলে পাওয়া যায়, যা মানুষের খাদ্যবস্তু নয়; তা-ই এখানে উদ্দেশ্য। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের দু'টি বাগানের পরিবর্তে তাদেরকে 'অন্য দু'টি বাগান দেয়া হয়েছে' কথাটিও বিদ্রুপাত্মক, কেননা যেখানে ফল থাকে তিক্ত, কূল হয় অখাদ্য, তাকে 'বাগান' বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বাগান হয় না। কিন্তু প্রকাশ্য আকৃতিতে বাগানের মত মনে হয়, তাই তাকেও বাগান বলা হয়েছে, যদিও তা তাদের প্রতি শাস্তি স্বরূপই এসেছে।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْاؕ

'তাদের না-শোকরী, নাফরমানী এবং নেমকহারামীর কারণেই তাদেরকে এ বদলা দেই'।

এমন দূরাত্মা নাফরমান, অবাধ্য এবং নেমকহারাম জাতির এমনি গুরুতর শাস্তিই প্রাপ্য।

এবনে জরীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাই লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসীর (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ থেকেও আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬৩-৬৫

হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের কয়েকটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যবহ।

فَاَعْرَضُوْا তার বিমুখ হলো, তারা লক্ষ্য করলো না।

فَاَرْسَلْنَا তাই তাদের প্রতি প্রেরণ করি প্রবল বন্যা।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ তাদেরকে নাফমানীর শাস্তি দেই।

এ কয়েকটি শব্দ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি, সমাজ কিংবা জাতি আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তারা তাঁর নেয়ামত লাভ করে।

কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব, নেয়ামত লাভের পন্থা হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ, আর অবাধ্যতা অকৃতজ্ঞতা নেমকহারামী হলো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ।[১]

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ط

'আমি তাদের এবং ঐ সমস্ত জনপদের মধ্যস্থলে বরকত রেখে দিয়েছিলাম, আর এমন সব বস্তুও রেখেছিলাম, যা চোখে পড়ত এবং তন্মধ্যে যাতায়াতের মঞ্জিলও আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম, যাতে করে তোমরা রাত দিন নিরাপদে চলাফেরা করতে পার'।

এ আয়াতে সাবাবাসীর প্রতি আল্লাহ পাকের অগণিত নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ আমি তাদের এবং ঐ সমস্ত জনপদের মধ্যস্থলে বরকত রেখেছিলাম। বরকত সমৃদ্ধ এ এলাকা ছিল সিরিয়ায়। পথের দু' পার্শ্বে অবস্থিত জনপদগুলোকে অতি সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছিল। পথিক মুসাফির অতি দূরের পথ ভ্রমণ করলেও ক্লান্তি বোধ করতো না; কেননা কিছু দূর পরেই ছিল বিশ্রামাগার, ফলে পথিক মুসাফির কিছু দূর অগ্রসর হয়েই বিশ্রাম নিতে পারতো, সে যুগেও আধুনিক কালের ন্যায় পাহানারের বস্তু সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করার প্রয়োজন হতোনা, কেননা প্রত্যেক বিশ্রামাগারেই পর্যাপ্ত পরিমাণ পানাহারের দ্রব্য-সামগ্রী মওজুদ থাকত। পথিক মুসাফিরগণ তাদের প্রয়োজনের আয়োজন করতে পারতো।

দ্বিতীয়তঃ পথ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ, চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীর উপদ্রব ছিলনা।

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৮৪২
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৬৩

سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ

তোমরা রাত দিন সেখানে নিরাপদে চলাফেরা করতে পার। যেখানে সর্বত্র বিশ্রামাগার, হোটেল-রেস্তোরাঁ থাকে এবং পথ হয় সম্পূর্ণ নিরাপদ, মানুষ নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে এবং মালপত্রের আমদানী রপ্তানী করতে পারে, সেখানে বরকত এবং সমৃদ্ধি লাভ করা অবশ্যই স্বাভাবিক।

সাবা জাতির জনপদ থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ৪৭০০টি গ্রাম আবাদ ছিল। তফসীরকারগণ লিখেছেন, সাবা জাতির নিকট শুধু যে কৃষিজাত দ্রব্যই ছিল তা নয়; বরং সে যুগে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিরাট সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এজন্যেই 'আরযুল কোরআন' নামক গ্রন্থে 'সাবা' জাতি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, সাবা জাতির ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, কেননা ইয়ামনের একদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূল, আর অন্যদিকে আফ্রিকা মহাদেশ, আফ্রিকার স্বর্ণ, মূল্যবান হিরা জহরত সুলভে পাওয়া যেত। অন্যদিকে উপমহাদেশ থেকে তারা অন্যান্য অনেক মূল্যবান দ্রব্য আমদানী করতো, আর এ সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী সিরিয়া এবং মিশরে নিয়ে হাযির করতো। পথের নিরাপত্তার কারণে তাদের এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজ হয়েছিল। আর এটিই ছিল তাদের প্রাচুর্যের কারণ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) একথাও লিখেছেন যে, তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, কোন স্ত্রীলোক যদি একটি শূণ্য ঝুড়ি মাথায় করে পায়ে হেটে যেত, তখন অল্পক্ষণের মধ্যে পার্শ্ববর্তী বৃক্ষ থেকে যে পাকা ফল পড়ত, তা দ্বারা তার ঝুড়ি পূর্ণ হয়ে যেত। এ অসংখ্য এবং অসাধারণ নেয়ামতের কারণে সাবা জাতির কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! সাবা জাতি এমনি নেয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ হলো আর শুধু অকৃতজ্ঞই নয়; বরং অবাধ্যও হলো, যখন তাদের অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা চরমে পৌঁছল, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের অপকর্মের শাস্তি নেমে আসল, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের অনাদর এবং নেমকহারামীই তাদের এ শোচনীয় পরিণতির কারণ হলো। পবিত্র কোরআন সাবা জাতির উল্লেখ করে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, ব্যক্তি–সমাজ ও জাতি যত উন্নতিই করুক না কেন তাকে যে কথাটি স্মরণ রাখতে হবে, তা হলো এ পৃথিবীতে যা কিছু পেয়েছি তা আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়েই পেয়েছি। অতএব, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর দানের জন্যে শোকর গুজার থাকাই কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হওয়ার পরিণতিই হলো ধ্বংস।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৬৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৬৬-৬৭

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِّدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَٰهُمْ
أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ لِّكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝١٩ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ
إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَٰنٍ
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَ
رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝٢١ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن
دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۝٢٢

তরজমা

(১৯) কিন্তু তারা বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রবাস যাত্রা সুদীর্ঘ করে দাও (আমাদের সফরের মঞ্জিলের ব্যবধান বাড়িয়ে দাও)। এভাবে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, পরিণামে আমি তাদেরকে রূপকথায় পরিণত করি এবং তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেই, নিশ্চয় এতে রয়েছে প্রত্যেক সবর অবলম্বনকারী শোকর গুজার ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন।

(২০) ইবলিস তাদের ক্ষেত্রে তার ধারণা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে, অতি অল্প সংখ্যক ঈমানদার লোক ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করেছে।

(২১) তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিলনা, কিন্তু আমি এ তথ্য প্রকাশ করে দিতে চাই যে কারা আখেরাতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে আর কারা এ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে আছে। আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক সব কিছুর তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

(২২) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাদেরকে ডাক, আসমান জমীনের তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, আসমান জমীনে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ সহায়কও নেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সাবা জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে সাবা জাতি কিভাবে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে এবং কিভাবে তারা ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়েছে।

আল্লাহ পাক সাবা জাতিকে ফলে-ফুলে ধন্য করেছিলেন, তাদের যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ ও নিরাপদ করেছিলেন, পথে তাদের বিশ্রাম এবং পানাহারের ব্যবস্থা সহ যাবতীয় আরাম-আয়েশের আয়োজন রেখেছিলেন। এক মঞ্জিল থেকে অন্য মঞ্জিল ছিল অতি নিকটে, এক স্থান থেকে ভ্রমণ করে অন্য স্থানে পৌঁছে বিশ্রাম করার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। কিন্তু তাদের এ স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা বেশি দিন তারা সইতে পারল না; এজন্যে তারা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলো যে, আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দূর করে সফরকে কষ্টকর করে দিন, দু' মঞ্জিলের দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে দিন। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রবাস যাত্রাকে সুদীর্ঘ করে দাও'।

অর্থাৎ সাবা জাতি একদিকে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কদর করেনি এবং নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেনি; বরং তারা এ আকাঙ্ক্ষা করেছে যে এ নেয়ামত মুসীবতের দ্বারা পরিবর্তন করা হোক।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, "আমাদের প্রবাস যাত্রা সুদীর্ঘ করে দাও" এর অর্থ হলো ইয়ামন এবং সিরিয়ার মধ্যকার এ মনোরম বাগানগুলো বিনষ্ট করে এ স্থানটিকে জঙ্গল এবং মরুভূমিতে পরিণত করে দাও, যাতে করে আমরা পাথেয় সঙ্গে নিয়ে উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করতে পারি এবং কঠিন ও কষ্টকর সফর করে আমরা ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারি এবং অন্যদের নিকট গর্ব প্রকাশ করতে পারি যে, ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত কঠিন সফর করে আমরা ফিরে এসেছি। এখন যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ হয়, তাতে আমরা গর্ববোধ করতে পারিনা। বাড়ী-ঘরে অবস্থান ও ভ্রমণের মধ্যে বর্তমানে কোন পার্থক্যই লক্ষ্য করিনা, এ কারণে এ অবস্থা আমাদের জন্যে সহনীয় নয়।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ যেভাবে অ্যাডভেঞ্চারে বের হয়, সাবা জাতিও তেমনি অ্যাডভেঞ্চারেরই প্রয়াসী হয়েছিল। তারা হয়তো প্রকাশ্যে মুখেই একথা বলেছিল, অথবা আচার-আচরণের মাধ্যমে মৌন ভাষায় এমন আজগুবী উক্তি করেছিলঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এমন নিরাপদ পথে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে

এমন সুসময়ে ভ্রমণে প্রকৃত সুখের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়না; দুঃখ না হলে সুখের মর্যাদা এবং মর্মকথা কোথায়? যে ভ্রমণে সূর্যের তাপে দগ্ধ হতে হয়না; ক্ষুধার জ্বালা সইতে হয়না; পিপাসায় কাতরও হতে হয় না, সে ভ্রমণে গৌরব কোথায়? পথ যদি হয় সুদীর্ঘ, ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্টও যদি থাকে, তাহলে একটা আনন্দ আছে আর তা হলো অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযানের আনন্দ। আমাদের সুখ একেবারেই একঘেয়ে হয়ে গেছে, তা আর ভাল লাগেনা, অতএব, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ একঘেয়ে সুখ আর চাইনা, আমাদের এ আরামদায়ক সফরের পরিবর্তে কষ্টদায়ক সফরের ব্যবস্থা করে দাও।

তফসীরকারগণ বলেছেন, সাবা জাতির অবস্থা হতভাগা বনী ইসরাঈল জাতির অনুরূপ, তাদের জন্যে আল্লাহ পাক আসমান থেকে 'মান্না সালওয়া' প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তারা কিছুদিন পরই 'মান্না সালওয়া'র পরিবর্তে পিয়াজ-রসূনের দাবী উত্থাপন করেছিল।

এভাবে বনী ইসরাঈল জাতি ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়েছিল।[১]

বস্তুতঃ হতভাগা বনী ইসরাঈল জাতির মত সাবা জাতিও নিজেদের আরামকে হারাম করলো এবং চরম বিপদগ্রস্ত হলো। এ যুগেও এমন ভাগ্যাহত জাতির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

মূলতঃ সব যুগের ভাগ্যাহত লোকদের একই ধাত, আর তারা একই জাত। যে দেশ বা পরিবেশেই তারা বাস করুক না কেন, অভিন্ন তাদের চরিত্র।

বলাবাহুল্য, আল্লাহ পাক সাবা জাতির এ দোয়া অনতিবিলম্বে কবুল করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সমৃদ্ধশালী জাতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। নিক্ষিপ্ত হলো ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। আল্লাহ পাকের নাফরমানী, না-শোকরী এবং নেমকহারামীর এটিই হয় পরিণতি। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَظَلَمُوٓا اَنْفُسَهُمْ

আর সাবা জাতি নিজেদের প্রতি নিজেরাই জুলুম করলো, কেননা তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হলো, আর তারা বিশ্ববাসীর জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রইল। পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

'আমি তাদেরকে রূপকথায় পরিণত করি এবং তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেই'।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১১

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, পরবর্তীতে সাবা জাতির এ ধ্বংস একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। যখন প্রলয়ংকারী বন্যার কারণে তাদের জনপদগুলো ডুবে গেল, বাগ-বাগিচা ধ্বংস হয়ে গেল, তখন সাবা জাতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'গাসসান' গোত্র সিরিয়ায়, 'ইজদ' গোত্র আম্মানে এবং খাজাআহ গোত্র তেহামায় এবং খোজায়মাহ গোত্র ইরাকে এবং আওস ও খাজরাজ গোত্র 'ইয়াসরেব' তথা মদীনা মোনাওয়্যারায় আশ্রয় নেয়। আওস ও খাজরাজের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমর এবনে আমের আনসারী মদীনা মোনাওয়্যারায় আসে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

'নিশ্চয় এতে রয়েছে প্রত্যেক সবর অবলম্বনকারী ও শোকর গুজার লোকের জন্যে নিদর্শন'।

صبار শব্দটির অর্থ হল, সে ব্যক্তি যে পাপাচার থেকে বিরত থাকে, বিপদাপদে সবর অবলম্বন করে এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় সংকল্প থাকে। আর شكور হল সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞ ব্যক্তি।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ দু'টি শব্দ দ্বারা এ উম্মতের মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা বিপদাপদে সবর অবলম্বন করে এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের অত্যন্ত বেশী শোকর গুজার। মোতরাফ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (রঃ) লিখেছেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে, পৃথিবী একটি পরীক্ষাগার, এ পৃথিবীর শান্তি ও নেয়ামতও একটি পরীক্ষা। নেয়ামত দ্বারা এ পরীক্ষা করা হয়, বন্দা কৃতজ্ঞ হয় নাকি অকৃতজ্ঞ। আর বিপদাপদও পরীক্ষা এ মর্মে যে বন্দা সবর অবলম্বন করে কি-না। ঠিক এমনিভাবে মোমেন বন্দার জন্য জীবন যেমন পরীক্ষা মৃত্যুও তেমনি পরীক্ষা। এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

'আল্লাহ পাক জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী'।

আর এ কারণেই মোমেন সর্বদা নিজেকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে এবং বিপদাপদে সবর অবলম্বন করে এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। মর্দে মোমেনের জন্যে তার প্রত্যেকটি বিপদ তার গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়। এজন্যে বিপদাপদের কারণে যেমন সবর অবলম্বন করতে হয়, তেমনি শোকরও আদায় করতে হয়, কেননা সবর অবলম্বনের তৌফিক আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত

ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর এ নেয়ামতের শোকর গুজারী অবশ্য কর্তব্য। হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, মাহবুবের তরফ থেকে প্রদত্ত বিপদ তার পুরস্কারের চেয়ে অধিক আনন্দদায়ক। তাই মুসিবতের জন্যেও তাঁর শোকর আদায় করা কর্তব্য।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ অর্ধেক ঈমান সবরে রয়েছে, আর অর্ধেক শোকরে। যে প্রকৃত মোমেন তার ঈমান হয় পরিপূর্ণ, ঈমানের উভয় অংশ তার মধ্যে থাকে।[১]

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

'ইবলিস তাদের ক্ষেত্রে তার ধারণা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে, অতি অল্পসংখ্যক ঈমানদার লোক ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করেছে'।

সৃষ্টির প্রথম দিন যখন আল্লাহ পাক ইবলিসকে হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্যে আদেশ দিয়েছিলেন, তখন ইবলিস এ আদেশ অমান্য করেছিল এবং সে অহংকার করেছিল, এজন্যে ইবলিস অভিশপ্ত হয়েছিল, তখন সে বলেছিল ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ

'হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি সমস্ত মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো'। ইবলিস আরো বলেছিল,

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ

'আর অধিকাংশ মানুষকে তুমি শোকর গুজার পাবেনা'। তখন এটি ছিল মানব জাতি সম্পর্কে ইবলিসের নিছক ধারণা।

সাবা জাতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে ইবলিসের ঐ ধারণাকেই সত্য প্রমাণিত করেছে। শুধু মোমেনদের এক বিশেষ দল ব্যতীত আর সকলেই ইবলিসের অনুসরণ করেছে, যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

'আর আমার বন্দাদের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ'।

এবনে কোতায়বা লিখেছেন, ইবলিস যখন আল্লাহ পাকের নিকট অবকাশের জন্যে আবেদন করেছিল, আল্লাহ পাক তাকে অবকাশ দান করেছিলেন, তখন সে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৬৮

বলেছে, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো'। কিন্তু একথা বলার সময় ইবলিসের পূর্ণ বিশ্বাস ছিলনা যে, মানব জাতিকে সে পথভ্রষ্ট করতে পারবে, শুধু তার ধারণা ছিল মাত্র। কিন্তু সাবা জাতি তার 'পরিপূর্ণ অনুসরণ' করে এমন পথভ্রষ্ট হয়েছিল যে ইবলিসের ঐ ধারণা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা প্রকৃত মোমেন তারা শয়তানের অনুসারী হয় না, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

'নিশ্চয় আমার (প্রকৃত) বন্দাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই'। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّؕ

'তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিলনা, কিন্তু আমি এ তথ্য প্রকাশ করে দিতে চাই যে, কারা আখেরাতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আর কারা এ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে আছে'।

অর্থাৎ ইবলিস মানুষকে প্রতারণা করেছে, ইবলিসের এমন কোন ক্ষমতা বা আধিপত্য ছিলনা যে সে মানুষকে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করতে পারে। মিথ্যা, ধোঁকা এবং প্রতারণাই তার হাতিয়ার। এজন্যে হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, ইবলিস মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে কোন প্রকার অস্ত্র ধারণ করেনি; কাউকে বেত্রাঘাতও করেনি; তবে মানুষের সাথে সে মিথ্যা অঙ্গীকার করেছে। আর সে মিথ্যা অঙ্গীকারের কারণেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। কেননা, ইবলিস শয়তান সর্বদা মন্দকাজের জন্যেই মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। আর এতে আল্লাহ পাকের একটি হেকমত রয়েছে। তা হলো মানুষকে পরীক্ষা করা, মানুষকে যাচাই করা। কে দুনিয়ার লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে শয়তানের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হয়ে আখেরাতকে ভুলে যায়, আর কে আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কারণে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হয় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে, এ পরীক্ষার জন্যেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বর্তমান ব্যবস্থা।

বস্তুতঃ ভাল-মন্দ উভয় দিকই মানুষের নিকট উম্মুক্ত। মানুষকে আল্লাহ পাক উভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণের স্বাধীনতা দান করেছেন। এর পাশাপাশি

আল্লাহ পাক মানুষকে দান করেছেন তার বিবেক-বুদ্ধি, মানুষ যদি তার বিবেক-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে, সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আর মানব জাতির প্রতি তাঁর প্রদত্ত বিধানের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে, তবে মানুষ পথভ্রষ্ট হতে পারেনা। শয়তান মানুষকে যত প্ররোচনাই দিক না কেন, মানুষ তার সকল প্ররোচনা এবং প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। যদি ভুল হয়ে যায় আর হতেও পারে তবে তার জন্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, যদি কোন বন্দা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাঁর মহান দরবারে খাঁটি অন্তরে তওবা করে, তবে তিনি তার তওবা কবুল করবেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'(হে রসূল!) আমার এ ঘোষণা সম্পর্কে মানুষকে আপনি অবহিত করুন, 'হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

অতএব, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই সত্য-অসত্যের সংঘাত চলছে, আল্লাহর নবী রসূলগণ মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান করেছেন, আর ইবলিস শয়তান অসত্যের দিকে হাতছানি দিচ্ছে। যেভাবে যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সময় চালক ব্রেক কষে তার গতিরোধ করে এবং দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষা করে, ঠিক তেমনি ইবলিস শয়তান যখন মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে, মন্দ কাজে আকৃষ্ট করে তাকে দুর্ঘটনায় পতিত করতে চায়, তখন মানুষের বিবেক বুদ্ধি তার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, মন্দ পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাহায্যকারী হয় তার ঈমান। কিন্তু এরপরও যদি কারো ব্যাপারে শয়তানের প্ররোচনা কার্যকর হয়, সে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তবে তার কর্তব্য হলো সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

'যে গুনাহ থেকে সঠিক তওবা করে সে এমন নিঃষ্পাপ হয় যেন তার গুনাহই নেই'।

وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ

'আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক সব কিছুর তত্ত্বাবধান করে থাকেন'।

অর্থাৎ সব বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণ অবগত। কে শয়তানের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হচ্ছে আর কে ঈমানী এবং নূরানী জীবন যাপন করছে, সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। যে যেমন আমল করবে, সে তেমনই পরিণতি লাভ করবে।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সাবা জাতির অবাধ্যতা এবং শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতে মুশরেকদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বলে তৌহীদের যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে এবং মুশরেকদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বিপদমুহূর্তে এক আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করছো, তারা তোমাদের কোন কাজেই আসবেনা। এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ..............

(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদেরকে ডাক, আসমান জমীনে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়; আসমান জমীনে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ সহায়কও নেই। অতএব, এরা কখনও তোমাদের কোন উপকারে আসতে পারবেনা কেননা, তাদের নিকট সামান্যতম ক্ষমতাও নেই। তাই তারা তোমাদের কোন প্রকার উপকারে আসবেনা, কোন প্রকার ক্ষতি থেকেও তারা তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা। কেননা আসমান জমীনের কোন কিছুর উপর তাদের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই। তারা কারো সহায়কও হতে পারেনা; তারা নিজেরাই অসহায়, অতএব তারা কারো উপাস্য হতে পারে না। এমন অবস্থায় তাদেরকে 'উপাস্য' মনে করে ডাকা এবং তাদের নিকট কোন প্রকার আশা পোষণ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মূলতঃ এ আয়াতে কাফের মুশরেক বেদ্বীনদেরকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে তোমরা যেসব হীন বস্তুকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক মনে কর, তাদেরকে ডাক দিয়ে দেখ তারা জবাব দেয় কি-না, তোমাদের কোন উপকারে আসে কি-না, তাদেরকে ডাকলে তোমরা উপলব্ধি করবে যে, তারা সম্পূর্ণ অসহায়, আসমান জমীনে কোথাও তাদের সামান্যতম ক্ষমতাও নেই, অতএব কোন্ যুক্তিতে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক কর? যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর কোন শরীক নেই, যাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, যাঁর কোন উজীর নেই, যাঁর কোন পরামর্শদাতা নেই, যিনি কোন সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী নন।

অতএব, পরিমাণদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা।

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ
عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ
وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُل لَّا تُسْأَلُونَ
عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ
بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم
بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২৩) আর আল্লাহ পাক যার জন্যে অনুমতি দান করেছেন, সে ব্যতীত আর কারো সুপারিশ তাঁর মহান দরবারে ফলপ্রসূ হবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়ের অবসান ঘটবে তখন তারা বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তার জবাবে তারা বলবে, 'যা সত্য তাই তিনি বলেছেন'। তিনি সবার উপরে, তিনি মহান।

(২৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আসমান জমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিয্ক প্রদান করে? (হে রসূল!) বলুন, আল্লাহ! নিশ্চয় হয় আমরা অথবা তোমরা সুপথে বা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।

(২৫) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমাদের গুনাহর জন্যে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, আর তোমাদের পাপাচারের জন্যে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না।

(২৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকেই সমবেত করবেন, এরপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, তিনি সব কিছু জানেন।

(২৭) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা তাঁর শরীক রূপে তাঁর সঙ্গে যাদেরকে জড়াও, আমায় তাদেরকে দেখাও, কেউ নেই, বস্তুত তিনিই আল্লাহ পাক, পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ط

'আর আল্লাহ্ পাক যার জন্যে অনুমতি দান করেছেন সে ব্যতীত আর কারো সুপারিশ তাঁর মহান দরবারে ফলপ্রসূ হবেনা'।

কাফের মুশরেকরা এ ভুল ধারণা করতো যে, তাদের মূর্তিগুলো কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। তারা বলতো,

هٰٓؤُلَاۤءِ شُفَعَاۤؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ

(একথা সত্য যে, এ মূর্তিগুলো আমাদের কথা শুনতে পারেনা) তবে এরাই হবে আমাদের পক্ষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশকারী।

কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন-কল্পে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে যাকে সুপারিশ করার জন্যে তিনি অনুমতি দান করবেন, শুধু সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। মূর্তি প্রাণহীন বস্তু। এসবের সুপারিশ করার তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা, যারা সুপারিশ করতে পারে, তারাও আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে সক্ষম হবেনা। নবী রসূলগণকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে, এমনিভাবে আউলিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাগণকেও সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে, কিন্তু সে অনুমতি হবে মোমেনদের পক্ষে, কাফেরদের পক্ষে সুপারিশের অনুমতি কাউকে দেয়া হবেনা।[১]

حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقَّ ط

'অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়ের অবসান ঘটবে তখন তারা বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন'? তার জবাবে তারা বলবে, 'যা সত্য তাই তিনি বলেছেন'।

আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারের মাহাত্ম

এ আয়াতে আল্লাহ পাকের মহান দরবারের মাহাত্ম কিঞ্চিৎ পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতাগণও সর্বদা আল্লাহ্ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। তাঁর দরবারের শান এত উচ্চে যে, ফেরেশতারা থাকেন সর্বক্ষণ ভীত এবং কম্পমান। যখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে কোন ওহী বা নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন ফেরেশতারা এর আভাস পাওয়া মাত্র ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সেজদায় রত হন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৭১

যখন ওহী নাযিল হওয়া শেষ হয়, ফেরেশতাগণ প্রকৃতস্থ হন, তখনকার অবস্থা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ.......

যখন ফেরেশতাদের মনের ভয় লাঘব হয় তথা যখন তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন, তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন', তখন ঊর্ধ্ব মহলের ফেরেশতারা জবাব দেন, 'যা সত্য তাই তিনি বলেছেন'।

এ পর্যায়ে আল্লামা সয়ুতি (রঃ), আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবং আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) অনেক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন ফেরেশতাগণ বিনীত অবস্থায় সেজদারত হন, আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যখন ওহী নাযিল হয়, তখন পাথরের উপর লোহার আঘাত হলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি গুরু গম্ভীর শব্দ হয় ওহী নাযিল হবার সময়। তখন দরবারে এলাহীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কারণে ফেরেশতাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সেজদারত হন, যখন ভয়ের ঐ অবস্থার অবসান ঘটে, তখন নিম্নমহলের ফেরেশতাগণ ঊর্ধ্ব মহলের ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন', তখন ঊর্ধ্বমহলের ফেরেশতাগণ বলেন, 'যা সত্য তাই তিনি বলেছেন'।

এবনে জরীর, এবনে খোজায়মা, এবনে আবি হাতেম, তেবরানী, আবুশ শেখ এবং বায়হাকী হযরত নওয়াস এবনে সামআন (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা করেন তখন তিনি ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন, যা শ্রবণ করে আল্লাহ পাকের ভয়ে আসমান প্রকম্পিত হয়, আর আসমানে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ ঐ পবিত্র কালাম শ্রবণ করে আল্লাহ পাকের ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং সেজদারত হন। সর্বপ্রথম জিব্রাঈল (আঃ) সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করেন। আল্লাহ পাক যা মর্জি তাঁর নির্দেশ জিব্রাঈল (আঃ)-কে প্রদান করেন। এরপর জিব্রাঈল (আঃ) যখন ফেরেশতাদের মাঝে আসেন তখন ফেরেশতাগণও জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন', জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, 'যা সত্য, যা সঠিক এবং যা প্রয়োজনীয় আমাদের প্রতিপালক তাই বলেছেন'।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা- ৪৭২-৭৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৫৬

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

'তিনি সবার উপরে, তিনি মহান'।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতে কেয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন ফেরেশতাগণও এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন যে, দরবারে এলাহীতে সুপারিশ করার কোন অবস্থাই থাকবেনা, যখন তাদের ভয়-ভীতি কিছুটা লাঘব হবে তখন তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমাদের প্রতিপারক কী বলেছেন'।

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ 'সূরা নাবা'র একখানি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

'সেদিন রুহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, দয়াময় আল্লাহ পাক যাকে অনুমতি দান করবেন সে ব্যতীত অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে যথার্থ কথা বলবে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকার মোকাতেল (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এরপর ছয়শত বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন নবীর আগমন হয়নি। এ সুদীর্ঘ সময় শেষে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়। এ সময় ফেরেশতাগণ ওহীর আওয়াজ শ্রবণ করেননি, কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সর্ব প্রথম ওহী নাযিল হয় তখন ফেরেশতাগণ মনে করেছেন যে, কেয়ামতের সময় এসে গেছে, কেননা আসমানবাসীর জানা ছিল, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব কেয়ামতের আলামত, তাই অনেক দিন পর সর্বপ্রথম ওহীর শব্দ শ্রবণ করে কেয়ামত সংঘটনের ভয়ে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ওহী শ্রবণের পর যখন জিব্রাঈল (আঃ) উর্দ্ধ লোক থেকে নীচের দিকে অবতরণ করেন, তখন যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেই ফেরেশতাই জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন,' তখন তিনি বলেন, 'যা সত্য আমাদের প্রতিপালক তাই বলেছেন'।

এ হল আল্লাহ পাকের মহান দরবারের শান, আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে কেউ সুপারিশ করতে পারেনা, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

১। তফসীরে মাআয়ফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৭১

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

'কে আছে যে আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করতে পারে? তবে তাঁর অনুমতিক্রমে'।

আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

'আল্লাহ পাকের দরবারে শুধু তারাই সুপারিশ করতে পারে যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য'।

যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব, যিনি আল্লাহ পাকের সর্বোত্তম সৃষ্টি, যিনি আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য, যিনি সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয়, যিনি সর্বাধিক মর্তবার অধিকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তিনি যখন কেয়ামতের দিন শাফাআতের জন্যে মাকামে মাহমুদে তশরীফ আনবেন তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, "আমি আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদায় পতিত হবো, আল্লাহ পাকই জানেন আমি কতক্ষণ সেজদায় পড়ে থাকবো, আর সেজদারত অবস্থায় আমি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতে থাকবো, এখন প্রশংসার সে ভাষাও আমার জানা নেই, তখনই আল্লাহ পাক তা আমাকে শিখিয়ে দেবেন, এরপর আমাকে বলা হবে, 'হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার মস্তক উত্তোলন করুন, আপনি আরজী পেশ করুন, আপনাকে দান করা হবে, আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে'।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, এ আয়াতের ঘোষণা শুধু আখেরাতের ব্যাপারেই সীমিত নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনা করা। আল্লাহ পাক যখন ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য কোন আদেশ জারি করেন, তখন তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কম্পমান থাকেন। যখন নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতাদেরই এ অবস্থা তখন মুশরেকদের এ ধারণা যে তাদের মূর্তিরা তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, নিছক ভিত্তিহীন এবং অসত্য।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং মসরুক (রঃ) আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। এবনে জরীর, এবনে কাসীর (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৫৫

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এ ব্যাখ্যাই পছন্দ করেছেন।[১]

অবশ্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) প্রমুখ মণীষীগণ বলেছেন, এ আয়াতের ঘোষণা আখেরাত সম্পর্কেই করা হয়েছে, কেয়ামতের দিন এমনি অবস্থাই হবে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যখন ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার কী বলেছেন, তার জবাবে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। এ সংক্ষিপ্ত জবাবই দেয়া হয় বিস্তারিত বলা হয় না, কেননা এর উদ্দেশ্য হল ফেরেশতাদের ভয়-ভীতি লাঘব করা যে তোমরা ভীত হয়োনা, এ কারণে বিস্তারিত জবাবের স্থলে সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে।

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আসমান জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযক প্রদান করে? (হে রসূল!), বলুন, আল্লাহ'।

এ আয়াতে একথা প্রমাণ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ পাকই সমগ্র বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একমাত্র রিযকদাতা, তিনি আসমান জমিন থেকে প্রাণী মাত্রকে রিযক পৌঁছিয়ে থাকেন, অতএব তিনিই একমাত্র মা'বুদ, তাঁরই বন্দেগী করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

তবে একথাটিকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বলা হয়েছে, যাতে করে কাফের মুশরেকদের পক্ষে সত্য অনুধাবন করা সহজ হয় এবং সত্য গ্রহণের পথ সুগম হয়, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ.........

(হে রসূল!) আপনি কাফের মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমাদেরকে আসমান জমিন থেকে কে রিযক দিয়ে থাকে? আসমান থেকে বারি বর্ষণের মাধ্যমে এবং জমিন থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে প্রতিটি প্রাণীকে কে রিযক সরবরাহ করে থাকে? এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ (হে রসূল!) যদি তারা জবাব প্রদানে অপরাগ হয় তবে আপনিই বলুন, 'আল্লাহ' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ পাকই সমগ্র সৃষ্টি জগতকে রিযক দিয়ে থাকেন, তিনি ব্যতীত আর কেউ রিযক দাতা নেই, অতএব তিনি ব্যতীত আর কেউ এবাদতের যোগ্যও নয়। আর একথা তোমরা নিজেরাও স্বীকার কর যে একমাত্র আল্লাহ পাকই রিযক দাতা, তিনি তাঁর কৃপা গুণেই সকলকে রিযক দিয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় তোমরা কোন্ যুক্তিতে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নিকট মাথা নত কর। আল্লাহ পাক ব্যতীত কারোই কোন শক্তি নেই, তিনি ব্যতীত সকলেই ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ পাক ব্যতীত সবই সৃষ্টি আর সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে, কিন্তু আল্লাহ পাক স্রষ্টা, তিনি পালনকর্তা, তিনি রিযকদাতা, তাঁর লয় নেই, তিনি চির

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৭২
ফতহুল বারী খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৩৮১

বিরাজমান, অতএব তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যায়না, শুধু তাঁর নিকটই মাথা নত করতে হয়, শুধু তাঁরই বন্দেগী করতে হয়, আর এটিই তৌহিদ।

وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

'নিশ্চয় হয় আমরা অথবা তোমরা হেদায়েতের উপর, অথবা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত'।

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করি, তাঁকে একমাত্র স্রষ্টা ও রিয্কদাতা মানি, কিন্তু তোমরা তা মাননা। এখন হয় আমরা সত্য পথে রয়েছি না হয় তোমরা, উভয়ে কখনও সত্য পথের পথিক হতে পারিনা। অতএব যা সঠিক এবং সত্য তাই গ্রহণীয়। আমরা যা বলি তার পক্ষে যুক্তি আছে, আর তোমরাও একথা স্বীকার কর যে, রিয্ক একমাত্র আল্লাহ পাকেরই দান। এমন অবস্থায় একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তোমরা ভুল পথে রয়েছ। আর আমরা সঠিক পথে রয়েছি, যারা মুশরেক তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ভুল এবং ভাল এক হতে পারেনা, হক্ব ও বাতিল এক হতে পারেনা, উভয়টি পরস্পর বিরোধী, বিপরীতমুখী। অতএব যা ভুল তা পরিত্যাজ্য, আর যা ভাল বা সত্য তা গ্রহণযোগ্য। বুদ্ধিমান মাত্রই হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করবে, হক্ব বা সত্যকে গ্রহণ করবে এবং বাতিলকে বর্জন করবে। অতএব, শেরকের বাতিল হওয়া এবং মুশরেকের অপরাধী হওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

قُلْ لَّا تُسْئَلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমাদের গুনাহর জন্য তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা, আর তোমাদের পাপাচারের জন্যে আমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, প্রত্যেকটি মানুষকে তার নিজের কর্মকান্ডের জন্যে দায়ী হতে হবে, প্রত্যেককে তার আমলের জন্য জবাবদেহী করতে হবে। যদি আমরা কোন অপরাধ করে থাকি তবে তার জন্য তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা। এমনিভাবে তোমাদের অপরাধের জন্যে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা। অতএব, প্রত্যেককে আখেরাতের জন্যে নিজ নিজ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান অবস্থায় তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা আমরা হেদায়েতের উপর রয়েছি, আর তোমরা গোমরাহীর উপর। কেয়ামতের দিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে তোমাদেরকেই জবাবদেহী করতে হবে। আর আমাদের আমলের জন্যে আমাদেরকে জবাবদেহী করতে হবে।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকেই সমবেত করবেন, এরপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, তিনি সবকিছু জানেন'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, কেয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ও তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এরপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে ফয়সালা করবেন। যারা এ জীবনে সত্যের অনুসারী হবে, এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হবে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করবেন। পক্ষান্তরে, যারা বাতিলপন্থী হবে তথা যারা ঈমানের স্থলে কুফরকে গ্রহণ করবে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, আর দোযখই হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। আর আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, তিনি মহাজ্ঞানী, দুনিয়ার জীবনে কে কি করেছে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّاؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা তাঁর শরীক রূপে তাঁর সঙ্গে যাদেরকে জড়াও, আমায় তাদেরকে দেখাও, কেউ নেই বস্তুত তিনিই আল্লাহ পাক, পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী'।

এ আয়াতে শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করে এরশাদ কয়েছে, (হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক রয়েছে বলে দাবী কর সেই তথাকথিত শরীকদেরকে আমার সম্মুখে হাযির কর, আমি তাদের ক্ষমতার দৌড় দেখে নেই, তোমরা কোন্ গুণে তাদেরকে আল্লাহর শরীক কর, তারা কি কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে? তারা কি কারো কোন উপকার বা অপকার করতে পারে? তারা কি কাউকে রিয্‌ক দিতে পারে? যখন এসব গুণাবলীর মধ্যে কোন গুণই তাদের মধ্যে নেই, তবে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়, তোমাদের হাতে গড়া প্রতিমা তোমরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারবে না কেননা, এগুলো সম্পূর্ণ অসহায়, তারা নিজেরাই নিজেদের কোন উপকার করতে পারেনা, তারা তোমাদের কি উপকার করবে?

كَلَّا

অবশ্যই নয় অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আল্লাহর কোন শরীক নেই; বরং

بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আল্লাহ পাকই এবাদতের যোগ্য, আর কেউ নয়, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর জ্ঞানের শেষ নেই, তাঁর ক্ষমতার অন্ত নেই, তাঁর অস্তিত্ব লাভে কারো কোন অনুগ্রহ নেই, সেই মহান সর্বশক্তিমান সর্বগুণে গুণান্বিত আল্লাহ পাকের শরীক হওয়ার সাধ্য কারোই নেই, তাঁর সাথে শেরক করার মত জঘন্য অপরাধ আর কিছুই নেই। অতএব সর্ব শক্তিমান লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ কর।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا
تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَلَوْ
تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ
اِۨلْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ
لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ
صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

তরফমা

(২৮) (হে রসূল!) আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।

(২৯) আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, ঐ ঘোষণা কবে বাস্তবায়িত হবে'?

(৩০) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তোমাদের জন্যে রয়েছে এক নির্ধারিত দিনের ওয়াদা যা তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না, ত্বরান্বিতও করাতে পারবে না।

(৩১) আর কাফেররা বলে, 'আমরা এই কোরআনকে কখনও মানবো না এবং তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকেও নয়'। (হে রসূল!) যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন

এ জালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের দরবারে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হতাম'।

(৩২) যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে ক্ষমতাদর্পীরা বলবে, 'সত্য বিষয় তোমাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পরও কি তোমাদেরকে আমরা তা থেকে বিরত রেখেছিলাম? কিছুই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে তোমরাই ছিলে অপরাধী'।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা তৌহীদের কথা আলোচিত হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আর একথা সর্বজন-বিদিত যে, তৌহিদের সঙ্গে রেসালতের সম্পর্ক হলো অবিচ্ছেদ্য। তাই দেখা যায় কলেমায়ে তৈয়্যেবার প্রথম অংশে তৌহীদ এবং দ্বিতীয় অংশে রেসালতের ঘোষণা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তৌহীদের পর রেসালতের উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে মানেনা, তারা প্রকৃত মোমেন হতে পারেনা,[১] যেমন কাদিয়ানী ফেরকা।

যাহোক, এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

'(হে রসূল!) আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য

আলোচ্য আয়াতের এ ঘোষণায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, অন্যান্য নবী রসূলগণ তাঁদের জাতি এবং তাঁদের যুগের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন বিশেষ জাতি বা যুগের জন্যে প্রেরিত হননি; বরং তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে তা প্রাচ্যে হোক কিংবা প্রতীচ্যে, আরবে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ট-২৫৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৭

হোক বা আজমে, সাদা হোক বা কালো সকলের হেদায়েতের জন্যেই আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে। এরপর পৃথিবীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। পৃথিবীর কোন মানুষ যে যেখানেই বসবাস করুক না কেন, যদি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর হেদায়েত গ্রহণ না করে, তবে সে সত্যের সন্ধান পাবেনা। এজন্যে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি'।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

'বরকতময় সেই আল্লাহ পাক, যিনি তাঁর বন্দার প্রতি কোরআনে করীম নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেন'।

বস্তুতঃ এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লামের দু'টি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে (১) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শিক্ষা এবং আদর্শ সমগ্র মানব জাতির জেন্যে। (২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবেনা। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে সকলের জন্যে, তাই তিনি বিশ্ব নবী। সমগ্র মানব জাতিকে তিনি হেদায়েত করবেন, যারা তাঁর হেদায়েত মেনে চলবে তাদেরকে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা তাঁর অবাধ্য হবে এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণে অপ্রস্তুত হবে, তাদেরকে দোযখের শাস্তি সম্পর্কে তিনি সাবধান করে দেবেন।

আলোচ্য আয়াতের كافة শব্দটির অর্থ হল সাধারণ। অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীর কোন মানুষই তাঁর রেসালতের আওতার বাইরে নয়।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি।

(১) এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত স্থানে আমার প্রভাব এবং ভয় মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২) সারা পৃথিবীকে আমার জন্যে মসজিদ তথা নামাজের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ সারা পৃথিবীর যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে আমার উম্মত নামাজ পড়তে পারবে এবং প্রয়োজন হলে যে কোন স্থানের মাটি দ্বারা আমার উম্মত তায়াম্মুম করতে পারবে। (৩) আমার জন্যে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ তথা মালে গনিমত হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন নবীর জন্যে তা হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে সবচেয়ে বড় শাফাআতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন কোন নবী আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ করার সাহস করবেন না, তখন সমগ্র মানব জাতির পক্ষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ করার অনুমতি আমাকেই দেয়া হবে। (৫) প্রত্যেক নবীকে শুধু তাঁর জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে।[১]

এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হতে পারে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ (হে রসূল!) আমি আপনাকে কাফেরদেরকে দুনিয়াতে কুফর ও নাফরমানী থেকে বারণকারী রূপে পাঠিয়েছি, আর আখেরাতে দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষাকারী রূপে পাঠিয়েছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার দৃষ্টান্ত হল সে ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে, যখন চতুর্দিকে আলো প্রসারিত হয়েছে তখন পোকা-মাকড় ঐ অগ্নিতে পতিত হতে লাগলো। ঐ ব্যক্তি সর্বাত্মক চেষ্টা করলো প্রাণীগুলোকে অগ্নি থেকে রক্ষা করতে, কিন্তু তারা ঐ ব্যক্তির শত বাধা সত্ত্বেও অগ্নিতে পতিত হল। ঠিক তেমনি আমিও তোমাদের কোমরে ধরে তোমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তোমরা অগ্নিতে পতিত হচ্ছো।[২] -(বোখারী শরীফ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

ইমাম তবরী (রঃ) এ আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা করেছেন, যা তাৎপর্যবহ। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ (হে রসূল!) যদিও মক্কার কাফেররা আপনার সম্প্রদায়ভুক্ত অথচ আপনার প্রতি ঈমান আনেনা, এজন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না। আমিতো আপনাকে শুধু মক্কার কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করিনি; বরং আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে। আরব আজম সাদা কালো এক কথায় সমগ্র বিশ্ব মানবই আপনার উম্মত। অতএব, কতিপয়

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৭৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৫৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৭৭

কাফের মুশরেক আপনার প্রতি ঈমান না আনলে এতে কিছু যায় আসেনা এবং এতে দুঃখিত হবারও কিছু নেই।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

'কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা'।

অর্থাৎ আপনার এ উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কাফেররা অবগত নয়, এজন্যেই তারা বিরোধিতা করে এবং আপনার সাথে শত্রুতা করে।[১]

মূলতঃ তারা চতুঃষ্পদ জন্তুর মত মূর্খ, নির্বোধ, তারা সওরাব ও আযাব বলতে কিছুই বোঝেনা। তাদের মূর্খতার অবস্থা এই, যখন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সওয়াব আযাব এবং কেয়ামতের কথা শ্রবণ করে তখন তারা বিদ্রুপ করে বলে ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

'আর তারা বলে সেই আযাব করে আসবে'? আযাবের এ ঘোষণা কবে ঘটনায় পরিণত হবে? কাফের মুশরেকদের ধৃষ্টতা কত বিস্ময়কর! তারা একদিকে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত, অন্যদিকে তাঁর শাস্তি ভোগ করার জন্যে ব্যাকুল, মানুষ কোন মহা মূল্যবান সম্পদ লাভে যেমন বিলম্ব সইতে পারেনা, ঠিক তিমনি শাস্তি ভোগের ব্যাপারেও তারা এতটুকু বিলম্ব সইতে পারছেনা। তাই তাদের জিজ্ঞাসা হলো আমাদেরকে যে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, তা কবে আসবে?

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ

(হে রসূল!) তাদের কথার উত্তরে আপনি বলুন, তোমাদের এত তাড়াহুড়া কেন? সেদিন তো অবশ্যই আসবে, আর তা ঠিক সময়ই আসবে, এক মুহূর্ত আগেও নয়, পরেও নয়, মূলতঃ কেয়ামতের দিন-ক্ষণ সবই নির্ধারিত, আল্লাহ পাক সেই নির্ধারিত সময়টি জানেন, তবে মানুষ থেকে তা গোপন রেখেছেন। সেই নির্ধারিত দিন সঠিক সময়েই আসবে। এক মুহূর্তে আগেও আসবেনা, আর তাতে এক মুহূর্ত বিলম্বও হবেনা।

আলোচ্য আয়াতে যেদিনের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ এ হলো কেয়ামতের দিন।

যাহ্যাক (রঃ) সহ কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ দিন হলো মৃত্যুর দিন। কেননা, আল্লাহ পাক মানুষের মৃত্যুর দিন এবং কেয়ামতের দিন বিশেষ হেকমতের কারণে গোপন রেখেছেন।

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬৬

আর কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করা এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ দেয়ার ব্যাপারকে ভুলে যাওয়াই হলো কুফর ও নাফরমানীর মূল উৎস।

যাহ্যাক (রঃ)-এর ব্যাখ্যা মোতাবেক মৃত্যুর সময় আগেও আসবে না, পরেও আসবে না কথাটির তাৎপর্য হল, জীবনের সময় বাড়বেও না, কমবেও না।[১]

এর পরবর্তী আয়াতে কাফেরদের চরম ধৃষ্টতার বর্ণনা রয়েছে এভাবে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ط

'আর কাফেররা বলে, 'আমরা এ কোরআনকে কখনও মানবো না এবং তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকেও নয়'।

অর্থাৎ যারা কাফের তাদেরকে যখন কেয়ামতের দিনের কথা, হিসাব নিকাশের কথা বলা হয় তখন তারা বলে, আমরা এই কিতাব কোরআনে করীমকে মানিনা, এই কিতাবে আখেরাতের এবং কেয়ামতের দিনের কথা রয়েছে। শুধু এই কিতাবই নয়; বরং ইতোপূর্বে যেসব আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে যেমন, তৌরাত ও ইঞ্জিল, সেগুলোও আমরা মানিনা। আর কখনও মানবো না বলে তারা সংকল্প করে। কেননা, এসব গ্রন্থে তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের কথা রয়েছে, শেরকের নিন্দা রয়েছে, অতএব পবিত্র কোরআন বা ইতোপূর্বে অবতীর্ণ সব আসমানী গ্রন্থই আমাদের নিকট সমান।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মুশরেকরা শুধু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতকে অস্বীকার করতো তাই নয়; বরং তারা কারো নবুওয়্যতকেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলনা। এর পাশাপাশি তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও তৌহীদেও বিশ্বাস করতো না। পবিত্র কোরআনের সত্যতার অগণিত দলিল প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না। আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে তাদের এ চরম ধৃষ্টতার জবাব এভাবে এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ

'(হে রসূল!) যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন এ জালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের দরবারে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে'।

কাফেরদের চিৎকার এবং আস্ফালন দুনিয়ার এ জীবন পর্যন্তই সীমিত। এরপর শুরু হবে তাদের চরম দুর্গতি। (হে রসূল!) যদি আপনি তাদের সে অসহায় অবস্থা

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৭৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্টা-৪৭৮

দেখতেন, যখন এ পাপীষ্ঠদেরকে হিসাব নিকাশের জন্যে কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের প্রতিপালকের মহান দরবারে দন্ডায়মান করা হবে, তখন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয়। কোন মানুষ যদি নিরাশ এবং অসহায় হয়ে পড়ে তখন সে নিজের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চায়, কেয়ামতের কঠিন দিনে কাফেররাও অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করবে অর্থাৎ তাদের নিজেদের দোষের জন্যে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে। নিজেদের পাপাচারের জন্যে অন্যকে দায়ী করতে থাকবে।

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ

'যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হতাম'।

অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা দুর্বল ছিল এবং ক্ষুদ্র বলে পরিগণিত ছিল, তাদেরকে বড়দের কথা মেনে চলতে হত, তারা তাদের মাতব্বর এবং সমাজপতিদের লক্ষ্য করে বলবে, 'শুধু তোমাদের জন্যেই আজ আমাদের এ দুর্দশা, তোমাদের কারণেই আমাদের এ বিপদ, দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের কথা মেনেছিলাম, তাই আজ আমাদের এ সর্বনাশ। তোমরা বাধা না দিলে আমরা আল্লাহর নবীর অনুসারী হতাম, তাঁর প্রতি ঈমান এনে তথা মোমেন হয়ে জীবনকে ধন্য করতাম'।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى
بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ

'যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদেরকে ক্ষমতাদর্পীরা বলবে, 'সত্য বিষয় তোমাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পরও কি তোমাদেরকে আমরা তা থেকে বিরত রেখেছিলাম? কিছুই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে তোমরাই ছিলে অপরাধী'।

অর্থাৎ তথাকথিত নেতারা তাদের অনুসারীদের কথার জবাবে বলবে, 'দুনিয়ার জীবনে তোমাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও তোমরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা ইচ্ছা করলেই তা গ্রহণ করতে পারতে, সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্যে আমরা তোমাদেরকে কখনও বাধ্য করিনি, তোমরা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে সত্যকে বর্জন করেছ এবং আজ আমাদের প্রতি দোষারোপ করছো, আমাদেরকে দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা তোমরা ইচ্ছা করলেই আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীর অনুসরণ করতে পারতে, কিন্তু তা করোনি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমরা

আদতেই ছিলে অপরাধী। আর সে অপরাধের শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে'।

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ
النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلٰلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ
مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَ
قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ
إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

তরজমা

(৩৩) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তারা অহংকারী ক্ষমতাবানদেরকে বলবে, 'আসলে তোমরাই তো দিন রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। তোমরাই আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর সাথে শরীক স্থির করি', আর যখন তারা আযাব দেখতে পাবে তখন গোপনে অনুতাপও করতে থাকবে, আর আমি কাফেরদের গলায় শেকল রেখে দেব, তারা যে আমল করতো, তারই পরিণতি তারা ভোগ করবে।

(৩৪) আমি যখনই কোন জনপদে সতর্ককারী (নবী) প্রেরণ করেছি তখন সেখানকার সুখী সমৃদ্ধশালী লোকেরা বলেছে, তোমাদেরকে যা নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

(৩৫) আর তারা আরো বলেছে, আমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী, আর কখনও আমাদেরকে আযাব দেয়া হবেনা।

(৩৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা তার জীবিকা স্বচ্ছল করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পরিমিত আকারে জীবিকা দান করে থাকেন, তবে অনেক লোকই তা জানেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যখন অপরাধীদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান করানো হবে, তখন তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করবে, যারা পৃথিবীতে দুর্বল ছিল, অন্যদের অনুসরণ করে চলতো তারা তাদের নেতাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কারণেই আমরা আজ এ বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, যদি তোমরা না থাকতে, তবে আমরা নিঃসন্দেহে মোমেন হতাম, আর আজ এ মহা বিপদ হতো না। অহংকারী ক্ষমতাবান লোকেরা তখন জবাবে বলবে, 'আমরা কি তোমাদেরকে আমাদের মত গ্রহণের জন্যে বাধ্য করেছিলাম'? একথার জবাবে দুর্বল লোকেরা যা বলেছে, তাই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

আর দুর্বল লোকেরা বলবে, 'তোমরা আমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানে বাধ্য কর নাই ঠিকই, কিন্তু আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে তোমরা দিন রাত সুকৌশলে প্ররোচনা দিয়েছিলে, এ উদ্দেশ্যে তোমরা চক্রান্ত করেছিলে এবং এমন সূক্ষ্ম ফাঁদ পেতেছিলে যে, তা থেকে আত্মরক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমরা তোমাদের নির্দেশক্রমেই আল্লাহ পাককে অমান্য করি এবং তাঁর সাথে শরীক স্থির করি, অতএব আমাদের কুফর ও নাফরমানীর জন্যে তোমরাই দায়ী। তোমরা বারে বারে আমাদেরকে পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ না করার এবং কুফরী ও শেরকে লিপ্ত হওয়ার কুপরামর্শ দিয়েছ'।

وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ

অর্থাৎ কাফেররা যখন আল্লাহ পাকের আযাব দেখবে তখন তাদের মোড়ল-মাতব্বর, নেতা সহ সকলেই মনে মনে আক্ষেপ করতে থাকবে যে, হায়! দুনিয়ার জীবনে ঈমান না এনে কি ভুলই না করেছি, কিন্তু তাদের এ অনুতাপ লজ্জার কারণে প্রকাশ করতে পারবে না; বরং তাদের মনের আগুন মনেই জ্বলতে থাকবে। তাদের হাত, পা এবং গলা শেকল দ্বারা বেঁধে রাখা হবে। এটি হলো তাদের কৃত কর্মকান্ডের অনিবার্য পরিণতি। তাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা, বরং ন্যায় বিচারই করা হবে। এজন্যে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

'সেদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদের সকলকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে। এরপর তোমাদের প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবে না'।

কাফেরদের শাস্তি

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ দোযখীদেরকে যখন দোযখে পৌছানো হবে, তখন দোযখের আগুনের প্রথম আঘাতেই দোযখীদের সারা দেহের গোশ্‌ত জ্বলে পুড়ে তাদের পায়ে এসে পড়বে। (এবনে আবি হাতেম)

হযরত হাসান এবনে ইয়াহয়া খাসানী (রহঃ) বলেছেন, দোযখের প্রত্যেক কারাগারে, প্রত্যেক গর্তে, প্রত্যেক শেকলে দোযখীর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। হযরত সোলায়মান দারানী (রহঃ) যখন একথা শ্রবণ করলেন তখন তিনি অত্যন্ত বেশী ক্রন্দন করলেন ঃ 'হায়! কি অবস্থা হবে সে ব্যক্তির, যার ব্যাপারে সর্ব প্রকার শাস্তি একত্রিত করা হবে। পাগুলো জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকবে, হাতে থাকবে হাতকড়া, আর ঘাড়েও থাকবে শেকল। এরপর তাদেরকে দোযখের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে (হে আল্লাহ! রক্ষা কর, হে আল্লাহ! রক্ষা কর)'।[১]

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও লিখেছেন, হাত পা, ঘাড় শেকলে আবদ্ধ অবস্থায় কাফেররা একে অন্যকে দেখবে এবং প্রত্যেকেই তার পরিণতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে। এরপর সকলকে একসঙ্গে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, আর প্রত্যেককে তার আমল মোতাবেকই শাস্তি দেয়া হবে, যে পর্যায়ের কুফর ও নাফরমানী হবে তার শাস্তিও সে পর্যায়ের হবে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ

'আর আমি যখনই কোন জনপদে সতর্ককারী (নবী) প্রেরণ করেছি, তখন সেখানকার সুখী সমৃদ্ধশালী লোকেরা বলেছে, 'তোমাদেরকে যা নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সব কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করতো এবং কেয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করতো। আর এ আয়াতে সে সব লোকের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৫৯

কথা বলা হয়েছে, যারা অর্থ-সম্পদের মোহ মায়ায় মুগ্ধ থাকার কারণে সত্যকে প্রত্যাখান করতো। অর্থ সম্পদ এবং ক্ষমতার কারণে তারা অহংকার করতো এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার গর্বে এতটা মেতে থাকত যে, তারা আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতো। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতো না, তারা ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অহংকারে এত অন্ধ হয়ে পড়তো যে, সমাজের দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষের সঙ্গে তারা একসঙ্গে বসতেও রাজী হতো না।

শানে নুযুল

এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম সুফিয়ান আসেমের সূত্রে আবু রাজীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কা শহরে দু' ব্যক্তি (ব্যবসা-বাণিজ্যে) অংশীদার ছিল। একজন সিরিয়া গমন করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মক্কায় রয়ে গেল। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তখন মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি তার সিরিয়াগামী অংশীদারকে এ খবর লিখে জানিয়ে দেয়। ঐ ব্যক্তি সিরিয়া থেকে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে লিখল, যিনি নবুওয়্যতের দাবী করেছেন, তাঁর কি অবস্থা হয়েছে? তখন মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি লিখল যে, নিচু শ্রেণীর দারিদ্র্য-প্রপীড়িত কিছু লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে। এ খবর পাওয়া মাত্র সে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে অনতিবিলম্বে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো এবং তার বন্ধুকে বললো, 'আমাকে ঐ ব্যক্তির ঠিকানা দাও'। এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব পাঠ করেছিল। এরপর সে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হল এবং জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি কি বিষয়ের প্রতি আহবান করেন? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জবাব দিলেন। ঐ ব্যক্তি জবাব শ্রবণ করা মাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, 'আমি স্বাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ পাকের রসূল', হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিভাবে এ সত্য অবগত হলে'? তখন তিনি বললেন, 'ইতোপূর্বে যে নবীই প্রেরিত হয়েছেন নীচু এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর অনুসারী হয়েছে', তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) মক্কার সমৃদ্ধশালী লোকেরা আপনার বিরোধিতা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬, পৃষ্ঠা-৬০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৮০

করছে, এজন্যে আপনি ব্যথিত, মর্মাহত হবেন না। কেননা, এটি নতুন কিছু নয়, ইতোপূর্বে আল্লাহ পাক যখনই কোন নবী রসূল প্রেরণ করেছেন, তখনই সমৃদ্ধশালী এবং সমাজপতিরা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার গর্বে তারা এমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলে, তখন সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছিল।

সমৃদ্ধশালী কাফেররা তাদের স্বপক্ষে যে বক্তব্য পেশ করতো, পরবর্তী আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ

আর তারা আরো বলেছে, 'আমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী এবং কখনো আমাদেরকে আযাব দেয়া হবেনা', অর্থাৎ তারা বলতো, যদি আমরা পথভ্রষ্ট হতাম, আল্লাহ পাকের অপ্রিয় হতাম, তবে তিনি আমাদেরকে কখনও এত ধন-সম্পদ, এত সন্তান-সন্ততি এবং এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করতেন না, তাঁর এসব নেয়ামত একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আমরা ভুল পথে নেই; বরং আমরা সঠিক পথেই রয়েছি। আমরা তাঁর প্রিয় এবং পছন্দনীয়, আমাদের সম্মান এবং মর্যাদা একথারই প্রমাণ যে আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা অতি সম্মানিত, আর এ কারণেই আখেরাতে আমাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবেনা, কেননা আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যাকে সম্মানিত করেছেন, আখেরাতে তাকে অপমানিত করবেন না।

ধনবল বা জনবল বড় কথা নয়

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দূরাত্মা কাফের মুশরেকরা মানুষের ধনবল ও জনবলকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বড় বিষয় মনে করতো। শুধু তাই নয়; তারা ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতাকে আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হবার মানদন্ডও মনে করতো। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা, এর সঙ্গে বাস্তবের কোনই সম্পর্ক নেই।

নবী রসূলগণ আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয়জন, অথচ দু' একজন ব্যতীত তাঁদের কেউই ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন না, একই অবস্থা আউলিয়ায়ে কেরামেরও, তাঁদের মধ্যেও অতি সামান্য সংখ্যক লোক ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁরা ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও পছন্দ করতেন না। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যিনি নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন তিনি কি ধনী ব্যক্তি ছিলেন? তাঁর স্ত্রী উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ 'হযরত

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে, অথচ তাঁর পরিবারবর্গ কখনও একাধারে দু' বেলা উদরপূর্ণ করে আহার করেননি'। অতএব, অর্থ-সম্পদ আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় হবার মানদন্ড নয়, স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(সূরা তোয়াহা-১৬ ঃ ১৩১)

'(হে রসূল!) আপনার চক্ষুদ্বয় কখনো সেই সম্পদের দিকে প্রসারিত করবেন না, যা আমি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ তাদেরকে দান করেছি, এর দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই, আর আপনার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিয্ক উত্তম এবং স্থায়ী'।

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ

(সূরা তওবা– ১০ ঃ ৮৫)

'আর (হে রসূল!) তাদের ধনশক্তি ও জনশক্তি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে, আল্লাহ পাক এর দ্বারা আর্থিক জীবনে তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, আর কাফের অবস্থায় যেন তাদের প্রাণ বের হয়'। এমনিভাবে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ۞ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

(সূরা আলে এমরান ৪ ঃ ১৯৬-৯৭)

'(হে রসূল!) কাফেরদের দেশে বিদেশে অবাধে বিচরণ যেন কোনভাবেই আপনাকে প্রতারিত না করে, এ-তো অত্যন্ত সামান্য সম্পদ, এরপর দোযখই হবে তাদের আবাসস্থল এবং কত নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল'!

অতএব, একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কারো ধনবল বা জনবল আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হবার প্রমাণ নয়; বরং এটি বিপদেরও কারণ হতে পারে।

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা তার জীবিকা স্বচ্ছল করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পরিমিত আকারে জীবিকা দান করে থাকেন, তবে অনেক লোকই তা জানেনা'।

বস্তুতঃ কারো রিয্ক বাড়িয়ে দেয়া বা কমিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বাড়িয়ে দেন আর যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক কমিয়ে দেন, তবে উভয় অবস্থাই হলো পরীক্ষামূলক। যার রিয্ক বাড়িয়ে দেয়া হয়, তাকে পরীক্ষা করা হয় যে সে কৃতজ্ঞ হয় কি অকৃতজ্ঞ, আর যার রিয্ক কমিয়ে দেয়া হয় তাকে পরীক্ষা করা হয় যে সে সবর অবলম্বন করে কি-না।

নৈকট্য-ধন্য হবার মাধ্যম

এ পৃথিবী মানুষের জন্যে পরীক্ষাগার। প্রতিটি কথা ও কাজে মানুষের পরীক্ষা হয়। এ পৃথিবী মানুষের কর্মস্থল, তবে কর্মফল আখেরাতে, এখানে নয়। আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবার মাধ্যম হল ঈমান ও নেক আমল, যাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যাবে, তারা আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে, আর যার মধ্যে ঈমান ও নেক আমল যত বেশী হবে, সে আল্লাহ পাকের দরবারে তত বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে। ধনী বা নির্ধন হওয়া কখনও কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপকরণ নয়।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

'কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা', তথা এ সত্য উপলব্ধি করেনা, এজন্যেই তারা ধনবল ও জনবলকে সম্মানের কারণ মনে করে এমনকি, আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হবার দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা এবং অর্থ-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তোমাদের অন্তর এবং আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন'। (মুসলিম শরীফ)

وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ
عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ
جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُونَ ٣٧ وَ
الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِينَ أُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ؕ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ
يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ أَهٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٤٠

তরজমা

(৩৭) আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে, তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের কথা স্বতন্ত্র, তাদের জন্যে তাদের নেক আমলের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে, তারা বেহেশতের প্রাসাদ কক্ষে নিশ্চিন্ত মনে বাস করবে।

(৩৮) যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হবে, তারা ধৃত হয়ে আযাবে উপস্থিত হবে।

(৩৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে প্রশস্তভাবে রিয্‌ক দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পরিমিত পরিমাণে দিয়ে থাকেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দান করেন। আর তিনি উত্তম রিয্‌ক দাতা।

(৪০) সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ্ পাক তাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরাই কি তোমাদের পূজা করতো'?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের একটি ভিত্তিহীন দাবীর উল্লেখ ছিল। তারা বলেছিল, আমাদের নিকট অধিক পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এবং আমাদের অনেক সন্তান-সন্ততিও রয়েছে, আমরা আল্লাহর পছন্দনীয় বলেই তিনি আমাদেরকে এসব দান করেছেন। কাফেরদের এ আস্ফালনের জবাবই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى

ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং সন্তান-সন্ততির আধিক্য আল্লাহ পাকের দরবারে নৈকট্য লাভের কারণ হয়না; বরং ক্ষেত্র বিশেষে এসব চরম দুর্গতি এমনকি, ধ্বংসের কারণ হয়।

নৈকট্য লাভের পন্থা

আল্লাহ পাকের দরবারে নৈকট্য লাভের পন্থা হলো, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং ঈমান অনুযায়ী নেক আমল। যে মোমেন আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ঈমানের দাবী মোতাবেক সৎ কাজ করে তথা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, সে-ই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। আর তাদের সম্পর্কে পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী আয়াতাংশে ঃ

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ

'তাদের জন্যে তাদের নেক আমলের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে, তারা বেহেশতের প্রাসাদ কক্ষে নিশ্চিন্ত মনে বাস করবে'।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের নেক আমলের অনুপাতে যা ন্যায্য প্রাপ্য হয়, তার চেয়ে অধিকতর সওয়াব লাভ করবে। একটি নেক আমলের বদলে ১০টি নেকী লাভ হয়। এখলাসের তারতম্যের কারণে তা বেড়ে ৭০০শ' গুণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমনকি, আল্লাহ পাকের মর্জি হলে তিনি তার চেয়েও অধিকতর দান করবেন। আলোচ্য আয়াতের الضعف। শব্দটির অর্থ হলো দ্বিগুণ। কিন্তু এখানে অধিকতর অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৬৭

অর্থাৎ ঈমানদার ও নেককার লোকেরা জান্নাতের প্রাসাদের কক্ষ সমূহে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করবে। সেখানে কোন প্রকার ভয়-ভীতি, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-তাপ, ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে স্পর্শ করবেনা।

এবনে আবি শায়বা, তিরমিজী, এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরে দেখা যায়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, এ প্রাসাদ সমূহ কার জন্যে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে বিনম্র ভাষায় কথা বলে, যে মানুষকে আহার করায় এবং যে অধিক পরিমাণে রোজা রাখে, আর মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে তখন যে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে, এমন ব্যক্তিদের জন্যেই এসব প্রাসাদ সমূহ রয়েছে।[১]

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ

'যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হবে, তারা ধৃত হয়ে আযাবে উপস্থিত হবে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমানদার ও নেককার লোকদের শুভ-পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে দূরাত্মা কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা স্থান পেয়েছে। যারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়, যারা নবী রসূলগণের শিক্ষা গ্রহণ থেকে মানুষকে বিরত রাখে, যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে সত্য মনে করেনা, তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদের কৃতকর্মের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।

যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ থেকে মানুষকে দূরে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে, ছলচাতুরী ও ফাঁক-ফন্দি করে, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিহত করার অপপ্রয়াস চালায় তাদের এ অপপ্রয়াস কখনও সফল হবেনা; বরং এভাবে তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। তাদের এ জীবন ও পরজীবন তারা নিজেরাই ধ্বংস করে, এমন লোকদের শাস্তি অবধারিত।

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৬১

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে প্রশস্ত ভাবে রিয্ক দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পরিমিত পরিমাণে দিয়ে থাকেন'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক একই ব্যক্তিকে কখনও রিয্ক বাড়িয়ে দেন বা কখনও কমিয়ে দেন। এটি তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জির ব্যাপার। আর্থিক অবস্থায় স্বচ্ছলতা অথবা অস্বচ্ছলতা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাপার। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে উদার হস্তে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দান করে থাকেন, আবার তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তার রিয্ক কমিয়েও দেন। এর অভ্যন্তরীণ রহস্য সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই অবগত।

অতএব, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার থাকাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

কোন কোন তসফসীরকার লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অর্থ-সম্পদ প্রসূত অহংকারের প্রতিবাদ ছিল। আর এ আয়াতে তাদের কৃপণতার প্রতিবাদ রয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতে মোমেনদেরকে আল্লাহ্ পাকের রাহে মুক্ত হস্তে দান করার আহবান জানানো হয়েছে।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

'আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ্ পাক তার বিনিময় অবশ্যই দান করবেন এবং তিনি উত্তম রিয্ক দাতা'।

আল্লাহ্র রাহে দানের ফজিলত

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে আদৌ সংকোচ বোধ করোনা কেননা, আল্লাহ পাক উত্তম রিয্ক দাতা। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে উত্তম রিয্ক দিয়ে থাকেন এবং যত ইচ্ছা তত দিয়ে থাকেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ 'তুমি আল্লাহর রাহে ব্যয় কর, তোমার উপর ব্যয় করা হবে'।

অন্য একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ প্রত্যেক দিন সকালে একজন ফেরেশতা দোয়া করে ঃ 'হে আল্লাহ! কৃপণের ধন ধ্বংস কর', আর অন্য একজন ফেরেশতা দোয়া করে, 'হে আল্লাহ! যে তোমার রাহে ব্যয় করে তাকে উত্তম প্রতিদান দাও'।

একবার হযরত বেলাল (রাঃ)-কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ 'হে বেলাল! ব্যয় কর। মহান আরশের মালিকের তরফ থেকে সংকীর্ণতার কথা চিন্তা করোনা'।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

তোমাদের এ যুগের পর এমন এক যুগ আসবে, যখন অর্থ-সম্পদ থাকবে কিন্তু সম্পদের অধিকারীরা তাদের সম্পদকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখবে যেন তা ব্যয় না হয়। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত ঃ

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

(আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে, তিনি অবশ্যই তার বিনিময় দান করবেন, আর আল্লাহ পাক উত্তম রিয্ক দাতা) তেলাওয়াত করেন।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন ঃ মানুষ তার নিজের এবং পরিবারবর্গের উপর যে ব্যয় করে তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যয়ের বিনিময় দান করার প্রতিশ্রুতি এ আয়াতে দেয়া হয়েছে তাতে অপব্যয় অন্তর্ভুক্ত হবেনা, আর যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা হয় তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এ পৃথিবীতে যেভাবে সুখী-দুঃখী, ধনী-নির্ধন হিসেবে মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনি আখেরাতেও মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। আর সে পার্থক্য হবে সওয়ার এবং আযাবের ভিত্তিতে তথা নেক আমল ও বদ আমলের ভিত্তিতে। ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে, ঈমান ও নেক আমলের বরকতে নাজাত ও জান্নাত নছীব হবে। আর কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি হবে দোযখে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ

'আর সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরাই কি তোমাদের পূজা করতো'?

তদানীন্তন আরবের কাফের মুশরেকরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করতো (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক), তাদের পূজাও করতো, এমনকি ফেরেশতাদের কল্পিত মূর্তি তৈরী করে সেগুলোর পূজা করতো। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ফেরেশতাদের পূজাই হলো মূর্তি পূজার মূল উৎস।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৯

বর্ণিত আছে যে, আমর এবনে লুহাই নামক এক কাফের সিরিয়া থেকে আরবে মূর্তি পূজার এ প্রথা আমদানী করেছিল। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কাফের মুশরেকদের সম্মুখে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরাই কি তোমাদের পূজা করতো? আর তোমরা কি তাদেরকে পূজা করতে বলেছিলে'?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কাফের মুশরেকদেরকে অপমানিত করার জন্যেই ফেরেশতাদেরকে এ প্রশ্ন করা হবে, আর কাফেরদের পূজনীয় আরো অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও ফেরেশতাদেরকে এজন্যে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তাদের অন্যান্য পূজনীয় সম্বোধনের যোগ্য নয়। এর দ্বারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফেরেশতাদের অসহায়ত্ব প্রমাণিত হবে এবং কাফেরদের জীবন ধারার ব্যর্থতা এবং অসারতা প্রকাশিত হবে। কেননা, কাফের মুশরেকরা দুনিয়ার জীবনে এ বিশ্বাস করতো যে, ফেরেশতাগণ এবং তাদের অন্যান্য দেব-দেবী আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ করবে।[১]

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৪১) ফেরেশতারা বলবে, পবিত্র মহিমময় তুমি, আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়; বরং তারা জ্বিনদের পূজা করতো, তাদের অধিকাংশই ছিল জ্বিনদের প্রতি বিশ্বাসী।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৮২

(৪২) আজ তোমরা কেউ কারো ভাল-মন্দের অধিকারী নও, যারা জুলুম করেছিল আমি তাদেরকে বলবো, তোমরা যে দোযখের শাস্তিকে মিথ্যা জ্ঞান করতে তা ভোগ করতে থাক।

(৪৩) আর যখন তাদের নিকট আমার আয়াত সমুহ স্পষ্ট করে তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, 'তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা যার এবাদত করতো এ ব্যক্তিই তো তার এবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়'। তারা আরও বলে, 'এটি মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত আর কিছুই নয়'। আর কাফেরদের নিকট সত্য উপস্থিত হওয়ার পর তারা বলে, 'এটি সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

কাফের মুশরেকদের অন্যায়-অনাচার প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'এরাই কি তোমাদের পূজা করতো'? একথাটি পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল। ফেরেশতাগণ এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তা আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ج

তারা বলেছে, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমি মহিমময়, তুমি মহান'।

অর্থাৎ সর্ব প্রকার শেরক থেকে আমরা তোমাকে পবিত্র মনে করি এবং তোমার পবিত্রতার কথা অঙ্গীকার করি। আমাদের সম্পর্ক শুধু তোমার সাথে, তাদের সাথে নয় তথা আমাদের এবাদতের যে সম্পর্ক রয়েছে তা শুধু তোমারই সাথে, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই। এ জবাব দ্বারা ফেরেশতাগণ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা মুশরেকদের আচরণে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট।

بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ج اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ

বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, মুশরেকরা আমাদের নাম করে শয়তানের পূজা করেছে। আর কেউ কেউ সরাসরি শয়তানের পূজা-অর্চনা করতো। আর তাদের অধিকাংশ লোকই শয়তানদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল, শয়তানদের কথায় তারা ওঠা-বসা করতো, শয়তান যেদিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিত তারা সেদিকেই ছুটতো। আর শয়তানই কাফের মুশরেকদেরকে মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করতো। তাদের অধিকাংশ লোকই শয়তানের ভক্ত ছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط

যারা শয়তানের পূজারী ছিল এবং যাদের পূজা তারা করতো কেয়ামতের কঠিন দিনে তারা উভয়েই হবে অসহায়। তাদের এ অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা সেদিন প্রকাশ পাবে অত্যন্ত নগ্নভাবে। কেননা তারা সেদিন কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না, এমনকি কারো অপকারও করতে পারবে না। পূজারীরা যাদের সাহায্য লাভের জন্যে শত আশা করেছিল তারাও মুখ ফিরিয়ে নেবে, কেননা সেদিন সকলেই হবে চরম অসহায়।

وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

'সেদিন আমি জালেমদেরকে বলবো, 'তোমরা দোযখের যে আযাবকে মিথ্যা জ্ঞান করতে তার যন্ত্রণা এখন ভোগ করতে থাক'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কেয়ামতের দিন পৌত্তলিকরা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, সেদিন তারা যেমন অসহায় থাকবে তেমনি অসহায় থাকবে তাদের দেব-দেবীরাও। কেউ কারো কোন উপকারেই আসতে পারবে না। বস্তুতঃ তারা ঐ শাস্তিরই উপযুক্ত। কেননা তারা দুনিয়ার জীবনে নবীগণকে বিদ্রুপ করতো এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করতো।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ

'আর যখন তাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ স্পষ্ট করে তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, 'তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যার এবাদত করতো এ ব্যক্তিই তার এবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়'।

কাফেরদের ধৃষ্টতা

এ আয়াতে কাফেরদের ধৃষ্টতার বিবরণ রয়েছে, যে কারণে তারা আল্লাহ পাকের আযাবের যোগ্য হয়েছে। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি যখন পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ নাযিল হতো এবং ঐ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে শোনানো হতো তখন তাদের কর্তব্য ছিল তার উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করা। কিন্তু তারা তা করেনি, বরং দূরাত্মা কাফেররা তখন প্রিয়নবী সাল্লাললাহ আলইহে ওয়াসল্লামের শানে বেয়াদবী করে বলতো, এ ব্যক্তি নবী রসূল কিছুই নয় (নাঊজুবিল্লাহি মিন জালেক), আসলে এই নামে সে প্রতারণা করে তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যার এবাদত করেছে তা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায়। কাফেররা একথাও বলে, কোরআন নামে যা কিছু সে তোমাদের নিকট পাঠ করছে তা-ও কিছু মিথ্যার সমষ্টি মাত্র। নিজের তৈরী করা কয়েকটি

কথাকেই সে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)। আর কাফেরদের নিকট যখন সত্য এসেছে তথা তৌহীদের বাণী তাদের নিকট পৌঁছেছে তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, শুধু তাই নয়; বরং তারা বলেছে, এতো যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর তা কোন গোপন কিছুও নয়; বরং সুস্পষ্ট যাদু।

আলোচ্য আয়াতে الحق। শব্দটি নবুওয়্যত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা 'ইসলাম' বা 'কোরআন' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন কাফেরদের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে অথবা যখন তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে অথবা যখন তাদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনানো হয়েছে তখন তারা বলেছে এ-তো সুস্পষ্ট যাদু।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, কাফেরদের কথা দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে পবিত্র কোরআনের মোজেযা হওয়ার ব্যাপারে তাদেরও কোন সন্দেহে ছিল না। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে শয়তানের ধোকায় পড়ে তারা কোরআনকে যাদু বলে অভিহিত করতো। পবিত্র কোরআন যে বিস্ময়কর এক মহান বাণী, এতে তাদের আদৌ কোন সন্দেহ ছিল না। তবে তারা পবিত্র কোরআনকে যাদু বলে বিশ্বাস করতো, আল্লাহ পাকের মহান বাণী বলে বিশ্বাস করতো না। এটি ছিল তাদের দুর্ভাগ্য। ঠিক এমনিভাবে আধুনিক কালে পাশ্চাত্যের ধ্বজাধারীরা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিস্ময়কর ঘটনাবলী অস্বীকার করতে পারে না। অবশ্য তারা এসব যে আল্লাহ পাকের সাহায্যে হয়েছে তা মানে না। তারা বলে, এসব কিছু এজন্যে সম্ভব হয়েছে যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, সুচতুর লোক (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)।

وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ
قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا
مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ
اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوْا ۫ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ
فَهُوَ لَكُمْ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾

তরজমা

(৪৪) আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন কিতাব পত্র দেইনি যা তারা পাঠ করতো এবং (হে রসূল!) আপনার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি।

(৪৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল অথচ আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তার এক দশমাংশও এরা পায়নি, তবুও তারা আমার রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল। (জিজ্ঞাসা করি) কত ভয়ংকর হয়েছিল সেই মিথ্যাজ্ঞানের শাস্তি!

(৪৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা দু' দু'জন এক একজন করে আল্লাহ পাকের নামে উঠে দাঁড়াও, এরপর তোমরা চিন্তা করে দেখ তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নন, তিনি তোমাদেরকে এক আসন্ন ভয়ংকর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছেন মাত্র।

(৪৭) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই তবে তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। আর সব কিছুই তাঁর সম্মুখে বর্তমান।

(৪৮) (হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্য সঠিক দ্বীন ধর্মকে বিজয়ী করেন, তিনি গায়বী বিষয় সমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেররা পবিত্র কোরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করেছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ইতোপূর্বে আরবের পৌত্তলিকদের নিকট কোন কিতাব নাযিল হয়নি যা পাঠ করে তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারতো, এমনকি তাদের নিকট ইতোপূর্বে কোন সতর্ককারী তথা কোন নবী রসূল আগমন করেননি, বনী ইসরাঈলের নিকট নবী রসূলগণ আগমন করেছেন এবং তাঁদের নিকট আসমানী গ্রন্থও নাযিল হয়েছে, কিন্তু আরবের মুশরেকদের নিকট ইতোপূর্বে কোন নবী রসূল আগমন করেননি, কোন আসমানী কিতাবও নাযিল হয়নি। আল্লাহ পাক একান্ত দয়া পরবশ হয়েই তাদের মাঝে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যেই তাঁর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। আরবের মুশরেকদের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং পবিত্র কোরআনের অবতরণ একটি নতুন নেয়ামত এবং অতুলনীয় সম্পদ ছিল, যা এর পূর্বে তাদের জন্যে ছিল নিতান্ত কল্পনাতীত। তাদের কর্তব্য ছিল এ নেয়ামতের কদর করা, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করা, আর এ নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা, অথচ তারা পবিত্র কোরআনকে যাদু বলে আখ্যা দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে তারা বলতো, যদি আমাদের নিকট কোন নবী আগমন করেন তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করবো, আর কোন আসমানী গ্রন্থ যদি আমাদের নিকট নাযিল হয়, আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো, অথচ যখন তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো তখন তারা তাঁর বিরোধিতায় তৎপর হলো।

অথবা এ আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে, আল্লাহ পাক ইতোপূর্বে আরবের মুশরেকদের জন্যে এমন কোন গ্রন্থ নাযিল করেননি যার শিক্ষা-দীক্ষা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শের পরিপন্থী, তাহলেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করার একটি যুক্তি থাকত, কিন্তু আরবের মুশরেকদের অবস্থা তেমনও নয়, অতএব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা শুধু যে অন্যায় অসুন্দর তাই নয়; বরং অযৌক্তিকও।

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ

'তাদের পূর্ববর্তীরাও (নবী রসূলগণের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছিল, অথচ আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম তার এক দশমাংশও এরা পায়নি, তবুও তারা আমার রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। (জিজ্ঞাসা করি) কত ভয়ংকর হয়েছিল সেই মিথ্যাজ্ঞানের শাস্তি (তা কি ভেবে দেখেছ)'?

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কাফেররা বাগাড়ম্বর করে বলেছিল, আমাদের অর্থ-সম্পদ রয়েছে অনেক বেশী, এ কারণে পৃথিবীতে আমাদের সম্মান এবং মর্যাদাও বেশী, দুনিয়াতে যখন আমাদেরকে সম্পদ এবং সম্মান দেয়া হয়েছে, আখেরাতে আমাদের অপমান করা হবেনা তথা আমাদের প্রতি আযাব হবেনা।

কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন-কল্পে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ ইতোপূর্বে পৃথিবীতে যেসব জাতি ছিল এবং তাদেরকে যে সম্পদ এবং ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দিয়েছিলাম, তাদের এক দশমাংশও বর্তমান যুগের কাফেরদেরকে দেয়া হয়নি, কিন্তু এত বিষয়-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তাদের কুফরী ও নাফরমানী সীমা লংঘন করেছে তখন তারা হয়েছে কোপগ্রস্ত, আল্লাহ পাকের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করেছে এবং তাদের ধনবল ও জনবল কোন কাজেই আসেনি। অতএব, কারো ঐশ্বর্য সম্পদের কারণে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই সেদিন (১৯৯৫ইং) জাপানের কোবে নগরীতে মাত্র ২০ সেকেন্ড স্থায়ী যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তাকে কি যান্ত্রিক সভ্যতার সর্বাধুনিক উপকরণ দ্বারা ঠেখিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল? অতএব, জাগতিক কোন শক্তি দ্বারাই আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়না। এর জন্যে প্রয়োজন ঈমান ও নেক আমলের।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরু থেকে তৌহীদ, রেসালত এবং কেয়ামত সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। এখন একটি উপদেশ দিয়ে সূরা শেষ করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, যেসব মৌলিক বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা মর্দে মোমেনের একান্ত কর্তব্য, তন্মধ্যে তৌহিদ, রেসালত এবং কেয়ামত বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ সূরায় এ তিনটি বিষয় এ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ط

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি নসিহত করছি, তোমরা দু' দু'জন, এক একজন করে আল্লাহ পাকের নামে উঠে দাঁড়াও, এরপর চিন্তা করে দেখ যে, তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নন, তিনি তো তোমাদেরকে এক আসন্ন ভয়ংকর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছেন মাত্র'।

কাফের মুশরেকদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াতে বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা ক্ষণিকের জন্যে হলেও হিংসা-বিদ্বেষ, জেদ, শত্রুতা ও হঠকারিতা পরিহার কর এবং ইনসাফের ভিত্তিতে আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের নামে একটি বিষয় চিন্তা করার জন্যে উঠে দাঁড়াও, অর্থাৎ প্রস্তুত হও, আর তা একা একাও করতে পার, অথবা দু'জন দু'জন একত্রিত হয়ে পরামর্শও করতে পার।

চিন্তার বিষয়টি হলো, তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিনি অতি শৈশব থেকে বিগত চল্লিশটি বছর তোমাদের সঙ্গেই অতিবাহিত করেছেন, তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্বস্ততায় তোমরা সকলেই ইতোপূর্বে মুগ্ধ ছিলে, তাঁর প্রশংসায় তোমরা ছিলে পঞ্চমুখ, তাঁকে তোমরাই 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত বলে উপাধি দিয়েছিলে, জীবনে কখনও তাঁর মধ্যে তোমরা স্বার্থপরতা বা অসাধুতা লক্ষ্য করনি। এমন অবস্থায় তোমরাই বল তাঁর ন্যায় এমন মহান ব্যক্তি কি উম্মাদ হতে পারেন? তোমরা সারা জীবন যাঁর প্রশংসা করেছ, আজ যখন তিনি আল্লাহ পাকের নবুওয়্যত লাভ করেছেন, তোমাদেরকে সত্যের

দিকে আহবান করছেন, তোমাদের কল্যাণার্থেই তোমাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন এমন অবস্থায় কিভাবে তোমরা তাঁকে বিকৃত মস্তিস্ক বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? মূলতঃ যে তাঁকে উম্মাদ বলে, সে নিজেই উম্মাদ।

মানুষ দু'টি উদ্দেশ্য কাজ করে, কোন বিষয়ে উপকৃত হবার লক্ষ্যে, অথবা কোন প্রকার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। সাধারণতঃ এ দু'টি জাগতিক উদ্দেশ্যেই মানুষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দু'টি জাগতিক উদ্দেশ্যের কথা পূর্বাহ্নেই অস্বীকার করেছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ আমার এই কাজের জন্যে আমি কোন বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে।

অতএব, দ্বীন ইসলামের প্রচারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জাগতিক কোন স্বার্থ নেই। এমনকি, কোন ক্ষতির আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও তিনি এ কাজ করছেন না, কেননা তিনি যখন আরববাসীকে তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন তখন সারা আরব তথা সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁর শত্রু হয়ে গেল। কিন্তু তিনি যেহেতু এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে আশা করতেন না এবং এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করতেন না, তাই মানুষের শত্রুতারও তিনি পরোয়া করতেন না।

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ

তিনি তো তোমাদের আসন্ন ভয়ংকর আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন, তোমাদের কল্যাণের চিন্তা করছেন, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের যখন অবসান ঘটবে, যখন পরকালীন জীবন শুরু হবে তখন তোমরা মহাবিপদের সম্মুখীন হবে। তিনি তোমাদেরকে সেই মহা বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে উপদেশ দিচ্ছেন, তিনি নতুন কেউ নন; বরং তোমাদের চির পরিচিত, তোমাদের সকলের দ্বারা প্রশংসিত এবং অভিনন্দিত ব্যক্তি, তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের কল্যাণার্থেই হচ্ছে। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আহবানে সাড়া দেয়া এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

(হে রসূল!) (আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন) নাযিল হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন এবং মক্কার অধিবাসী বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাক দিলেন, যখন তারা

সমবেত হলো তখন তিনি এভাবে কথা শুরু করলেন ঃ যদি আমি তোমাদেরকে এই সংবাদ দেই যে, এ পাহাড়ের অপর দিকে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী লোক রয়েছে যারা তোমাদের প্রতি আক্রমণ করতে উদ্দত, তবে কি তোমরা আমার এ সংবাদে আস্থা জ্ঞাপন করবে? তারা বললোঃ আপনার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, আপনি কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তাই আপনার একথাও আমরা সত্য মনে করবো।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ আমি তোমাদেরকে আসন্ন এক আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি, তখন দূরাত্মা আবু লাহাব বললো, 'তুমি কি আমাদেরকে এজন্যে একত্রিত করেছ'? তখন تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ সূরাটি নাযিল হয়।[১]

এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বীন ইসলামের প্রচার শুরু করেন।

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি কাফের মুশরেকদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। তোমাদের নিকট যা আছে তা তোমাদেরই থাক। এর আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমার পুরস্কার আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে। তিনিই আমাকে পুরস্কৃত করবেন। আমি যা-কিছু করছি তা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের কল্যাণার্থে করছি। তোমাদের কল্যাণ কামনা করা এবং তোমাদের নিকট মহান আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছানোই আমার কর্তব্য এবং নবুওয়্যতের দায়িত্ব।

إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ

'আর সব কিছু আল্লাহ পাকের সম্মুখে বর্তমান'। তিনি প্রত্যেককেই তার আমল এবং আকীদা মোতাবেক বিনিময় দান করবেন।

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ج عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক দ্বীন ইসলামকে কুফর ও নাফরমানীর উপর বিজয়ী করবেন'।

অথবা এর অর্থ হলো 'নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন'।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত মেকদাদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৮৬

করছিলেন ঃ পৃথিবীতে এমন কোন গৃহ থাকবে না, কোন তাঁবুও এমন থাকবে না যার মধ্যে আল্লাহ পাক ইসলামের কলেমা না পৌঁছাবেন। সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানের সঙ্গে এবং অপমানিত ব্যক্তির অপমানের সঙ্গে অর্থাৎ যারা ইসলাম কবুল করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্মানিত করবেন, আর যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না আল্লাহ পাক তাদেরকে অপমানিত করবেন। এ আয়াতেও কাফেরদের উদ্দেশ্যে রয়েছে সতর্কবাণী। অর্থাৎ তোমাদের উপকারার্থেই আল্লাহ পাক তাঁর মহান বাণী নাযিল করেছেন এবং তাঁর নবী প্রেরণ করেছেন। অতএব, তোমরা সত্যকে গ্রহণ কর এবং বাতিল থেকে দূরে থাক। মনে রেখো, সত্যের বিজয় আর অসত্যের পরাজয় অনিবার্য। যা মানুষের অদৃশ্য, অজানা তা আল্লাহ পাক ভাল ভাবেই জানেন। কে নবুওয়্যতের উপযুক্ত তা তিনিই জানেন। অবশেষে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এবং কাফের শক্তির পতন ঘটবে- একথা আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন এবং আসমান জমীনের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ
ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ
إِلَىَّ رَبِّىْ ؕ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرٰٓى إِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ
وَأُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٥١﴾ وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ
التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾ وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَ
يَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا
يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿٥٤﴾

তরজমা

(৪৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, সত্য এসেছে, আর মিথ্যা কখনও কিছু সৃষ্টিও করতে পারেনা; পুনরাবৃত্তিও করতে পারেনা।

(৫০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আমি ভুল পথে চলি, তবে তার পরিণাম আমাকেই ভোগ করতে হবে, আর যদি সরল-সঠিক পথে থাকি তবে তা এজন্যে যে, আমার প্রতিপালক আমার নিকট ওহী প্রেরণ করে থাকেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, তিনি সবার নিকটে।

(৫১) (হে রসূল!) যদি আপনি দেখতেন সে অবস্থা যখন কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, পলায়নেও রক্ষা পাবেনা এবং তারা অতি নিকটস্থ স্থান থেকেই পাকড়াও হয়ে আসবে।

(৫২) এবং তারা বলবে, 'আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম, কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান থেকে তারা নাগাল পাবে কিভাবে'?

(৫৩) অথচ ইতোপূর্বেও তারা তা অস্বীকার করেছে এবং তারা দূরবর্তী স্থান থেকে গায়বী বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারত।

(৫৪) তাদের এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঠিক সেভাবেই বাধা পড়ে গেছে, যেমন তাদের পথের পথিকদের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

তফসীরুল কোরআন

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ

সত্যের বিজয়ের ঘোষণা

এ আয়াতে সত্যের তথা ইসলামের বিজয়ের ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে অর্থাৎ ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির মুক্তির মহাসনদ রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। সত্যের আলো এখন উদ্ভাসিত, বাতিলের আঁধার হয়েছে দূরীভূত, সত্যের বর্তমানে বাতিল বা মিথ্যা টিকতে পারেনা, সত্যের বিজয়ের এ শুভলগ্নে মিথ্যার পরাজয় তথা কুফর ও শেরকের অবসান একান্ত অনিবার্য।

বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দস্তে মোবারকের লাঠি দ্বারা কা'বা শরীফে রক্ষিত মূর্তিগুলোর উপর আঘাত করে সেগুলোকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর জবান মোবারক থেকে এ আয়াত খানি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদায় নিয়েছে আর মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য'। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ

'আর বাতিল বা মিথ্যা কখনও কিছু সৃষ্টিও করতে পারেনা; পুনরাবৃত্তিও করতে পারেনা'।

অর্থাৎ ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাতিল বা শেরক বিদায় নিয়েছে, বাতিলের এমন কোন অংশ অবশিষ্ট নেই যা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, অথবা কোন কিছুর পুনরাবৃত্তি করতে পারে। আলোচ্য আয়াতে 'হক্ব' শব্দ দ্বারা ইসলাম বা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর 'বাতিল' শব্দ দ্বারা শেরককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'বাতিল' শব্দ দ্বারা ইবলিস শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা প্রথমে কিছুই সৃজণ করতে পারেনা, আর কবর থেকে কাউকে পুনরুত্থিতও করতে পারেনা।

তফসীরকার কালবী (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'বাতিল' শব্দ দ্বারা মূর্তি বা প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ ط

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আমি ভুল পথে চলি, তবে তার পরিণাম আমাকেই ভোগ করতে হবে, আর যদি আমি সরল সঠিক পথে থাকি তবে তা এজন্যে যে, আমার প্রতিপালক আমার নিকট ওহী প্রেরণ করে থাকেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি কাফেরদেরকে বলুন, তোমরা যারা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করছো এবং আমাকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত নবী হিসেবে বিশ্বাস করছো না, তোমরা একটু ভেবে দেখ, যদি আমার নবুওয়্যতের দাবী সত্য না হয়, যদি পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম না হয়, যদি আমার কথা অসত্য হয়, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই তবে এর শোচনীয় পরিণাম শুধু আমাকেই ভোগ করতে হবে, আর আমার সর্বনাশ ব্যতীত আর কিছুই নেই, কিন্তু যদি আমার নবুওয়্যতের দাবী সত্য হয় এবং আমি সরল সঠিক পথেই চলে থাকি তবে এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই; বরং এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান এবং অনুগ্রহ যে, তিনি আমার প্রতি ওহী নাযিল

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৮৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৬৫

করেন। পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়, আর এ পবিত্র কোরআনের কারণেই আমি সঠিক পথে চলতে পারি। যদি তোমরাও আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআনের উপর আমল কর এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আমার অনুসরণ কর তবে তোমরাও কল্যাণের পথে থাকবে।

পক্ষান্তরে, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার কর তবে মনে রেখ যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠারঘাত করছো। এমন অবস্থায় তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর মধ্যেই সমগ্র মানব জাতির জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যারা পবিত্র কোরআনের হেদায়েত মেনে চলে এবং যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, শুধু তারাই কল্যাণ লাভ করতে পারে। অন্যথায় গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা তাদেরকে পেয়ে বসে।[১]

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

‘নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, তিনি সবার নিকটে’।

অর্থাৎ তিনি সকলের সব কথা শ্রবণ করেন, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, তিনি সকলের কথা ও কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, এ বাক্যে আল্লাহ্ পাকের যে দু'টি গুণের উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারা মুশরেকদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে, কেননা তারা যে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে তারা সর্বশ্রোতাও নন, সর্বজ্ঞাতও নয়; বরং তারা কিছুই শুনতে সক্ষম নয়, কিছুই জানেনা আর কিছু বোঝেও না।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্যনীয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অদ্বিতীয় উচ্চতম শান এবং মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও এ নির্দেশ রয়েছে যে, যদি কোন দুর্বলতা বা ভুল ভ্রান্তি হয়, তা নিজের তরফ থেকে হয়েছে বলে অনায়াসে স্বীকার করুন, আর হেদায়েত এবং সত্যের সন্ধান ও সার্বিক কল্যাণ একমাত্র আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই অর্জিত হয় বলে ঘোষণা করুন।[২]

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৬৫
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৭০

'(হে রসূল!) যদি আপনি দেখতেন সে অবস্থা যখন কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, পলায়নেও রক্ষা পাবেনা এবং তারা অতি নিকটস্থ স্থান থেকেই পাকড়াও হয়ে আসবে'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন কাফেরদের যে দুর্গতি হবে, তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। দুনিয়াতে তারা যত বাগাড়ম্বরই করুক না কেন, আখেরাতে তারা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হবে যা এখন কল্পনাতীত। আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হবে। পলায়ন করে বা আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা যাবেনা। কারো কাছে গিয়ে আশ্রয়ও মিলবেনা। তাদেরকে পাকড়াও করতে গিয়ে দূরেও যেতে হবেনা, যেখানেই থাকুক না কেন, অতি সহজেই ধরা পড়ে যাবে। কবর থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাফেরদের ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার সময় সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, কাফের মুশরেকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে মৃত্যুর মুহূর্তে, তাদের পলায়নের তখন কোন ব্যবস্থা থাকবেনা। কোন দুর্গে আত্মরক্ষা করারও কোন সম্ভাবনা থাকবেনা। প্রাণের বদলে, আর্থিক পণ আদায় করেও আত্মরক্ষা করতে পারবেনা। কেননা, কাফেরদেরকে জমীনের উপর থেকে পাকড়াও করে সঙ্গে সঙ্গে জমীনের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হবে।

অথবা এর অর্থ হলো, কাফেরদেরকে কবর থেকে ওঠার পর সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করা হবে, তখন পলায়নের কোন ব্যবস্থাই থাকবেনা।

অথবা এর অর্থ হলো, হিসাব নিকাশের সময় তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ

আর কাফেররা তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে, এখন আমরা ঈমান এনেছি। অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এখন আমরা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু ঈমান আনয়নের সময় বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন ঈমান কোন কাজে আসবেনা। দুনিয়ার জীবনে ঈমান আনার সময় ছিল। আখেরাত ঈমান আনার জন্যে নয়। আখেরাত হলো ঈমানের ফলাফল ঘোষণার জন্যে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঈমানের পুরস্কার লাভের জন্যে। ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন তখন সম্ভব হয় যখন মানুষ দুনিয়াতে থাকে। কিন্তু যখন মানুষ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে, তখন ঈমান আনয়নের কোন সুযোগ থাকেনা। এজন্যে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে–

وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ

কেননা, দূর থেকে যদি কেউ কোন জিনিস হাতে নিতে চায়, তা যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি দুনিয়া থেকে আখেরাতে পৌঁছে ঈমান কি করে হাতে নেবে? দুনিয়া থেকে আখেরাতের দূরত্ব বেশী, কেউ আখেরাত থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসেনা; আসতে পারেনা। তাই ঈমানের রক্ষাকবচ তাদের নাগালের বাইরে। আর ঈমান যাদের হাতছাড়া হয়, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পায়না।

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ

তারা ইতোপূর্বে অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছিল, আল্লাহর রসূলকে অমান্য করেছিল, পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করেছিল, আখেরাতে অবিশ্বাস করেছিল। তার শাস্তি তাদেরকে এখন ভোগ করতেই হবে। এখন বিলাপ ক্রন্দনে কোন উপকার হবেনা।

وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ

'শুধু যে তারা অবিশ্বাসী ছিল তাই নয়; বরং তারা দূরবর্তী স্থান থেকে অলক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করতো'।

অর্থাৎ তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এবং আখেরাতের বিষয়ে যা ইচ্ছা তা মন্তব্য করতো।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তারা লক্ষ্য-স্থল নির্দিষ্ট করে বেআদবী পূর্ণ মন্তব্য করতো, কখনো বলতো তিনি কবি, কখনো বলতো তিনি যাদুকর, কখনো বলতে মিথ্যাবাদী (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কাফেররা দুনিয়াতে তাদের ধারণা-প্রসূত তীর নিক্ষেপ করতো। তারা বলতো, কেয়ামতও হবেনা, জান্নাত ও দোযখও নেই। সেসব আপত্তিকর মন্তব্যের তথা অবিশ্বাসের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত রয়েছে।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ

'তাদের এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঠিক সেভাবেই বাধা পড়ে গেছে, যেমন ইতোপূর্বে তাদেরই পথের পথিকদের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে'।

তাদের এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মধ্যে আড়াল করা হয়েছে, একথার তাৎপর্য হলো ঈমানের উপকারিতা, দোযখ থেকে নাজাত, যদি তা না হয় তবে অন্তত দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ, যদি তা-ও না হয়, অন্ততঃ দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও পানাহারের কোন বস্তু লাভ করা। এসবেরই তারা আশা করেছিল, তাদের এ আশা আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হবেনা।

كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ

আর এটি কোন নতুন ব্যবস্থা নয়; বরং ইতোপূর্বে যারা পৃথিবীতে কাফের মুশরেক ছিল, তাদের সঙ্গে এ আচরণই করা হয়েছে, নিশ্চয় তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। তারা কেয়ামতের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল, কাফের ও জালেমদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আযাব আসবে– এ বিষয়েও তাদের সন্দেহ ছিল। তাই তাদের শাস্তি অনিবার্য, তাদের অপরাধ অমার্জনীয়, তাদের পরিণাম ভয়াবহ।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৭শে মে, ১৯৯৫ মোতাবেক ২৬শ জিলহজ্ব ১৪১৫ হিঃ রোজ শনিবার বেলা দু'টার সময় আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে সূরা সাবার তফসীর সমস্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর এবং এ মহান গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাতের

(মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৪৫, রুকু-৫)

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا

اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ

لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ

يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۡ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ③

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে (শুরু করছি)

তরজমা

(১) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, যিনি বাণীবাহক করেছেন এমন ফেরেশতাদেরকে যাদে দু' দু'টি, তিন তিনটি, চার চারটি ডানা রয়েছে। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(২) আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি রহমতের দ্বার উম্মুক্ত করলে, তা বন্ধ করতে পারে এমন কেউ নেই এবং তিনি কোন কিছু বন্ধ করলে আর কেউ তার উম্মুক্তকারী নেই। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

(৩) হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের যে নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা রয়েছে কি? যে তোমাদেরকে আসমান জমীন থেকে রিয্ক সরবরাহ করবে; (মনে রেখ) এক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তবুও তোমরা কোথায় ফিরে যাও?

সূরা ফাতের প্রসঙ্গে

নামকরণ

'ফাতের' শব্দটির অর্থ স্রষ্টা। এ সূরার শুরুতেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের কথা রয়েছে, তাই এ সূরার নাম 'ফাতের' হয়েছে।

এ সূরাকে 'সূরাতুল মালায়েকা'-ও বলা হয় কেননা, এ সূরায় ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। সূরা সাবা-র শেষের দিকে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, মুশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কন্যা মনে করে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)।

মুশরেকদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে স্বস্থানে। এ সূরায় ফেরেশতাদের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, যা আল্লাহ্ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, সর্বক্ষণ তারা আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে মশগুল এবং তাঁর হুকুম পালনে ব্যস্ত। এ সূরাটি সেই পাঁচটি সূরার অন্যতম যা আরম্ভ করা হয়েছে হামদ দ্বারা। যিনি বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি রিয্কদাতা, ভাগ্য-নিয়ন্তা, যাঁর এক আদেশে বিশ্ব-সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাঁর আরেক আদেশে সমগ্র সৃষ্টি জগত লয় প্রাপ্ত হবে, আমরা যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভে ধন্য, তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য। যারা আল্লাহ পাকের শোকর গুজার এবং নেককার হয়, তাদের শুভ পরিণতির সুংসংবাদ রয়েছে এ সূরায়। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এ সূরায় উল্লেখ রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় মুশরেকদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন নিংসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের বিরাট নেয়ামত। তই এ নেয়ামতের শোকর আদায়ের ইঙ্গিত করে এ সূরাকে হামদ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ পাকের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করে শোকর গুজারীর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং অকৃতজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৬১

এ সূরার অধিকাংশ আয়াত সমূহে তৌহিদের প্রমাণ এবং শেরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কেয়ামতের কঠিন দিনের উল্লেখ করে মুশরেকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেহেতু কাফেরদের বিরোধিতা এবং নানা চক্রান্তের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো চিন্তিত হয়ে পড়তেন, তাই তাঁকে সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে।

এ সূরাকে আল্লাহ পাক হামদ এবং শোকরের কথা দ্বারা শুরু করেছেন।

প্রথমতঃ এ সূরায় আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত এবং অসাধারণ কুদরত হেকমতের উল্লেখ রয়েছে। এতে তৌহিদের প্রমাণ রয়েছে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের ঘোষণা রয়েছে এবং অবশেষে কেয়ামতের কঠিন দিনের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আল্লামা সয়ুতি (রঃ) এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সূরা ফাতের' মক্কায় নাযিল হয়েছে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন ঃ সূরা ফাতেরকে 'সূরাতুল মালায়েকা'ও বলা হয়, আর এটি মক্কায় অবতীর্ণ।

তফসীরুল কোরআন

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি এ সূরার فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ বাক্যটির فاطر শব্দটির অর্থ জানতাম না, ঘটনাক্রমে দু' জন বেদুইন ব্যক্তিকে একটি কূপের মালিকানা নিয়ে কলহরত দেখলাম, তন্মধ্যে একজন বললোঃ انا فطرتها অর্থাৎ 'এ কূপটি প্রথমে আমিই তৈরী করেছিলাম', অতএব, এর অর্থ হলো কোন বস্তুকে কোন প্রকার নমুনা না দেখে প্রথম সৃষ্টি করা।[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের, যিনি তাঁর কুদরতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, যিনি শূণ্যের গভীর অন্ধকার থেকে আসমান জমীন তথা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আর এ বিস্ময়কর সৃষ্টি আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতেরই মহান অবদান যা তিনি কোন নমুনা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন।

মূলতঃ আসমান জমীন হলো আল্লাহ পাকের অসীম রহমত ও নেয়ামত সমূহের ভান্ডার। এ নীলাভ আকাশকে আল্লাহ পাক কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীত ঝুলন্ত অবস্থায়

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৬৮

রেখে দিয়েছেন। আর বিশাল বিস্তৃত জমীনকে বিছিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্ পাক আসমান এবং জমীনের মাধ্যমে সমগ্র প্রাণী জগতকে রিয্ক দান করে থাকেন, আসমান থেকে আল্লাহ্ পাকের হুকুমে বারি বর্ষিত হয়, আর জমীন তা আপনার মাঝে একাকার করে নেয়। এভাবে আল্লাহ্ পাক জমিন থেকে তাঁর বন্দাদের জন্যে রিয্ক পয়দা করে থাকেন।

অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা।

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط

(সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের) যিনি বাণীবাহক করেছেন এমন ফেরেশতাদেরকে যাদের দু' দু'টি, তিন তিনটি, চার চারটি ডানা রয়েছে'।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন ঃ ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্ পাক তাঁর বাণী বাহক হিসেবে আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট প্রেরণ করেন, তারা আসমান থেকে বাণী নিয়ে জমিনে আগমন করেন যেন গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং মানব জাতি আল্লাহ্ পাকের বিধানের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করতে পারে।

ফেরেশতা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি

ফেরেশতাদের সৃষ্টিও অত্যন্ত বিস্ময়কর। কারো কারো দু'টি, আর কারো তিনটি ডানা রয়েছে, আর কারো চারটি। তারা দ্রুত আসমান থেকে জমিনে আসেন, জমিন থেকে আসমানে যান। হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে, হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর ছয়শ' ডানা রয়েছে।

এবনে হাব্বানের বর্ণনা হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহার নিকট জীব্রাঈলকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছি, তাঁর ডানা থেকে মুক্তা ও ইয়াকুত ঝরে পড়ছিল।

আর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি জীব্রাঈলকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছি, তাঁর ছয়শ' ডানা ছিল।

ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে পবিত্র, আল্লাহ্ পাকের জিকরই তাদের খাদ্য, পানাহারের প্রয়োজন থেকে তারা মুক্ত, তাদেরকে নূর দ্বারা তৈরী করা হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ সমূহ পালন করাই তাদের কাজ। আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই তাদের বৈশিষ্ট্য।

নবী রসূলগণের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছানো তাদের দায়িত্ব। পবিত্র কোরআনে ও হাদীস শরীফে ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।

يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

'তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

অর্থাৎ তাদের এ ডানা বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারিত নেই, আল্লাহ পাক তাঁর মর্জি মোতাবেক তা বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সর্বত্র তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিই কার্যকর হয়। কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পরাক্রমশালী।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি শবে মে'রাজে জীব্রাঈল (আঃ)-কে দেখেছি, তার ছয়শ' ডানা ছিল। আর প্রত্যেক দু' ডানার মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, যার জন্যে ইচ্ছা তার গুণাবলী বাড়িয়ে দেন, আর যার জন্যে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। আর যে সৃষ্টিকে তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক দায়িত্ব অর্পণ করেন। অতএব, ফেরেশতাগণ দেবদেবী নয়, পূজনীয় নয়, তারা আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত সৃষ্টি।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন ঃ ফেরেশতাগণ অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। মানুষের পক্ষে অদৃশ্য জগতের কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে যা কিছু জানানো হয়, অদৃশ্য জগত সম্পর্কে মানুষ ততটুকুই জানে। ফেরেশতাদের যে ডানার কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, তার প্রকৃত রূপ কি? মানুষ তা জানেনা, আর এ ডানাকে পাখির ডানার মত মনে করাও সঠিক নয়। এসব কিছুর প্রকৃত এলম একমাত্র আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী তাঁর মর্জি মোতাবেক বাড়িয়ে দেন। আর সে গুণাবলী আকৃতিতেও হতে পারে, প্রকৃতিতেও হতে পারে। চেহারার সৌন্দর্য, মধুর কণ্ঠ অথবা জ্ঞান বুদ্ধির বৃদ্ধিও হতে পারে। ইমাম জুহরী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা চেহারার সৌন্দর্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৭১

আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা চক্ষুর সৌন্দর্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা বুদ্ধি জ্ঞান বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর দ্বারা বিশেষ কোন গুণ নিদৃষ্ট হয়নি; বরং আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা এবং যে গুণ ইচ্ছা বাড়িয়ে দেন, এটি সম্পূর্ণ তাঁর মর্জির ব্যাপার।

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ ۢ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'আল্লাহ পাক কোন মানুষের জন্যে কোন প্রকার রহমতের দ্বার যদি খুলে দেন, তবে তা বন্ধ করার সাধ্য কারো নেই। তেমনি তিনি নিজেই কারো প্রতি তাঁর রহমতের দ্বার বন্ধ করে দেন, তবে তা খুলে দেয়ার সাধ্য কারো নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি কোন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতির প্রতি কোন প্রকার নেয়ামতের দ্বার খুলে দেন, সে নেয়ামত পার্থিব জগতেরও হতে পারে, যেমন বৃষ্টি, রুজি-রোজগার, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রভৃতি। এমনিভাবে, আখেরাতের নেয়ামতও হতে পারে যেমন দ্বীনি এলম, ঈমান, হেদায়েত এবং যাবতীয় নেক আমলের তৌফিক। যদি আল্লাহ পাক দয়া করে এসব নেয়ামত কোন ব্যক্তিকে দান করেন, তবে তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারোর নেই।

পক্ষান্তরে, দুনিয়া বা আখেরাতের কোন নেয়ামত যদি আল্লাহ পাক কারো জন্যে বন্ধ করে দেন, তবে তা খুলে দেয়ার ক্ষমতাও কারো নেই। নেয়ামত দেয়া এবং বন্ধ করা– সবই আল্লাহ পাকের নিজের মর্জি এবং হেকমতের উপর নির্ভর করে। সকল রহমত ও নেয়ামতের ভান্ডার এক আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে বঞ্চিত করেন। অতএব, আশা শুধু আল্লাহ পাকের দরবারে এবং ভরসা শুধু তাঁর প্রতিই হতে হবে। আর শুধু আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী করতে হবে এবং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই নেক আমল করতে হবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন ঃ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, কেননা আলোচ্য আয়াতে রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রহমতের দ্বার রুদ্ধ হবার কথা পরে বলা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৩

এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক কোন মানুষের জন্যে রহমতের দ্বার খুলে দিলে তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ্ পাক নিজেই কারো জন্যে রহমতের দ্বার বন্ধ করে দেন, তবে তা খুলে দেয়ার সাধ্যও কারো নেই। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের মর্জির ব্যাপার।

এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক যদি কারো কল্যাণ সাধন করতে চান তবে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা। আর তিনি নিজেই যদি কাউকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা করেন তবে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক যদি রহমতের বৃষ্টি দান করতে চান তবে কেউ তা প্রতিহত করতে পারেনা, কিন্তু তিনি স্বয়ং যদি কারো প্রতি রহমতের বৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন, তবে কেউ তা দিতে পারেনা।

এবনে আবি হাতেম এবনে ওহাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ যে রাতে বৃষ্টি হতো, তার পরদিন সকালে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করতেন।[১]

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, العزيز। অর্থ পরাক্রমশালী, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। কেউ তাঁর ইচ্ছাকে বাধা দিতে সক্ষম নয়। الحكيم। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই রয়েছে গভীর রহস্য এবং মহৎ উদ্দেশ্য। বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে হযরত মুগীরা এবনে শো'বা (রাঃ) বলেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পর এ দোয়া পাঠ করতেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد

'আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা সমূহ তাঁরই। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি যা দান

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৫

কর তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই এবং তুমি যাতে বাধা দাও তা দান করার কেউ নেই। তোমার ক্ষমতার মোকাবেলায় কারো ক্ষমতা কোন কাজে আসে না'।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ط

'হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের যে নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকই তোমাদের জন্যে জমিনকে বিছানারূপে প্রসারিত করেছেন, আকাশকে বিনা খুঁটিতে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করেছেন, তোমাদের জন্যে রিয্‌কের এমন এক দরজা খুলে দিয়েছেন যা কেউ বন্ধ করতে পারে না।

একথার তাৎপর্য হলো, হে মানব জাতি! তোমরা লক্ষ্য করেছ সমস্ত নেয়ামত এবং রহমতের ভান্ডার এক আল্লাহ্ পাকের হাতেই রয়েছে। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতকে স্মরণ কর যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। আর মহান দাতা আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর আদায় কর। তিনিই তোমাদেরকে দান করেছেন তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের জীবন-জীবিকা। তিনি তোমাদের জীবনের যথাসর্বস্ব দান করেছেন, তাঁর মা'রেফাত হাসিল কর। ভেবে দেখ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন স্রষ্টা আছে কি? যে তোমাদেরকে আসমান জমিন থেকে রিয্‌ক দিতে পারে? তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط

'আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন স্রষ্টা আছে কি? যে আসমান জমিন থেকে তোমাদেরকে রিয্‌ক দিতে পারে'?

তথা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে? জমিন থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে পারে?

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

'আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই তবু তোমরা কোথায় ফিরে যাও'?

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকই স্রষ্টা, তিনিই রিয্‌ক দাতা, তিনি যথা সর্বস্বের অধিকর্তা। এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যের বন্দেগী কর কোন্ যুক্তিতে? তোমাদের সৃষ্টিতে বা জীবন-জীবিকায় যখন কারো কোন অধিকার নেই তখন তোমাদের বন্দেগীতে তারা অংশীদার হবে কোন্ কারণে? অতএব ভেবে দেখ, তোমরা কোথায় ফিরে যাও?

আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআন বিশ্ব গ্রন্থ, পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী। সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পিত হয়েছে। তিনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, হেদায়েত পেতে হলে শুধু তাঁর আদর্শই গ্রহণ করতে হবে।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ
اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ
عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

তরজমা

(৪) (হে নবী!) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে (তবে তা নতুন কিছু নয়), ইতোপূর্বেও রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছিল, আর আল্লাহ পাকের নিকটই সব কিছু উপস্থাপিত হবে।

(৫) হে মানব জাতি! নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য, অতএব, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে না রাখে।

(৬) নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব, তোমরা তাকে শত্রুই মনে করতে থাক। সে তার দলবলকে এজন্যে ডাকে যেন তারা সকলে দোযখবাসী হয়।

(৭) যারা কাফের হয়েছে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি, আর যারা ঈমানদার হয়েছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার।

(৮) তবে কি এমন ব্যক্তি যার মন্দ কাজ তাকে শোভন করে দেখানো হয়েছে, আর সে ঐ কাজকে উত্তম বলে মনে করে, (আর যে ব্যক্তি মন্দকে মন্দ বলে জানে,

তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে?) বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট থাকতে দেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন। অতএব, তাদের প্রতি আক্ষেপ করে যেন আপনার প্রাণ ধ্বংস না হয়। তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, (হে রসূল!) কাফেররা যদিও আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, তৌহিদের আহবানে সাড়া দেয়নি এবং আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না, কেননা ইতোপূর্বেও নবী রসূলগণের সঙ্গে এ দূরাত্ম কাফেররা অনুরূপ আচরণই করেছে, তাঁদেরকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। (হে রসূল!) কোরায়শসহ মক্কাবাসী কাফেররা আপনার প্রতি যে জুলুম অত্যাচার করছে তার প্রতি আপনি সবর করুন, চিন্তিত হবেন না, নবী রসূল মাত্রকেই যুগে যুগে দূরাত্মা কাফেরদের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং তাঁরা ঐ পরিস্থিতিতে সবর অবলম্বন করেছে, এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদেরকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন। যারা তৌহিদ, রেসালত এবং কেয়ামতের কথা এত করে বোঝানো সত্ত্বেও সরল-সঠিক পথে আসেনা, তৌহিদের প্রতি বিশ্বাসী হয়না, আপনার রেসালতকে অস্বীকার করে তাদের বিষয় স্বয়ং আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দিন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক যথা সময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

'আর আল্লাহ পাকের নিকটই সব কিছু উপস্থাপিত হবে'। তিনিই আপনাকে সবরের বদলা দান করবেন এবং দূরাত্মা কাফেরদের শাস্তি বিধান করবেন। (হে রসূল!) আপনার কাজ হলো তাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া। যেমন সূরা রাদের একটি আয়াতাংশে রয়েছে ঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

(সূরা রা'দ ঃ ১৩ ঃ ৪০)

'আপনার কর্তব্য তো শুধু আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া, আর হিসাব নিকাশ তো আমার কাজ'।

অতএব, (হে রসূল!) কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না। অবশেষে তাদের সকলকে আমার নিকট হাযির করা হবে। তাদের অপরাধ অমার্জনীয়, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত।

এরপর সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

'হে মানব জাতি! নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য, অতএব দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোকায় ফেলে না রাখে'।

অর্থাৎ কেয়ামত এবং আখেরাত সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ওয়াদা ধ্রুব সত্য, অবশেষে প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে।

যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন এবং যত সুরক্ষিত ইমারতে আত্মরক্ষা কর না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাবে'।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا

(সূরা বাকারা-১৪৮)

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে হাযির করবেন'।

অতএব, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া-মোহ, আরাম-আয়েশ এবং আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে আখেরাতকে ভুলে যেওনা, কেননা অবশেষে দুনিয়ার এ জীবনের অবসান ঘটবে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী শুরু হবে আর ঐ জীবনের সম্বল এ জীবনেই সংগ্রহ করতে হবে। অতএব, ইবলিস শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং তার প্রতারণায় পড়ে তোমরা যেন পাপাচারে লিপ্ত না হও।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে আবি হাতেম তফসীরকার এবনে যোবায়ের (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দুনিয়ার জিন্দেগীর ধোকা হলো আখেরাতের জিন্দেগীকে ভুলে যাওয়া, এজন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করা, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ থাকা, আর দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্রব্য-সমাগ্রী সংগ্রহে সর্বদা ব্যস্ত থাকা। আর আল্লাহ পাকের ব্যাপারে প্রতারিত হবার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের নাফরমানী তথা পাপাচারে লিপ্ত থেকে আশা করা যে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেবেন। এজন্যে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ 'প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ধোকায় ফেলে না রাখে'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক কোন পাপাচারীকে তাঁর অসীম দয়ার কারণে অপরাধের সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়াও করেন না; বরং অবকাশ দিয়ে থাকেন, এ সুযোগে ইবলিস শয়তান মানুষকে ধোকা দেয় যে, 'যত গুনাহই থাকুক না কেন আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন'। এভাবে প্রতারণা করে ইবলিস শয়তান মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত রাখে। পরবর্তী আয়াতে এজন্যে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় শয়তান থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব, তোমরা তাকে শত্রুই মনে করতে থাক'।

শয়তানের এ শত্রুতা বহু পুরনো। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে, তাই তোমরা আল্লাহ পাকের অনুগত থাক, শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা কর। শয়তান মানুষকে যে আহবান জানায় তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন দুনিয়ার জীবনে পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং দোযখী হয়। মানুষকে দোযখের শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যেই তার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, এটিই তার শত্রুতা।[১]

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط

'যারা কাফের হয়েছে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর যারা ঈমানদার হয়েছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার'।

পূর্ববর্তী আয়াতে ইবলিস শয়তান সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে যে, ইবলিস শয়তান হলো তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রুই মনে কর, শত্রু হিসেবে ব্যবহার কর, তার প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা কর, কোন বুদ্ধিমান লোকই শত্রুর অনুগামী হয় না, অতএব তোমরাও তোমাদের শত্রুর প্ররোচনায় নিজেকে ধ্বংস করোনা, কেননা তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো মানুষকে দোযখবাসী করা।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৬

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা ইবলিসের অনুগামী হবে, কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হবে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি। আর যারা শয়তানের সকল ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেয়, চিরশত্রু ইবলিশ শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে আর সে ঈমানের দাবী মোতাবেক নেক আমল করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার।

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًاۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ

'তবে কি এমন ব্যক্তি যার মন্দ কাজ তাকে শোভন করে দেখানো হয়েছে, আর সে ঐ কাজকে উত্তম বলে মনে করেছে। (আর যে ব্যক্তি মন্দকে মন্দ বলে জানে তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে?) বস্তুতঃ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট থাকতে দেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন'।

এ আয়াতে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্যের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, শয়তান যার চোখে কুফর শেরক তথা যাবতীয় মন্দ কাজকে সুন্দর করে দেখায়, আর ঐ ব্যক্তিও এ জঘন্য অপরাধকে উত্তম কাজ বলে মনে করে, আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভাল-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে তফাত করার তৌফিক দিয়েছেন, উভয়ে কি সমান হতে পারে? কখনও নয়, আলো আঁধার যেমন এক সমান হতে পারে না, অন্ধ ও চক্ষুস্মান যেমন এক সমান হতে পারেনা ঠিক তেমনি হক্বপন্থী ও বাতিল পন্থীও এক সমান হতে পারে না। তাই তাদের পরিণামও এক হবেনা। যার মনকে ইবলীস শয়তান ছিনতাই করে নিয়ে গেছে, যে ন্যায়কে অন্যায় এবং বাতিলকে হক্ব মনে করে এমন লোক সে ব্যক্তির ন্যায় কখনও হতে পারেনা, যাকে শয়তান ধোকা দিতে পারেনি, যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত গ্রহণ করেছে।

فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট থাকতে দেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন'।

যে ভালকে মন্দ মনে করে, যে শয়তানের প্রতারণায় গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তার সম্মুখে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা এবং বিশ্বনবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত রাখা হলেও সে তা গ্রহণ করেনা।

মক্কার কাফেররা এজন্যেই প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত কবুল করেনি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ط

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

'অতএব, (হে রসূল!) কাফেরদের প্রতি আক্ষেপ করে যেন আপনার প্রাণ ধ্বংস না হয়' অর্থাৎ এ কাফেরদের হেদায়েতের কোন আশা নেই। অতএব, তাদের জন্যে আক্ষেপ করবেন না, ব্যথিত হবেন না। মক্কার কাফেরদের গোমরাহীর কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বেশী আক্ষেপ করতেন। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) এ কাফেরদের জন্যে আপনি আক্ষেপ করবেন না, তারা হতভাগা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু জেহেল সহ অন্যান্য কাফেরদের সম্পর্কে।

যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করেছিলেন, "ওমর এবনুল খাত্তাব অথবা আবু জেহেল এবনে হেশামের ঈমান আনয়নের তৌফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন", তখন আল্লাহ পাক হযরত ওমর (রাঃ)-কে ঈমান আনয়নের তৌফিক দান করেন, আবু জেহেল বঞ্চিত হয়। ঐ সময় এ আয়াত নাযিল হয়।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আহলে বেদাত তথা বাতিল পন্থীদের সম্পর্কে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, বাতিল পন্থীদের মধ্যে খারেজী ফেরকাও রয়েছে যারা মুসলমানদের হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা হালাল মনে করতো।[১]

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

অতএব, এ অপরাধীদেরকে তিনি যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৯৫-৯৬

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এ আয়াত দ্বার একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে ছিল অত্যন্ত দরদ, মায়া, তাই তিনি তাঁর প্রাণের শত্রুদের হেদায়েতের জন্যেও থাকতেন অত্যন্ত ব্যাকুল, কেননা তিনি ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন, সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে তিনি আগমন করছেন রহমত স্বরূপ, তাই তাঁর অন্তরে ছিল সকলের জন্যে অশেষ দয়া মায়া।[১]

وَاللّٰهُ الَّذِىٓ اَرْسَلَ
الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝٩ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ
وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ
هُوَ يَبُوْرُ ۝١٠ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ
اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ
مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝١١

তরফমা

(৯) আর আল্লাহ পাকই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালন করেন, এরপর আমি তা নির্জীব ভূখন্ডের দিকে পরিচালনা করি। পরে আমি তা দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি। এভাবেই হবে পুনরুত্থান।

(১০) যে ব্যক্তি ইজ্জত সম্মান চায়, (তার জানা উচিত) যাবতীয় ইজ্জত মূলতঃ আল্লাহ পাকের জন্যেই, উত্তম বাক্য তাঁর মহান দরবারেই উত্থিত হয়, (তিনিই কবুল করেন) আর নেক আমল তাকে উঁচু করে থাকে। আর (হে রসূল!) যারা আপনার বিরুদ্ধে) জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।

(১১) আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন, এরপর শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া (নারী ও

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৭৩

পুরুষ), কোন নারী আল্লাহ পাকের অজ্ঞাতসারে গর্ভ ধারণ করেনা এবং প্রসবও করেনা। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন লাভ করা এবং কারো আয়ু কমে যাওয়া এসব কিছুই কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয় তা আল্লাহ পাকের পক্ষে সহজ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহিদের কথা ছিল। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ এসব দৃষ্টান্ত সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের অসীম নিদর্শন দেখে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং পরকালীন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেকই দূরন্ত বাতাস প্রবাহিত হয়, আর তা মেঘমালাকে বহন করে আনে এবং নির্জীব, প্রাণহীন, শুস্ক ভূমিতে বারিপাত করে তাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে এবং তাকে ফলে-ফুলে-তরুলতায় পরিপূণ করে রাখে। এসব মহান আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি-নৈপূণ্যের বিস্ময়কর নমুনা। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ

'আর আল্লাহ পাকই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালন করেন। এরপর আমি তাকে নির্জীব ভূখন্ডের দিকে পরিচালনা করি, এরপর আমি তা দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি। এভাবেই হবে পুনরুত্থান'।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করি বায়ু প্রবাহিত হয়, আর তা দুর্বহ মেঘমালাকে বহন করে আনে। আর তা একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এসব কিছু এক পবিত্র সত্ত্বারই কাজ, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দেন, ফলে মৃত শুস্ক নীরস ভূমি জীবন-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পুনরুত্থানের প্রমাণ

ঠিক এভাবেই মৃত মানুষকে আল্লাহ পাক পুনরায় জীবিত করবেন এবং কেয়ামতের দিন বিচারের জন্যে সকলকে সমবেত করবেন, নিঃসন্দেহে এটি তাঁর জন্যে অতি সহজ কাজ।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মানুষকে কিভাবে পুনর্জীবন দান করা হবে তার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতে। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। এই হাদীসে কেয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থানের বিবরণ স্থান পেয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ্ পাক শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যার স্পর্শ মাত্র মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে (যেমন কোন শুষ্ক ভূখন্ডে বৃষ্টিপাতের পর তাতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, আর ঐ মৃত জমীন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে)।

আবুশ শায়েখ 'আল আজমাতে' ওয়াহাব (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন আসমান থেকে বৃষ্টির ন্যায় একটা কিছু বর্ষিত হবে, তখন মানুষ এভাবে বের হয়ে আসবে যেভাবে মাটির ভেতর থেকে উদ্ভিদ বের হয়ে আসে। এরপর আল্লাহ্ পাক মোমেনদের রুহ্ সমূহকে জান্নাত থেকে এবং কাফেরদের রুহগুলোকে দোযখ থেকে বের করে একত্রিত করবেন। যাতে করে তাদেরকে মানবাকৃতি দান করা হয়, এ সময় আল্লাহ্ পাকের হুকুমে ইস্রাফিল শিংগায় ফুঁক দেবেন, তখন প্রত্যেক রুহ তার নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করবে। (আল হাদীস)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ ইস্রাফিলের দু' বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার মধ্যে 'চল্লিশ' ব্যবধান হবে। উপস্থিত লোকেরা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চল্লিশ দিনের পার্থক্য হবে'? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি তা অস্বীকার করি'। এরপর লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তাহলে কি চল্লিশ বছরের পার্থক্য হবে'? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, 'আমি তা-ও বলিনা' (অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'আরবাঈন' বা চল্লিশ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, দিন বা বছর নির্দিষ্ট করেননি, তাই তিনিও তা নির্দিষ্ট করতে চাননি)। এরপর আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তখন উদ্ভিদ উৎপন্ন হবার ন্যায় মানুষ মাটির ভেতর থেকে বের হয়ে আসবে। শুধু মানব দেহের একটি হাড় (মেরুদন্ড) অবশিষ্ট থাকবে, এতদ্ব্যতীত আর সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কেয়ামতের দিন ঐ হাড় থেকেই পুনরায় মানব দেহ তেরী করা হবে।

আবদুল্লাহ্ এবনে মোবারক (রঃ) সোলায়মান (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কবর থেকে পুনরুত্থানের পূর্বে ৪০ দিন পর্যন্ত এক প্রকার ঘন বৃষ্টিপাত হবে।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইস্রাফিলের শিংগায় দু' বার ফুঁক দেয়ার মাঝে মহান আরশের বুনিয়াদ থেকে একটি পানির নহর জারি হবে। আর ইস্রাফীলের দু' বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার

মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান থাকবে। ঐ নহরের পানি দ্বারা মানব দেহ উদ্ভিদের ন্যায় বের হয়ে আসবে। এরপর রুহগুলোকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর সেগুলো নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করবে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত আবু রাজিন (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করেছিলেন, 'আল্লাহ পাক কিভাবে মৃতদেরকে জীবিত করবেন'? 'আর সৃষ্টি জগতে তার কি কোন দৃষ্টান্ত রয়েছে'? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'হে আবু রাজিন! তুমি কি তোমার বাসস্থানের চতুর্দিকে কখনও মৃত শুস্ক জমীন দেখনি'? 'এরপর যখন তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করেছ সেখানে দেখেছ সবুজের মেলা'। তখন হযরত আবু রাজিন (রাঃ) জবাবে আরজ করলেন, 'হ্যাঁ', অনেক সময় এমনটি দেখেছি'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'এভাবেই আল্লাহ পাক মৃতদেরকে জীবিত করবেন'।[২]

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ط

ইজ্জত সম্মানের প্রতিভূ একমাত্র আল্লাহ পাক

যে ইজ্জত সম্মান চায় (তার জানা উচিত যে), দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের ইজ্জত সম্মান শুধু আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্যের মাধ্যমেই ইজ্জত পাওয়া যেতে পারে।

মূলতঃ মানুষের অন্তরে সম্মান লাভের লোভ জাগ্রত থাকে, আর এ লোভই ক্ষেত্র বিশেষে সত্য গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পথে এটি একটি বাধা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কাফেররা এ বাধার কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি, কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো, যে জানতে চায় যে, সম্মান কার জন্যে? তার জানা উচিত যে, সমস্ত ইজ্জত সম্মান এক আল্লাহ পাকের জন্যেই, অতএব যে ইজ্জত পেতে চায় তাকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারেই তা চাওয়া উচিত এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত, কেননা ইজ্জত সম্মানের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাকই, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৯৬-৯৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৭২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৬

কাফেররা মূর্তি পূজার মাধ্যমেও ইজ্জত প্রার্থী ছিল, যেমন আল্লাহ পাক কাফেরদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا

(সূরা মরয়ম; আয়াত ঃ ৮১)

'তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য গ্রহণ করেছে, যেন তা তাদের জন্যে সম্মানের কারণ হয়। আর মুনাফেকরাও কাফেরদের দৃষ্টিতে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতো, তাই মুনাফেকদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

(সূরা নেসা; আয়াত ঃ ১৩৯)

'মুনাফেকরা কি কাফেরদের নিকট ইজ্জত সম্মান চায়? অথচ সমস্ত ইজ্জত আল্লাহ পাকেরই হাতে রয়েছে'।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, পৃথিবীতে ইজ্জত সম্মান তৌহিদের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

অথচ ইজ্জত সম্মানের লোভেই অনেকে মুসলমানদের স্থলে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, যেমন কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণা ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ

(সূরা নেসা)

'যারা মুসলমানদের স্থলে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা কাফেরদের নিকট ইজ্জত সম্মান কামনা করে'। এ প্রকার সম্মান-কাঙ্গালদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যদি ইজ্জত সম্মানই তোমাদের কাম্য হয় তবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারেই তা কামনা কর, কেননা আল্লাহ পাকের মহান দরবারেই রয়েছে ইজ্জত-সম্মানের মূল উৎস। আল্লাহ পাকের দরবার ব্যতীত ইজ্জত সম্মান কোথাও নেই, এ পৃথিবীতে যারা সম্মান পেয়েছে, তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকেই তা পেয়েছে।

এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'ইজ্জত আল্লাহ পাকের জন্যেই, আর তাঁর রসূলের জন্যে এবং মোমেনদের জন্যে কিন্তু মুনাফেকরা তা জানেনা'।

হযরত মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মূর্তিপূজায়, পৌত্তলিকতায় সম্মান নেই, কেননা ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক। এজন্যে তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ইজ্জত সম্মান কামনা করে, তার কর্তব্য হলো, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে মশগুল থাকা।

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

'উত্তম বাক্য তাঁর মহান দরবারেই উত্থিত হয়'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে الطيب الكم। দ্বারা 'সোবহানাল্লাহ', 'ওয়ালহামদুলিল্লাহ', 'ওয়াল্লাহু আকবর', 'তাবারাকাল্লাহু' বাক্য সমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে উত্থিত হবার অর্থ হলো কবুল হওয়া। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

অথবা এ বাক্যগুলো উত্থিত হবার অর্থ হলো, এ বাক্যগুলো লিপিবদ্ধ করে ফেরেশতাদের উর্দ্ধ জগতে গমন করা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এ পাঁচটি বাক্য সোবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর, ওয়া তাবারাকাল্লাহু পাঠ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে একজন ফেরেশতা এ বাক্যগুলোকে তার ডানার ভেতরে গোপন করে উর্দ্ধ-জগতের দিকে চলে যায়। ফেরেশতাদের যে দলের পার্শ্ব দিয়ে সে অতিক্রম করে, তখন তারা এর পাঠকের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে। অবশেষে ঐ ফেরেশতা আল্লাহ পাকের দরবারে এ বাক্যগুলো পেশ করে। (বগভী, হাকেম)

এবনে মরদবিয়া এবং সা'লাবী এই হাদীসকে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

হযরত কা'ব আহবার (রঃ) বর্ণনা করেন, সোবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর আল্লাহ পাকের মহান আরশের চারিপার্শ্বে মধু মক্ষিকার শব্দের ন্যায় আওয়াজ দেয় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে এ বাক্যগুলোর পাঠকের উল্লেখ করতে থাকে।

মসনদে আহমদে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে তাঁর হামদ ও প্রশংসা করে এবং তাঁর একত্ববাদের কথা বলতে থাকে, অর্থাৎ এ বাক্যগুলো

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৯৮

পাঠ করতে থাকে, এ বাক্যগুলো আল্লাহ পাকের দরবারে ঐ ব্যক্তির উল্লেখ করতে থাকে। তোমরা কি জাননা কেউ না কেউ তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে তোমাদের উল্লেখ করতে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আয়াতে 'পবিত্র কলেমার' উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের জিকর এবং 'আমলে সালেহে'র উদ্দেশ্য হলো ফরজ আদায় করা। আর ঐ নেক আমল তার জিকরকে উপরের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু যে আল্লাহ পাকের জিকর করে অথচ ফরজ আদায় করেনা, তার জিকর তার আমলের দিকে ফেরত দেয়া হয়। তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

'আর নেক আমল তাকে উঁচু করে থাকে'।

তফসীরকার কালবী এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, নেক আমল তৌহিদের বাক্যগুলো কবুল করার কারণ হয়। যদি নেক আমলের ভিত্তি তৌহিদ না হয়, তবে আল্লাহ পাকের দরবারে নেক আমল কবুল হয় না।

সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ বলেছেন, এর অর্থ হলো, যে নেক আমল শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় তা আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়। জিকর হোক বা আমল হোক কবুল হওয়ার জন্যে 'এখলাস' বা নিয়ত সঠিক হওয়া পূর্বশর্ত।

ইয়াস এবনে মাবিয়া কাজী (রঃ) বর্ণনা করেন, যদি নেক আমল না থাকে, তবে কলেমায়ে তৈয়্যেবা উপরে উত্থিত হয় না।

হাসান এবং কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন, নেক আমল ব্যতীত শুধু কথা যথেষ্ট নয়।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাকের দরবারে ইজ্জত সম্মান লাভের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। আর সে পথ হলো আল্লাহ পাকের জিকর এবং নেক আমল অর্থাৎ কথা এবং কাজে আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রকাশ করা হলে আল্লাহ পাকের দরবারে ইজ্জত লাভ করা যায়।

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

অর্থাৎ 'ভাল কথা ভাল কাজকে উঁচু করে দেয়'।

আর কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন এভাবেঃ আল্লাহ পাকই ভাল কথা এবং ভাল কাজকে উন্নীত করে থাকেন।

অতএব, জিকরে এলাহী, দোয়া, তেলাওয়াত কোরআন, মানুষকে উপদেশ নসীহত করা, ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, তসবীহ তাহলীল

করা, দরুদ শরীফ পাঠ করা, ফরজ ওয়াজিব সুন্নত যথানিয়মে আদায় করা- এসবই নেক আমল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, আমল ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে ঈমান কবুল হয় না; কেননা হযরত ওবাদাহ এবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি একমাত্র উপাস্য বা মা'বুদ, তাঁর কোন শরীক নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের বন্দা এবং রসূল, আর ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের বন্দা এবং রসূল এবং আল্লাহ পাকের বান্দীর পুত্র। আর সে একথাও সাক্ষ্য দেয় যে জান্নাত সত্য এবং দোযখ সত্য, তবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন', আমল যাই হোক। আয়াতের অর্থ হল কলেমায়ে তৈয়্যেবা আল্লাহ পাকের নিকট উত্থিত হয়, অর্থাৎ দরবারে এলাহীতে কবুল হয়, যদি কলেমায়ে তৈয়্যেবার সাথে নেক আমল থাকে তবে কলেমার শান উঁচু হয়, সওয়াব বৃদ্ধি পায়।

আর যে হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ নেক আমল ব্যতীত কলেমা কবুল হয়না, এর অর্থ হল, মুনাফেকদের মৌখিক কথার কোন দাম নেই, যখন তাদের আমলও কথার বিরোধী হয়। আর যে আমল এখলাস ব্যতীত হয়, অর্থাৎ সঠিক নিয়ত ব্যতীত হয়, তা-ও কবুল হয় না।

وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ

'আর (হে রসূল!) আপনার বিরুদ্ধে যারা জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয় তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি আর তাদের ষড়যন্ত্র অবশ্যই বানচাল হবে'।

অর্থাৎ যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তথা সত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, একদিকে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, অন্যদিকে তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।

এখানে যে কথাটি স্মরণযোগ্য তা হল, মক্কার কোরায়শরা সুদীর্ঘ তেরটি বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে, এমনকি তাঁকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বদরের যুদ্ধের দিন তাদের কঠিন শাস্তি হয়েছে।

তফসীরকার আবুল আলীয়া (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা হল, মক্কার কাফেররা 'দারুন নদওয়াতে' বসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, যা আল্লাহ পাক ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯

বদরের যুদ্ধে যখন তাদের তথাকথিত নেতারা নিহত হল এবং তাদের সত্তরজন বন্দী হল, তখন কাফেরদের মেরুদন্ড চিরদিনের জন্যে ভেঙে গেল।

তফসীরকার মুজাহেদ এবং শাহর এবনে হাওসাব বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল, যারা লোক দেখানোর জন্যে সুকৌশলে কাজ করে আল্লাহ্ পাক তাদের এ কাজ ব্যর্থ করে দেবেন, কেননা তিনি সবার মনের খবর রাখেন।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ

'আর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন, এরপর শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া (নারী ও পুরুষ), কোন নারী আল্লাহ্ পাকের অজ্ঞাতসারে গর্ভ ধারণ করেনা এবং প্রসবও করেনা'।

এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাক তৌহিদের দলিল পেশ করে এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের আদি পিতা আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর সমগ্র মানব জাতিকে শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ নারী পুরুষ করে তৈরী করেছেন। একটি নবজাত শিশুর প্রসব পর্যন্ত সকল অবস্থাই আল্লাহ্ পাকের জানা রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। কারো দীর্ঘ জীবন লাভ করা আর কারো আয়ু কম হওয়া–এসবই 'লওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ রয়েছেন।

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ

কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন লাভ করা, কারো আয়ু কম হয়ে যাওয়া এসব কিছুই কিতাবে অর্থাৎ 'লওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তফসীরকার সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, উম্মুল কেতাব তথা 'লওহে মাহফুজে' প্রত্যেকটি মানুষের বয়স লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কারো বয়সে কম বেশী করা হয়না, তবে 'লওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ করার পূর্বে এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, 'অমুক ব্যক্তির এত বয়স হবে তবে এ নেকীর বদৌলতে তার বয়স বাড়িয়ে দেয়া হবে' অথবা তার কোন গুনাহর কারণে বয়স কমিয়ে দেয়া হবে। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ দোয়া ব্যতীত কোন কিছুই তকদীরকে পরিবর্তন করতে পারেনা। আর মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ব্যতীত আর কোন কিছুই বয়স বৃদ্ধির কারণ হয় না। হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

অর্থাৎ বয়সের কমবেশী হওয়া আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তকদীরেই থাকে। আর 'লওহে মাহফুজে' সব কিছু লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ পাকের পক্ষে খুবই সহজ। মানব সৃষ্টির ছোট বড়, সূক্ষ্ম বৃহৎ সব কিছুই আল্লাহ পাক জানেন, সবই 'লওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যেভাবে মানুষ সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে, এভাবে ইসলামেরও ক্রমোন্নতি হবে, আলোচ্য আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَ
هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ
حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ
فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ
فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا
يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ
سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾

তরজমা

(১২) আর দু'টি সাগর সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট এবং সুপেয়, আর অপরটির পানি লোনা, বিস্বাদ, প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা টাটকা গোশ্‌ত খাও এবং এমন সব অলংকার বের কর, যা তোমরা পরিধান করে থাক, আর তুমি দেখতে পাবে সমুদ্র বক্ষ চিরে জাহাজগুলো চলাচল করে, যাতে করে তোমরা আল্লাহ পাকের দান অনুসন্ধান করতে পার এবং হয়ত তোমরা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবে।

(১৩) তিনিই রাতকে দিনে আর দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান। আর তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিযুক্ত করে রেখেছেন, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে চলেছে এক নিদৃষ্টকাল পর্যন্ত। তিনি আল্লাহ! তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব শুধু তাঁরই, আর তোমরা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তারা একটি খেজুর বীচির খোসার পরিমাণেরও মালিক নয়।

(১৪) যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তবে তারা তোমাদের ডাক শ্রবণ করেনা, আর যদি শ্রবণও করে তবে তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেনা। আর কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শেরকী কাজকে অস্বীকার করবে। আর (হে রসূল!) (যিনি) সর্বজ্ঞ, তাঁর ন্যায় কেউ আপনাকে অবহিত করতে পারেনা।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তৌহিদের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি নিদের্শন উপস্থাপন করেছেন, যেমনঃ

১. দু'টি সাগর, কিন্তু একটির পানি সুমিষ্ট এবং সুপেয়, আর অপরটির পানি লোনা এবং বিস্বাদ। এ পার্থক্য আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতের এক জীবন্ত নিদর্শন। তদুপরি হে মানব জাতি! উভয় সাগর থেকেই তোমরা টাটকা গোশ্‌ত ভক্ষণ কর তথা তাজা মাছ খাও। এটি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত। এর মধ্যে তিনি তোমাদের জন্যে রিয্‌ক রেখেছেন।

২. এ সাগর থেকে তোমরা মণি-মুক্তা এবং অলংকার বের করে আন, যা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে তোমরা পরিধান করে থাক। এটিও আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতের নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এতে মোমেন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে সাগরের পানি 'পানি' হিসেবে একই বস্তু, কিন্তু একটি সুমিষ্ট এবং সুপেয় এবং অপরটি লোনা এবং বিস্বাদ, তেমনি দু' ব্যক্তির মধ্যে একজন ঈমানের নেয়ামতে সমৃদ্ধ এবং সে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ঈমানের কারণে প্রিয় এবং পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে, অপর ব্যক্তি কুফরী ও নাফরমানীর কারণে অপ্রিয়, অপছন্দনীয়।

৩. আরো লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, উভয় প্রকার সাগর থেকে তোমরা তোমাদের সুস্বাদু, তাজা আহার্য হিসেবে অগণিত রকমারী মাছ সংগ্রহ কর। এটিও আল্লাহ পাকের বিশেষ নিদর্শন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর এক বিরাট নেয়ামত।

৪. সুমিষ্ট পানি দ্বারা তোমরা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর, আর পানির অপর নাম জীবন-তথা সুমিষ্ট পানি দ্বারা তোমরা নিজেদের প্রাণ রক্ষা কর। এর পাশাপাশি লোনা পানিতে সাধারণতঃ মনি-মুক্তা তথা মূল্যবান অলংকার সামগ্রী পাওয়া যায় যা তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার কর। এটিও তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত।

বায়হাকী 'শোয়াবুল ঈমানে' আবু জাফর থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই পানি পান করতেন, তখন একটি দোয়া করতেন ঃ

الحمد لله الذى جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبها

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের, যিনি তাঁর রহমতে এ পানিকে সুমিষ্ট সুপেয় করেছেন, আর আমাদের গুনাহর কারণে তাকে লবনাক্ত এবং বিস্বাদ করেননি।[১]

এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেভাবে দু'টি সাগর 'সাগর' হিসেবে 'পানি' হিসেবে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক প্রকার নয়; বরং উভয় সাগরের মাঝে রয়েছে পার্থক্য, একটি সুমিষ্ট আর অপরটি বিস্বাদ, ঠিক তেমনি মোমেন ও কাফের মানুষ হিসেবে এক আদম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা এবং আল্লাহ্ পাকের এবাদত বন্দেগী করার দিক থেকে মোমেন ও কাফের আদৌ এক নয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন এভাবে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ 'আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যেই সৃষ্টি করেছি'।

কাফেররা যেহেতু সৃষ্টির এ উদ্দেশ্যকে সফল করেনা, তাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মানবতার কল্যাণে, বিশ্ব-স্রষ্টার উদ্দেশ্য সাধনে কাফেরদের কোন ভূমিকাই নেই। যেমন মানুষের তৃষ্ণা নিবারণে লোনা পানির কোন ভূমিকা থাকেনা। ঠিক তেমনি স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনয়নে মানবতার উৎকর্ষ সাধনেও কাফেরদের কোন ভূমিকা নেই।

وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج

'এবং সাগর থেকে এমন সব অলংকার বের কর, যা তোমরা পরিধান করে থাক'। যে সাগরের পানি লবনাক্ত এবং বিস্বাদ সে সাগর থেকেই মণিমুক্তা বের করা হয়, যা দ্বারা তোমাদের অলংকার তৈরী হয়।

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

'আর তুমি দেখতে পাবে সমুদ্র বক্ষ চিরে জাহাজগুলো চলাচল করে, যাতে করে তোমরা আল্লাহ পাকের দান অনুসন্ধান করতে পার এবং হয়তো তোমরা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবে'।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৯

৫. এ আয়াতে আল্লাহ পাকের কুদরতের আরও একটি বিস্ময়কর নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। তোমরা লক্ষ্য কর সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজগুলোর দিকে, এ জাহাজগুলো সমুদ্র বক্ষ চিরে দেশ-দেশান্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমাগ্রী নিয়ে যায়। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলে। হে আত্মভোলা মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের দানের অন্বেষণে দেশ বিদেশে ভ্রমণ কর এবং দু' হাতে আহরণ কর আল্লাহ পাকের দানের মণি মানিক্য, অন্বেষণ কর তোমাদের উপজীবিকা।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

'হয়তো তোমরা আল্লাহ পাকের এ সমস্ত দানের জন্যে তাঁর শোকর আদায় করবে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে'।

সমুদ্রগামী জাহাজের এক বিরাট অবদান রয়েছে আজকের পৃথিবীর ব্যবসা ও বাণিজ্যে। পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে দেড় হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর এ দানের কথা বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতে فضل শব্দটি দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলশ্রুতিতে মানুষ যে ধন-সম্পদ আহরণ করে তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط

'তিনিই রাতকে দিনে আর দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান আর তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিযুক্ত করে রেখেছেন, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে চলেছে এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত'।

৬. অর্থাৎ দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ পাকই রাতকে দিনে দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান। শীতকালে রাত হয় বড়, আর দিন হয় ছোট। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে দিন হয় বড়, রাত হয় ছোট। দিন রাতের সময় চব্বিশ ঘন্টা নিদৃষ্ট। কিন্তু শীতকালে রাতের সময় বৃদ্ধি পায়, আর গ্রীষ্মকালে দিনের সময় বেশী হয়। দিন ও রাতের সময়ের হেরফের হওয়া, এটিও আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর নিদর্শন। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে রাতের অন্ধকার অংশকে দিনে প্রবেশ করান এবং বিশ্বকে আলোকিত করে দেন। আবার কখনও দিনের আলোকময় অংশকে রাতে প্রবেশ করিয়ে তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেন। এসবের মাঝে আল্লাহ পাকের মর্জি ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হয়। তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের নিদর্শনই লক্ষ্য করা যায়।

৭. আল্লাহ পাকের কুদরতের আরো একটি জীবন্ত নিদর্শন হল সূর্য ও চন্দ্র, যা তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে যথা সময়ে, যথা নিয়মে পরিভ্রমণ করে চলেছে। এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের এ পরিভ্রমণ অব্যাহত থাকবে, আর সে নিদৃষ্ট কাল হল কেয়ামত। অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য এভাবে মহাশুণ্যে পরিভ্রমণ করতে থাকবে, যার দ্বারা সৃষ্টির সেরা মানব জাতিই উপকৃত হয়। যেভাবে শীতকালে অন্ধকার প্রাধান্য বিস্তার করে, রাত বড় হয়ে যায়, আবার গ্রীষ্মকালে আলো প্রাধান্য বিস্তার করে, দিন বড় হয়, ঠিক এমনিভাবে পৃথিবীতে সত্য অসত্যের সংগ্রাম, হক্ব ও বাতিলের জেহাদ চিরকাল অব্যাহত থাকবে, কখনও আলো প্রভাব বিস্তার করবে তথা ইসলামের বিজয় লাভ হবে, মুসলমানগণ প্রাধান্য লাভ করবে, আর কখনও কুফরী ও নাফরমানী বেড়ে যাবে, পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ

তিনিই আল্লাহ! তোমাদের প্রতিপালক, তাঁর হাতেই সর্বময় ক্ষমতা, তিনি সার্বভৌমত্বের অধিকারী, বিশ্ব সৃষ্টি তাঁর এক كن আদেশে অস্তিত্ব লাভ করেছে, আর কেয়ামতের পূর্বে আরেক আদেশে লয় হয়ে যাবে, তিনিই একমাত্র মা'বুদ, তিনিই বিশ্ব প্রতিপালক।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ

'আর তোমরা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তারা একটি খেজুর বীচীর খোসার পরিমাণেও মালিক নয়'।

পূর্ববর্তী আয়াতে সর্বশক্তিমান, সর্বগুণে গুণান্বিত, পরাক্রমশালী, করুণাময়, মহিমময় আল্লাহ পাকের কয়েকটি বিস্ময়কর দানের উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছে যে, তিনিই আল্লাহ পাক, একমাত্র উপাস্য, একমাত্র মা'বুদ, সমগ্র সৃষ্টি জগতের একচ্ছত্র অধিপতি।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের স্থলে তোমরা যাদেরকে ডাক, দেব-দেবীর পূজা কর বা আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক কর, তাদের অবস্থা এই যে একটা খেজুরের বীচীর খোসার সমানও ক্ষমতা তাদের নেই, যখন তারা এত অক্ষম, এত অসহায় তখন তোমরা কোন্ যুক্তিতে তাদের সম্মুখে মাথা নত কর? কোন্ লাভে তাদেরকে ডাক?

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۤءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ

'আর যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাক শ্রবণ করতে পারে না। আর যদি তারা শ্রবণ করেও তবে তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, এতদ্ব্যতীত কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শেরকী কাজকে অস্বীকার করবে'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত কাফেররা যাদেরকে ডাকে, যাদের প্রতি তারা ভক্তি-অনুরক্তি প্রকাশ করে, তারা প্রাণহীন হওয়ার কারণে তাদের পূজারীদের ডাক শুনতে পায়না। আর যারা শুনতে পায় যেমন ইবলীস শয়তান সে তার ভক্তদের কথা শুনতে পেলেও তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, তাদের কোন উপকারে আসতে পারবে না, কেননা কারো উপকার করার ক্ষমতাই তার নেই। এ পর্যায়ে আরো একটি কথা হল, যে কাফেররা ঈসা (আঃ)-কে বা ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক মনে করে, অথবা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কন্যা বলে ভ্রান্ত ধারণা করে, কেয়ামতের দিন সেই নবীগণ ও ফেরেশতারাই কাফেরদের শেরকী কাজকে অস্বীকার করবে, তারা বলবে ঃ

مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ

তোমরা আমাদের পূজা করোনি, বরং তোমরা পূজা করেছে তোমাদের ভাবাবেগের, তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট বাতিলপন্থী।

এর তাৎপর্য হল, আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে কাফেররা যাদের পূজা, অর্চনা করে তারা নিজেরাই তাদের শেরকী আচরণকে অস্বীকার করবে। কাফেররা আশা করছে যে তাদের বাতিল মা'বুদেরা কেয়ামতের বিপদ মুহূর্তে তাদের সাহায্যকারী হবে, প্রকৃত অবস্থা এই, পূজারীদের সাহায্য করার স্থলে তারা পূজারীদের সঙ্গে শত্রুতা করবে।

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ

'(হে রসূল!) সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেউ আপনাকে খবর দিতে পারবে না'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত ভবিষ্যতের জ্ঞান কারোই নেই, তাই আল্লাহ পাক বিনা কাফেরদের পূজনীয়দের সম্পর্কে কারোই কিছু জানা নেই। এজন্যে স্বয়ং আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নেই মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ঘোষণা করছেন যে যাদের তোমরা পূজা কর, তারা চরম অসহায়, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, তারা তোমাদের কোন প্রকার উপকার করতে পারবে না। (হে রসূল!) সর্বজ্ঞানী আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ আপনাকে তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে না।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ
اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ⑮ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑯ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ⑰ وَ
لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ اِنَّمَا تُنْذِرُ
الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ
وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ⑱

তরজমা

(১৫) হে মানব জাতি! তোমরাই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

(১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারণ করবেন এবং নতুন মখলুক সৃষ্টি করবেন।

(১৭) আর তা আল্লাহ পাকের পক্ষে কঠিন নয়।

(১৮) এবং কোন ব্যক্তি অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবেনা। আর যদি কোন বোঝা-ক্লান্ত ব্যক্তি কাউকে তা বহন করতে আহবানও করে, তবুও তার কিছুই বহন করা হবেনা, যদিও তার নিকটাত্মীয় হয়। (হে রসূল!) আপনি তো শুধু তাদেরকেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামাজ কায়েম করে। আর যে নিজেকে সংশোধন করে সে তা শুধু নিজের কল্যাণের জন্যেই করে এবং আল্লাহ পাকের নিকটই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের মুশরেকদের তৌহিদ বিরোধী ভ্রান্ত ধারণার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। কাফেররা তাদের অর্থ-সম্পদের কারণে বা সাময়িক মর্যাদা লাভের কারণেই অহংকারী ও সত্য-বিমুখ হয়েছে, তৌহিদকে অস্বীকার করেছে তাই এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ

সকলেই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী

হে মানব জাতি! তোমরা সকলেই আল্লাহ পাকের দরবারে ফকীর, তাঁর দানের মুখাপেক্ষী, তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব, স্থিতি, উন্নতি-অগ্রগতি এবং তোমাদের জীবন জীবিকা অর্জনে আল্লাহ পাকের দানের ভিখারী, তোমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সবই আল্লাহ পাকের দান, অতএব সত্য-বিমুখ হয়োনা, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়োনা, মনে রেখ! আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, কারো নিকট আল্লাহ পাকের কোন প্রয়োজন নেই, তাঁর কোন গরজ নেই, তিনি বে-নিয়াজ, তিনি কারো পরোয়া করেন না, এমনকি কারো প্রশংসারও তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত, সর্বগুণে গুণান্বিত, প্রশংসা মাত্র শুধু তাঁরই, তিনি মহিমময়, তিনি গুণময়; সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনি, আর সকলের এবাদত বন্দেগীর অধিকারীও তিনিই। যদি তোমরা তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ থাক, তবে তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন, তোমাদের স্থলে অন্য মাখলুক সৃষ্টি করতে পারেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

'আর তা আল্লাহ পাকের জন্যে আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়'। অর্থাৎ তোমাদেরকে বিদায় করা এবং নুতন মাখলুক আনয়ন করা আল্লাহ পাকের পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়, কেননা তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর সকল ইচ্ছা কার্যকর হয়, তাঁকে বাধা দিতে পারে এমন কেউ নেই। যদি তোমরা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে মান-ইজ্জত পেতে চাও, তবে তার একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল। বন্দা মাত্রই পর মুখাপেক্ষী, শত প্রয়োজনের জিঞ্জিরে সে আবদ্ধ, আর প্রত্যেকটি প্রয়োজনের আয়োজনই হয় আল্লাহ পাকের দানে। সকলেই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, তাঁর বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করাই হলো কাম্য। এর কোন বিকল্প নেই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, মানুষ তার অস্তিত্ব লাভে ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং জীবিকার্জনে আর আখেরাতে দোযখ থেকে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, আল্লাহ পাক দয়া করে দান না করলে এর কোন কিছুই মানুষ পেতে পারেনা। সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, কিন্তু মানুষ দুর্বল, জালেম এবং

জাহেল হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু আল্লাহ পাকের আমানতের দুর্বহ বোঝা কাঁধে নিয়েছে, এজন্যে অন্য সৃষ্টির চেয়ে মানুষ অধিকতর মুখাপেক্ষী।[১]

আলোচ্য আয়াতের خلق جديد কথাটির ব্যাখ্যা হলো, এমন এক সৃষ্টি তোমাদের স্থলে আবাদ হবে, যা তোমাদের চেয়ে অধিকতর অনুগত হবে, আর এমন এক বিশ্ব যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে তাদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতএব, হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়োনা।

خلق جديد কথাটির তফসীরে আল্লামা দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, মানব জাতিকে বিদায় করে আল্লাহ পাক যে নতুন সৃষ্টি আনয়নের কথা এ আয়াতে এরশাদ করেছেন, তার কি কি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য থাকবে তা মানুষের জন্যে কল্পনাতীত, তবে এতটুকু বলা যায় যে, তারা কুফর ও শেরক করবেনা, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে না।[২]

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এর অর্থ হলো হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের রহমতের, মাগফেরাতের এবং রিয্কের মুখাপেক্ষী এবং দুনিয়াতে যাবতীয় বালা-মসিবত থেকে তিনি রক্ষা না করলে তোমাদের রক্ষা নেই, তাই তোমরা শুধু তোমাদের জীবনের ব্যাপারেই নয়; বরং জীবনের হেফাজতের ব্যাপারেও তাঁর মোহতাজ, আর আখেরাতে তিনি জান্নাত দান না করলে জান্নাত লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে মানুষ আল্লাহ পাকের দরবারের ফকীর, তাঁর দানের ভিখারী। আর আল্লাহ পাক কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন।[৩]

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

অর্থাৎ মানুষকে বিদায় করা এবং অন্য মাখলুক সৃষ্টি করা আল্লাহ পাকের পক্ষে কঠিন কিছুই নয় কিন্তু তিনি তা করেন না, কেননা তাঁর প্রতিটি কাজই হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তাঁর হেকমতের প্রেক্ষিতেই তিনি কাউকে দ্রুত শাস্তি দেন না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। সমগ্র সৃষ্টি জগতই তাঁর করুণা-বৃষ্টির মুখাপেক্ষী। মানুষ অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত সে নিঃশ্বাসও নিতে পারে না। স্রষ্টার মর্জি ব্যতীত সৃষ্টি সম্পূর্ণ অসহায়, নিরুপায়। আল্লাহ পাক সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী, আর তিনি কারো প্রশংসারও মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫০৪
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৭৫
৩। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৬৬

আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জি হলে তিনি সব কিছুকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং নতুন মাখলুক সৃষ্টি করতে পারেন, আর তা আল্লাহ পাকের জন্যে অতি সহজ।[১]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

'কোন ব্যক্তিই অন্যের (পাপের) বোঝা বহন করবে না'।

যদি কোন বোঝা-ক্লান্ত ব্যক্তি তার বোঝা লাঘবের জন্যে কাউকে ডাকে তবে কেউ তার এতটুকু বোঝা বহন করবে না, যদি সে তার আত্মীয়-স্বজনও হয়। দুনিয়াতে কেউ বিপদগ্রস্ত হলে আত্মীয়-স্বজন, আপনজনেরা তাকে বিপদমুক্ত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সকলেই তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে। কিন্তু কেয়ামতের কঠিন দিনে এ অবস্থা বজায় থাকবেনা। একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করবে না, কারো প্রতি কারো কোন সহযোগিতা থাকবে না, এমনকি নিকটাত্মীয় স্বজনও কেউ কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত হবে না। কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণা ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে এবং তার মাতা থেকে এবং তার পিতা থেকে এবং তার স্ত্রী থেকে ও তার সন্তান থেকে'। (সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৬ আয়াত)

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের কঠিন দিনে পিতা পুত্রকে স্মরণ করিয়ে দেবে তার এহসানের কথা এবং বলবে, 'আজ তোমার সামান্য নেকী আমাকে দাও'। পুত্র বলবে, 'আব্বাজান, আপনি তো অত্যন্ত সামান্য জিনিসই চেয়েছেন, কিন্তু আপনি যে ভয় করছেন আমিও সেই ভয়ই করছি। তাই আপনাকে আমি আজ কিছুই দিতে পারবো না'। এমনিভাবে মানুষ তার স্ত্রীর নিকট যাবে। তার প্রতি তার এহসানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবে, আজ আমি তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী, তুমি আমাকে একটি নেকী দ্বারা সাহায্য কর। সে বলবে, 'যে ভয়ে আপনি নেকী চেয়েছেন সে ভয়ে আমি নিজেও ভীত, আজ আপনার জন্যে আমি কিছুই করতে পারবো না'। কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا

(সূরা লোকমান, ৩৩ আয়াত)

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৭৫

অর্থাৎ 'সেদিন পিতা পুত্রের কাজে আসবে না আর পুত্রও পিতার জন্যে এতটুকু উপকারী হবে না'।[১]

যাহোক, কেয়ামতের মহা বিপদের দিনে কেউ কারো দুঃখের ভার বহন করতে আসবে না। এমনকি পরম আত্মীয়-স্বজন তথা পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী পর্যন্ত সেদিন মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেননা, সেই কঠিন দিনে প্রত্যেকেই তার নিজের চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়বে। একমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত সেদিন কোন গত্যন্তরই থাকবে না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, পিতা-মাতা সেদিন পুত্রকে ডাকবেন এবং বলবেন, 'হে আমার পুত্র! আমাদের কিছু বোঝা তুমি বহন কর'। পুত্র বলবে, 'এর শক্তি আমার নেই, আমার আমলের বোঝাই যথেষ্ট'।[২]

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের দিন মানুষের ঠেকা এবং বিপদ সহস্র গুণ বেড়ে যাবে। কেউ কারো সাহায্যকারী হবে না। কেউ কারো উপকারে আসবে না। অতএব, প্রত্যেকেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের গজবকে ভয় করা, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করা। এজন্যে আল্লাহ পাকের ভয় পূর্বশর্ত। আল্লাহ পাকের ভয় থাকলেই পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং নেক আমলে আত্মনিয়োগ করা যায়।

কিন্তু সবার অন্তরে কি আল্লাহ পাকের ভয় জাগ্রত থাকে? এ প্রশ্নের জবাবই রয়েছে পরবর্তী আয়াতে, এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

'(হে রসূল!) আপনি তো শুধু তাদেরকেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামাজ কায়েম করে। আর যে নিজেকে সংশোধন করে তা শুধু নিজের কল্যাণার্থেই করে এবং আল্লাহ পাকের নিকটই সকলকে ফিরে যেতে হবে'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলকেই আখেরাত সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু সবাই এর দ্বারা উপকৃত হয় না। যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় নেই, আখেরাতের সম্পর্কে চিন্তা নেই, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের হেদায়েত ও নসীহতের দ্বারা উপকৃত হয় না।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৭৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫০৫

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

মূলতঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের অন্যায় আচরণে ব্যথিত হবেন না এবং তারা যে আপনার রেসালতকে অস্বীকার করে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যকে অবিশ্বাস করে, তাতেও বিস্মিত হবেন না। আপনার আহবান সবার জন্যে হলেও সকলে এর দ্বারা উপকৃত হবে না। এর দ্বারা উপকৃত হবে শুধু তারা, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, যারা আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত থাকে এবং নামাজ, রোজা ও অন্যান্য এবাদত যথা নিয়মে আদায় করে। আপনার নসীহত তাদেরই মনে রেখাপাত করে। আর তাদেরই অবস্থা এই হয় যে তারা পরকালীন জিন্দেগীর কথা মনে করে আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হয়।

وَمَنْ تَزَكّٰى

'আর যারা আত্মসংশোধনের চেষ্টা করে তারা তা নিজেদের কল্যাণার্থেই করে'।

পরকালের মূল্যবান সম্পদ

কেননা যারা আত্মসংশোধন করে তারাই আত্মোন্নতি লাভ করে আর যারা আত্মোন্নতি লাভ করে তারাই আত্মরক্ষায় সফল হয়। প্রত্যেককেই অবেশেষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে। আর সেদিন ঈমান, এখলাছ, নেক আমল এবং এত্তেবায়ে রসূল তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণই হবে পরকালের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ
إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي
الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾
وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ
أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

তরজমা

(১৯) আর অন্ধ এবং চক্ষুস্মান এক সমান নয়।

(২০) আঁধার ও আলোও নয়।

(২১) ছায়া ও রৌদ্রও নয়।

(২২) এবং জীবিত ও মৃতও এক সমান নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শ্রবণ করান। (হে রসূল!) যারা কবরে রয়েছে, আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না।

(২৩) (হে রসূল!) আপনি তো শুধু একজন সতর্ককারী মাত্র।

(২৪) (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্য সহ, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে, আর এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।

(২৫) (হে রসূল!) তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে, তবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাদের নিকট এসেছিল তাদের রসূলগণ, সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে আসমানী গ্রন্থ, দীপ্তিমান কিতাব সহ।

(২৬) এরপর আমি কাফেরদেরকে পাকড়াও করেছিলাম (শাস্তি দিয়েছিলাম)। (জিজ্ঞাসা করি) কত ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি!

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হেদায়েত এবং গোমরাহীর বিবরণ ছিল। কাফেররা হেদায়েত গ্রহণ করেনি, আর আল্লাহ্ পাক মোমেনগণকে হেদায়েত লাভের তৌফিক দান করেছেন, এ আয়াতে মোমেন ও কাফেরের পার্থক্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে, এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝ وَلَا الظِّلُّ
وَلَا الْحَرُوْرُ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

অর্থাৎ যেভাবে অন্ধ এবং চক্ষুস্মান এক সমান নয়, আলো এবং আধার এক সমান নয়; ছায়া এবং রৌদ্র এক সমান নয়; জীবিত এবং মৃত এক সমান নয়; ঠিক তেমনি মোমেন ও কাফেরও এক সমান নয়, কেননা মোমেন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক অর্ন্তদৃষ্টি দান করেন, সে ওহীর জ্যোতি লাভ করে, সত্যের আলোকে পথ চলে এবং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে জান্নাতের মনোরম বাগানের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, রহমতুল্লিল আলামীন

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কারণে সে আল্লাহ পাকের রহমতের সুশীতল ছায়াতলে থেকে জীবন সাধনা করে। পবিত্র কোরআনের আলোতে আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়ে জীবন-যাপন করে, তাই তার গন্তব্যস্থল জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে সে বাধা প্রাপ্ত হয় না।

পক্ষান্তরে, কাফেরের অবস্থা হলো অন্ধের মত, সারা পৃথিবী আলোকময় হলেও অন্ধ ব্যক্তি তার দ্বারা উপকৃত হয় না, বিশ্বনবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ, বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের আলো সমগ্র বিশ্বে বিকীরণ হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা অন্ধের মত সে আলোতে পথ দেখেনা, আর সেজন্যেই সে পথভ্রষ্ট হয় এবং প্রতি মুহূর্তে মঞ্জিল থেকে দূরে সরে যায়। এ কারণে কাফের দিশেহারা অবস্থায় দোযখের দিকে ধাবমান থাকে, তাই মোমেন ও কাফের কখনো এক সমান হতে পারে না।

যেভাবে জীবিত এবং মৃত এক সমান হতে পারেনা, ঠিক তেমনি মোমেন ও কাফেরও এক সমান হতে পারেনা। কেননা, মানুষ ঈমানের সঞ্জীবনী সুধা পান করেই অমরত্ব লাভ করে আর ঈমানের অভাবে জীবন্মৃত হয়ে থাকে। ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমেই মাটির মানুষ স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের নৈকট্য-ধন্য হয়। আর ঈমানের অভাবে মানবতার মান ক্ষুন্ন হয়, মানুষ 'প্রকৃত মানুষ' হতে পারেনা, মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনের জন্যে চাই আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান।

আর এ কারণেই প্রকৃত মোমেন এ নশ্বর জগতে বাস করলেও তার মন থাকে সর্বদা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বক্ষণ হাযির, তাঁর স্মরণে মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা। আর যে মোমেন নয়, সে এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ ও ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়েই থাকে ব্যস্ত, পরিণামে দুনিয়াতে থাকে দিশেহারা হয়ে, আর মৃত্যুর পর হয় সর্বহারা। দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন ঃ

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم ہیں اس میں آفاق

কাফেরের পরিচয় হলো, সে এ পার্থিব জগতেই হারিয়ে যায়, আর মোমেনের পরিচয় হলো, সমগ্র সৃষ্টিজগত তার মাঝে হারিয়ে যায়।

إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শ্রবণ করাতে পারেন অর্থাৎ যার সম্পর্কে তাঁর মর্জি হয় তাকে তিনি উপদেশ গ্রহণের তৌফিক দান করেন, (হে রসূল!) যে কবরে পড়ে রয়েছে তাকে আপনি শোনাতে পারবেন না, আপনি তো শুধু একজন সতর্ককারী মাত্র'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, নবীর কাজ হলো আল্লাহ পাকের মহান বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া, তাদেরকে পরকালের মহাবিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা, আর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া।

কিন্তু কাফেরদের মৃত অন্তরকে জীবিত করা নবীর কাজ নয়। এজন্যে এরশাদ হয়েছে ঃ (হে রসূল!) আপনি তো শুধু সতর্ককারী, কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে বাধ্য করা আপনার কাজ নয়; আর ঈমানের রুহ কারো অন্তরে প্রবেশ করিয়ে তাকে জীবিত করাও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

কাফেরকে সত্য কথা শুনিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব, কিন্তু মানা না মানা তার কাজ। যদি কেউ আপনার কথা না মানে, আপনি তার জন্যে চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। যেসব হাদীসে মৃতদেরকে সালাম দেয়ার এবং কথা বলার বিবরণ রয়েছে, এ বিবরণের তাৎপর্য হলো, মৃতদের রুহ শ্রবণ করে, যদি আল্লাহ পাক তাকে শ্রবণ করাতে চান। কিন্তু কবরে মৃত ব্যক্তির দেহের ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকে, তা মানুষের কথা শুনতে পারেনা।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনার কথা সত্য, আপনার সাধনা গ্রহণযোগ্য আর কাফেরদেরকে উপদেশ দেয়া আপনার দায়িত্ব, কিন্তু তাদেরকে মানিয়ে নেয়া আমার কাজ, আপনার নয়। এজন্যে এ আয়াতে কাফেরদেরকে মৃত বলা হয়েছে, কেননা যে মৃত তার ব্যাপারে ফিরে আসার কথা চিন্তা করা যায় না, সে আশাও কেউ করেনা। এমনিভাবে এ কাফেররাও দ্বীন ইসলাম কবুল করবেনা, তাই তাদের জন্যে দুঃখিত হওয়ারও কোন কারণ নেই।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্য সহ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে আর এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যাদের মাঝে কোন সতর্ককারী গত হয়নি'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনি তো শুধু সতর্ককারী, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনি নিজের তরফ থেকে

মানুষকে সতর্ক করছেন না; বরং আল্লাহ পাকই আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাই আপনি কাফেরদেরকে তাদের অনিবার্য এবং শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন। আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে সুসংবাদ দান করুন। যদি কাফেররা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে বা মিথ্যাবাদী বলে, তাতে বিস্মিত ও দুঃখিত হবার কিছুই নেই কেননা, ইতোপূর্বেও নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছিল। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيرِ

আর (হে রসূল!) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তবে আপনি দুঃখিত হবেন না, তাদের অন্যায় আচরণে আপনি সবর অবলম্বন করুন। কেননা, আপনার পূর্বে যে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদেরকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে, অথচ নবী রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট মোজেযা, আসমানী গ্রন্থ সমূহ এবং উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তাদের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহ এবং হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব থাকা সত্ত্বেও কাফেররা তাঁদের প্রতি ঈমান আনেনি। অতএব, (হে রসূল!) মক্কার কোরায়শরা যদি আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তবে তাতে দুঃখিত হবার কিছুই নেই।

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, অর্থাৎ যারা ইতোপূর্বে নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁদেরকে কষ্ট দিয়েছে, আমি তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তি দিয়েছিলাম। (হে রসূল!) আপনি দেখুন, কেমন কঠিন এবং ভয়ংকর হয়েছিল সে শাস্তি! তারা আমার আযাবে সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তাদের অর্থ-সম্পদ, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব তাদের শেষ রক্ষা করতে পারেনি, কুখ্যাত ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ গংয়ের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছিল, তা লক্ষ্য করুন। (হে রসূল!) বর্তমানে যে কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত, যদি তাদের এ নীতি অব্যাহত থাকে, তবে তাদের পরিণামও পূর্বকালের কাফেরদের মতই ভয়াবহ হবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ
اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ۢ بِيضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ
وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ
يَتْلُونَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

তরজমা

(২৭) তুমি কি দেখতে পাওনি আল্লাহ পাক আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, এরপর আমি এর দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি। পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে সাদা, লাল এবং গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ তথা বিচিত্র বর্ণের অঞ্চল।

(২৮) এভাবে রয়েছে রঙ বেরঙের মানুষ, কীট-পতঙ্গ ও চতুঃষ্পদ জন্তু। আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(২৯) যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নামাজ কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসায়ের, যাতে আদৌ কোন লোকসান নেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহিদের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে তৌহিদের একাধিক প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের যে অনন্ত মহিমা রয়েছে তা দেখে তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আহবান জানানো হয়েছে। নানা বর্ণের মানুষ, নানা রঙের ফল-মূল, সাদা, কালো, লাল, নানা প্রকৃতির কীট-পতঙ্গ, বিচিত্র অবস্থায় পাহাড়

-পর্বত বর্তমান রয়েছে। এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের বহু নিদর্শন রয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

'তুমি কি দেখনি যে আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, এরপর আমি এর দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি। পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে সাদা, লাল এবং গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ তথা বিচিত্র বর্ণের অঞ্চল'।

আসমান জমিন আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। পুনরায় আসমান থেকে জমিনে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক পানি বর্ষণ করেছেন। আর ঐ পানি দ্বারা তিনি নানা বর্ণের, নানা বৈশিষ্ট্যের সুস্বাদু ফলমূল তৈরী করেন। লক্ষ্যণীয়, বৃষ্টির পানি একই, আর ঐ এক পানি দ্বারাই সারা পৃথিবীতে যে ফলমূল উৎপন্ন হচ্ছে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তার বর্ণ ভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন, কোথাও আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি-ভিন্ন। এর দ্বারাই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের জীবন্ত নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এমনিভাবে মানুষ, কীট-পতঙ্গ এবং চতুঃষ্পদ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে একই প্রকার প্রাণীর মধ্যে কত বর্ণ এবং কত আকৃতি রয়েছে। এসবই মহান আল্লাহ পাকের অনন্ত মহিমা। এর কোন শেষ নেই, নেই কোন সীমা। মূলতঃ আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। সমগ্র বিশ্ব ভূবন তাঁর কুদরত হেকমতে পরিপূর্ণ।

তফসীরকারগণ বলেছেন, ইতোপূর্বে মোমেন ও কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর এ আয়াতে বিশ্ব সৃষ্টির বিচিত্র রূপের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। যেভাবে সৃষ্টির মধ্যে রূপ ও প্রকৃতিতে পার্থক্য রয়েছে, যদিও সব কিছু এক পানি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে মানুষের মধ্যেও কেউ মোমেন আর কেউ কাফের রয়েছে, মোমেনের গন্তব্যস্থল জান্নাতে, মোমেন আল্লাহ পাকের অনুগত, কৃতজ্ঞ, আর কাফের আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ।[১]

তফসীরকার আবু হাইয়ান (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের বর্ণনা রয়েছে। মানব জাতিকে বিশ্ব সৃষ্টির অপরূপ রূপ দেখে বিশ্ব স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে। রঙ বেরঙের ফল

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৭৭

ফুল, সাদা, কালো, লাল আর এ অবস্থা শুধু ফল ফুলেই নয়; বরং মানব জাতির মধ্যেও একই অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। আর এ বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গেও পরিলক্ষিত হয়। এসবই এক আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে জরীর, কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই করেছেন।[১]

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط

'আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে'।

এলমের ফজিলত

যেভাবে সৃষ্টি জগতে অনেকে বৈচিত্র্য রয়েছে ঠিক তেমনি মানুষের অবস্থাও বিভিন্ন প্রকার। কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আর কেউ করেনা। মানুষের মধ্যে যাদের নিকট এলম রয়েছে, অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে জানে, তারাই আল্লাহকে ভয় করে। এলম ও মা'রেফাত যে পর্যায়ের হবে, আল্লাহর ভয়ও সে পর্যায়েরই হবে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট সে-ই অধিকতর সম্মানিত যে অধিকতর পরহেযগার'।

অর্থাৎ যার মধ্যে তাকওয়া পরহেযগারীর গুণ যত বেশী হবে, আল্লাহ পাকের দরবারে তার মর্তবা তত বেশী হবে। অতএব, যার মধ্যে এলম ও মা'রেফাত অধিকতর হবে তার অন্তরে আল্লাহর ভয়ও বেশী হবে। প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ পাক সম্পর্কে অধিকতর এলম রাখি, আর আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি। (বোখারী)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যে আলেম তার এলম মোতাবেক আমল করেনা, তার এলম ধীরে ধীরে কমে যায়। এজন্যে কবি বলেছেন ঃ

علم چند انکه بیشتر خوانی = چون عمل درتو نیست نادانی

'যত পড়া লেখা কর এলম বাড়বে, কিন্তু যদি তোমার মধ্যে আমল না থাকে তবে তুমি এলম থেকে বঞ্চিত হবে'।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৮৮-৮৯

ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, অনেক বর্ণনা একত্রিত করার নাম এলম নয়, এলম হল একটি নূর যা আল্লাহ পাক তাঁর বন্দার মধ্যে দান করেন। ইমাম মালেক (রঃ) যে নূরের কথা বলেছেন, তা হল মা'রেফাতের নূর আর এজন্যেই আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেন ঃ

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

'আমি মানুষের জন্যে ঐ দৃষ্টান্তগুলো দিয়ে থাকি, কিন্তু আলেম ব্যতীত এ দৃষ্টান্ত কেউ বোঝেনা'।

এ আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, আলেম সে ব্যক্তি যার ধী-শক্তি রয়েছে, শুধু কোরআন ও হাদীস কণ্ঠস্ত রাখার নাম এলম নয়, বরং আল্লাহ পাকের নিকট আলেম সে ব্যক্তিই, যে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম সম্পর্কে অবগত হয় এবং আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত থাকে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে রত থাকে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের এলম যার মধ্যে যতখানি থাকবে সে আল্লাহকে ততখানি ভয় করবে। আর সর্বদা এ ভয় অবশ্যই থাকবে যে আমার দ্বারা যেন আল্লাহ পাকের বিধানের বরখেলাফ এবং দরবারের আদব বিরোধী কিছু না হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত হওয়ার জন্যে এলম পূর্বশর্ত। যেমন নামাজের জন্যে অজু শর্ত। যে এলম অর্জনের পর ঐ ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি না হয়, আল্লাহ পাকের দরবারে সে এলম গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ এলম দ্বারা এখানে এলমে দ্বীন উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার দ্বারা মানুষ আত্ম-সংশোধন করতে পারে। যদি এলম আত্ম-সংশোধনের উপকরণ না হয়, তবে এমন এলমের কোন গুরুত্ব নেই। যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানে কেউ পারদর্শী হল, যার দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়, কিন্তু আত্ম-সংশোধন করা সম্ভব হয় না। অতএব, এমন এলম অর্জন করতে হবে যার ফলশ্রুতি স্বরূপ অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় জাগ্রত হয়, আর সে ভয়ও এমন হতে হবে যা মানুষকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে। অতএব, এলম অর্জনের কারণে মানব অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়, আর ঐ ভয় সে ব্যক্তির মধ্যে ও পাপাচারের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এ ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয় না। আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। আর তা আত্ম-সংশোধনের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ অর্জিত হয়। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে انما শব্দটি আরবী ব্যাকরণ মোতাবেক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্যে শুধু আলেমগণই

আল্লাহকে ভয় করে, জাহেলরা নয়। কেননা আল্লাহ পাকের ভয় অর্জন করার জন্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের জ্ঞান অর্জন করা পূর্বশর্ত।[১]

শায়খ সাহাবুদ্দীন সুরওয়ার্দী (রঃ) লিখেছেন, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই সে প্রকৃত আলেম নয়, যে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়া।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে এ আয়াতের অর্থ হল, সে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে যার মধ্যে আল্লাহর আযাবের এলম আছে, আর যার অন্তরে যত বেশী আল্লাহ পাকের গুণাবলীর এলম থাকবে, তার ভয়ও তত বেশী থাকবে।

দারেমী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস সংকলন করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, আলেমের ফজিলত ও মর্তবা এবাদত গুজার ব্যক্তিদের উপর এমন, যেমন তোমাদের কারো উপর আমার ফজিলত। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যা কিছু আমি জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে অধিক পরিমাণে ক্রন্দণ করতে এবং খুব কম হাসতে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে পরিপূর্ণ ভয় নবী রসূলগণের অন্তরেই থাকে। এরপর আউলিয়ায়ে কেরামের, এরপর ওলামায়ে কেরামের স্থান রয়েছে।

মসরুক (রঃ) বলেছেন, মানব অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়াই সবচেয়ে বড় জ্ঞান, আর এ ব্যাপারে প্রতারিত হওয়াই হল মূর্খতা।

শা'বী (রঃ) বলেছেন, সে ব্যক্তিই প্রকৃত আলেম যে আল্লাহকে ভয় করে।[২]

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল'।

অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী, অতএব তাঁকে ভয় করা উচিত, আর যারা তাঁকে ভয় করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। عزيز শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাককে ভয় করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে আর غفور বা অত্যন্ত ক্ষমাশীল বলে ভয় করার ফল ঘোষণা করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬০৫-০৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫০৮-০৯

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন عـزيز (পরাক্রমশালী) শব্দটির পর غـفـور শব্দটি ব্যবহারের কারণ হল, পরাক্রমশালী শব্দটি শ্রবণের কারণে বান্দা নিরাশ হয়ে যেতে পারে। সে নিরাশা দূর করার জন্যে ক্ষমা লাভের আশায় আশান্বিত করা হয়েছে غفور শব্দর দ্বারা। এজন্যেই বলা হয়েছে ঃ

الايـمان بيـن الـخوف والرجاء

'ঈমান হল আশা এবং ভয়ের মাঝে'।

অর্থাৎ আল্লাহর আযাবকে ভয় করতে হবে এবং আল্লাহর রহমতের আশাও রাখতে হবে। যেহেতু নবী রসূলগণ আল্লাহ পাককে অধিকতর ভয় করেন আর আলেমগণ যেহেতু নবী রসূলগণের উত্তরাধিকারী হন, তাই আলেমদের মধ্যেও আল্লাহ পাকের ভয় থাকতে হবে। আর যার মধ্যে আল্লাহর ভয় যত বেশী পরিমাণ থাকবে, আল্লাহ পাকের দরবারে তার মর্তবা তত বেশী হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক সম্পর্কে যত বেশী জ্ঞান অর্জন করবে, তার অন্তরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব তত বেশী পড়বে। যে একথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, সে প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে ভয় করতে থাকবে। আল্লাহ পাকের ব্যাপারে সঠিক এলম সে ব্যক্তিই অর্জন করে যে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনা এবং তিনি যা কিছু হালাল করেছেন তাকে হালাল জানে এবং যা কিছুকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে হারাম মনে করে এবং একদিন অবশেষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রত্যেককে হাযির হতে হবে একথা বিশ্বাস করে। আল্লাহ পাকের ভয় এমন একটি শক্তি যা বন্দাকে আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে দূরে রাখে। প্রকৃত আলেম সে ব্যক্তিই যে সর্বদা আল্লাহ পাককে ভয় করে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসী হয় এবং আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় কাজকে ঘৃণা করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, অনেক কথা জানার নাম এলম নয়, এলম হলো আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে ভয় করা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলেম তিন প্রকার (১) আলেম বিল্লাহ (২) আলেম বেআমরিল্লাহ (৩) আলেম বিল্লাহ ও বেআমরিল্লাহ।

যে আল্লাহ পাককে ভয় করে কিন্তু তাঁর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত নয় সে হলো 'আলেম বিল্লাহ'। আর যে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকেনা, সে 'আলেম বেআমরিল্লাহ' হবে, আর যে আল্লাহ পাককে ভয় করে এবং তাঁর বিধি-নিষেধও যথাযথভাবে পালন করে, সে হলো 'আলেম বে আমরিল্লাহ' ও 'আলেম বিল্লাহ'।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৭৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭১

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাককে ভয় করা জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান লোকেরই কাজ, কেননা আল্লাহ পাকের ব্যবহার দু' প্রকার (১) কৃত অন্যায়ের শাস্তি বিধান করা এবং (২) ক্ষমা করা। দু'টি কাজই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। তাই কোন বুদ্ধিমান লোকই আল্লাহ পাককে ভয় না করে পারেনা। শাস্তির ভয়েও ভয় করতে হবে এবং ক্ষমা লাভের আশায়ও ভয় করতে হবে।

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর রাজত্বে পরাক্রমশালী, আর যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্যে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ

'নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং সঠিকভাবে নামাজ আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে কিছু দান করে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশা করে যাতে আদৌ কোন লোকসান নেই'।

পূর্ববর্তী আয়াতে ওলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াতে ওলামা ও নেককার মোমেনদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ রয়েছে, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে এবং ভক্তি সহকারে পবিত্র কোরআন পাঠ করে, আর এ বিশ্বাস করে যে, এ মহান গ্রন্থ আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ এবং পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধের উপরও আমল করে এবং সঠিকভাবে নামাজ আদায় করে তথা নামাজের হক্ব আদায় করে, এর পাশাপাশি আল্লাহ পাক যে রিযক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে তথা যথা নিয়মে যাকাত আদায় করে এক কথায় আন্তরিক, দৈহিক এবং আর্থিক এবাদত করতে থাকে, তারা এমন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে যাতে বিন্দুমাত্রও লোকসানের সম্ভাবনা নেই। এটি এমন ব্যবসা যাতে শুধু লাভই রয়েছে।

জীবনকে সার্থক করার তিনটি কর্মসূচী

এ আয়াতে জীবনকে সার্থক করার তিনটি কর্মসূচী প্রদান করা হয়েছে। এ তিনটি কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে আখেরাতের ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের সুনিশ্চিত আশা রয়েছে।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৬৭

১. তেলাওয়াতে কোরআনে করীম যা সকল নফল এবাদতের মধ্যে উত্তম এবং আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম ও আল্লাহ্ পাকের সাথে কথোপকথনের এক অপূর্ব সুবর্ণ সুযোগ।

২. সঠিকভাবে, যথানিয়মে নামাজ আদায় করা, কেননা এটি দ্বীন ইসলামের অন্যতম খুঁটি এবং দৈহিক এবাদতের ভিত্তি। সমগ্র সৃষ্টি জগতের এবাদতের এটি একটি সমন্বিত রূপ।

৩. আল্লাহর রাহে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করা, এতে সমস্ত আর্থিক এবাদত অন্তর্ভুক্ত, যারা এ তিনটি কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং সঠিকভাবে এর বাস্তবায়ন করবে, তবে আশা করা যায় যে, তাদের আখেরাতের ব্যবসায়ে কণামাত্রও ক্ষতি হবে না।

আমল অপরিহার্য

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ভাল কিছুর আশা করার জন্যে আমল বা চেষ্টা একান্ত জরুরী। আলোচ্য আয়াতে যে তিনটি কর্মসূচী দেয়া হয়েছে, যারা আন্তরিকভাবে যত্ন সহকারে এ কর্মসূচীর বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করবে, শুধু তাদের পক্ষেই আখেরাতের ব্যবসায়ে লাভবান হবার আশা রয়েছে। কেউ যদি তার জমীনে কৃষি কাজ না করে যথাসময়ে ভাল ফসলের আশা করে, সে আশা যেমন বৃথা যাবে, ঠিক তেমনি ঈমান এবং নেক আমল ব্যতীত যদি কেউ আখেরাতে রহমত ও মাগফেরাতের আশা করে, তবে তার অবস্থাও তেমনই হবে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী (রঃ) তাঁর 'রেজাউল গুয়ুব' নামক গ্রন্থে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক সর্ব প্রথম তাঁকে ভয় করার কথা বলেছেন, আর এটি হলো অন্তরের কর্ম, এরপর রসনার কাজের কথা বলেছেন, তা হলো তেলাওয়াতে কোরআন, এরপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের কথা বলেছেন, তা হলো নামাজ, অবশেষে আর্থিক এবাদতের কথা বলেছেন, তা হলো যাকাত আদায় করা, আল্লাহর রাহে দান করা। যারা অন্তর, রসনা, অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনা করে, তাদের জীবন-সাধনা কখনো ব্যর্থ হবেনা, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত, তাদের শুভ পরিণতির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯২

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ
شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(৩০) এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাক তাদের নেক আমলের প্রতিফল পুরোপুরি দান করবেন। তদুপরি তিনি নিজের কৃপায় তা আরো বাড়িয়ে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত মার্জনা-প্রিয়, গুণগ্রাহী।

(৩১) (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তা-ই সঠিক, তা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমর্থক, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন, (তাদের প্রতি) লক্ষ্য রাখেন।

(৩২) এরপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম আমার বন্দাদের মধ্যে সে সব লোকদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী হয়েছে, কেউ মধ্যপন্থী, আর কেউ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, এটিই তো বিরাট মর্যাদা।

(৩৩) তারা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ এবং মুক্তার গহনা পরানো হবে, আর সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে তিনটি কর্মসূচীর উল্লেখ ছিল (১) পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত, (২) নামাজ, (৩) দান খয়রাত, আর এ আয়াতে সে সব নেককারদের জন্যে অশেষ সওয়াবের খোশখবরী রয়েছে, যারা যত্ন সহকারে উপরোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে।

এরশাদ হয়েছে ঃ

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

অর্থাৎ যারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের হক্ব আদায় করে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন, যা তারা আশা করবে তাতো পাবেই, আল্লাহ পাকের দান স্বরূপ তার চেয়ে বাড়তিও অনেক কিছু লাভ করবে যা হবে তাদের জন্যে কল্পনাতীত।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, একথার তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বন্দাদেরকে তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেয়ার পরও নিজের দয়ায় তা বহু-গুণে বাড়িয়ে দেবেন।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করতে দেয়ার পর তাদেরকে আল্লাহ পাক দয়া করে তাঁর দীদার নসিব করবেন, এটিই হবে তাদের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।[১]

এবনে আবি হাতেম এবং আবু নাঈম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ

বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ

বাক্যটির অর্থ হলো যাদের সম্পর্কে দোযখের আদেশ হবে, তাদের পক্ষে সুপারিশের সুযোগ দান করা হবে। এটিই হবে তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ।

إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত মার্জনা-প্রিয়, তিনি গুণগ্রাহী, বন্দাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ক্ষমা করে থাকেন, ভক্ত প্রেমিক বন্দার সত্য-সাধনার কদর করে থাকেন এবং যার আমলের যা প্রাপ্য তার চেয়ে তাঁর রহমতের অন্তহীন ভাণ্ডার থেকে তিনি অনেক বেশী দান করেন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯৩

হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'তিনি মার্জনা-প্রিয়' একথার তাৎপর্য হলো, তিনি বন্দার বড় বড় গুনাহকে মাফ করে দেবেন, আর তিনি 'গুণগ্রাহী', একথার তাৎপর্য হলো, বন্দার নেক আমল সামান্য হলেও তিনি তার সওয়াব অনেক বেশী দান করবেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে হাসিন এবনে হারিস এবনে আবদুল মোত্তালেব এবনে আবদে মনাফ সম্পর্কে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আমল করার সময় বন্দা যা কল্পনাও করেনি, আল্লাহ পাক তাকে এত বেশী সওয়াব দান করবেন, আর তিনি যখন সওয়াব দান করবেন, তখন 'অতীব মার্জনা-প্রিয়' হবার কারণে আল্লাহ পাক বন্দার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরবেন না, আর 'অত্যন্ত গুণগ্রাহী' হবার কারণে বন্দার আমলের চেয়ে অনেক বেশী সওয়াব দান করবেন।[২]

وَالَّذِيٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ

'(হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা-ই সঠিক, তা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমর্থক, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের অবস্থা খুব ভাল ভাবেই জানেন, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন'।

ইতোপূর্বে তৌহিদের বিবরণ ছিল, এরপর তৌহিদ-ভিত্তিক একটি কর্মসূচীর উল্লেখ করে, তার বাস্তবায়নকারীদের জন্যে অশেষ সওয়াবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

মূলতঃ দ্বীন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দু'টি (১) আল্লাহ পাকের একত্ববাদে তাঁর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। (২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলা।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহিদ সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াত থেকে ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক শিক্ষা নবুওয়্যত ও রেসালত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১০
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২

وَالَّذِىٓ اَوۡحَيۡنَآ اِلَيۡكَ مِنَ الۡكِتٰبِ هُوَ الۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ

(আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের কারো কারো নিকট আসমানী কিতাবও নাযিল করেছেন। এমনিভাবে (হে রসূল!) আপনাকে আমার রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি) এবং আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তথা পবিত্র কোরআন তা-ই সঠিক, শুধু তাই নয়, বরং পবিত্র কোরআন পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমর্থকও অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট যে তওরাত নাযিল হয়েছে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যে ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে, পবিত্র কোরআন ঐ গ্রন্থ সমূহেরও সত্যায়নকারী।

অতএব, পবিত্র কোরআন মেনে চলা এবং এর শিক্ষার বাস্তবায়ন করা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيۡرٌۢ بَصِيۡرٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের অবস্থা খুব ভালভাবেই জানেন (এবং তাদের প্রতি) লক্ষ্য রাখেন'। অর্থাৎ কে আল্লাহর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কে পবিত্র কোরআনকে মেনে চলে, এমনিভাবে কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা জ্ঞান করে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। অতএব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করা এবং তাঁর অনুসরণে আত্মনিয়োগ করা পরিণামদর্শী প্রত্যেকটি মানুষের একান্ত করণীয় কাজ।

اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيۡرٌۢ بَصِيۡرٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের সম্পর্ক খুব ভালভাবেই জানেন, (তাদের প্রতি) লক্ষ্য রাখেন'।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে যেমন অবগত তেমনি তাদের অপ্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল। তাই আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের নিকট তাঁদের কল্যাণার্থে তথা তাদের হেদায়েতের লক্ষ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন।

ثُمَّ اَوۡرَثۡنَا الۡكِتٰبَ الَّذِيۡنَ اصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَا ۚ

'এরপর আমি এই কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম আমার বন্দাদের মধ্যে সে সব লোককে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি'।

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে আল্লাহ্ পাক তাঁর উম্মতকে মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকারী করেছেন।

পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকারী কে?

আলোচ্য আয়াতে عبادنا শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সরাসরি পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেছেন এবং শিখেছেন। আর তাঁদের নিকট থেকে 'তাবেঈ' গণ এবং তাঁদের থেকে 'তাবে তাবেঈন' পবিত্র কোরআনের শিক্ষা পেয়েছেন, এরপর উম্মতের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক হয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, এভাবে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়া পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকারী হয়েছে।[১]

আর একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়া সর্বোত্তম উম্মত। কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণা ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

(সূরা বাকারা ঃ ২ ঃ ১৪৩)

'আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে করে তোমরা সমগ্র মানব জাতির জন্যে সাক্ষী হও'।

এজন্যে মরমী কবি বলেছেন ঃ

طوبى لنا معشر الاسلام ان لنا
من العناية ركنا غير منهدم

'হে মুসলিম জাতি! আমাদের জন্যে সুসংবাদ এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাকের দান স্বরূপ আমাদের একটি মজবুত আশ্রয়-স্থল আছে, যা এত সুদৃঢ় যে কখনও ধ্বসে যাবেনা'।

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন এ উম্মতের আশ্রয়-স্থল, তাঁর উসিলায় আল্লাহ পাক এ উম্মতকে ক্ষমা করবেন, আখেরাতে উচ্চ মর্তবা দান করবেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯৪
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৭৮

لما دعى الله داعينا لطاعته
باكرم الرسل كنا اكرم الامم

'আল্লাহ পাক আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের মাধ্যমে যখন তাঁর আনুগত্যের জন্যে আহবান করেছেন, তখন আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম উম্মত হয়েছি'।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করা হয়েছে, তারা হল উম্মতে মোহাম্মদীয়া। এ উম্মত নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম, কিন্তু তারা সকলে এক সমান নয়। পরবর্তী আয়াতে আধ্যাত্মিক অবস্থার নিরীখে তাদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছে ঃ

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ج وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط

'তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী হয়েছে, কেউ মধ্যপন্থী, আর কেউ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী'।

অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীয়ার তিন ভাগের মধ্যে একভাগ হল এমন, যারা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও পাপাচারের মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকে, এভাবে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'হে আমার সে সব বন্দাগণ! যারা পাপাচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

দ্বিতীয় দল হল مقتصد তথা মধ্যপন্থী। তারা পাপাচারেও ডুবে থাকেনা, আর ওলী দরবেশও হয়না। মাঝামাঝি পথেই তারা থাকে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا

'আর এক দল আছে, যারা নিজেদের পাপাচারের কথা স্বীকার করেছে, যারা তাদের নেক আমলের সাথে কিছু বদ আমলও মিশিয়েছে'।

আর তৃতীয় দল হল, যারা আল্লাহ পাকের দানে, তাঁর বিশেষ রহমতে সত্য-সাধনায় সকলকে ছাড়িয়ে গেছে, ফরজ ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি কোন নফল বা মোস্তাহাব কাজও তারা ছাড়েনা, তাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের এমনি মহব্বত থাকে যে, সামান্য অশোভন কাজও তারা পরিহার করে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, مقتصد বা মধ্যপন্থী হল সে সব লোক যারা তাদের অধিকাংশ কাজই কোরআনের করীমের নির্দেশ মোতাবেক করে। আর সৎ কাজে অগ্রগামী লোকদের অবস্থা হল এই, তারা নিজেরা সর্বদা নেক আমল করে এবং এর পাশাপাশি অন্যকেও শিক্ষা দেয়, অন্যদেরকে হেদায়েত করতেও ত্রুটি করেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) আবু ওসমানের সূত্রে লিখেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট শুনেছি, তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যারা অগ্রগামী তারা অগ্রসর হতেই থাকবে, আর যারা মধ্যপন্থী তারা নাজাত পাবে, আর যারা জালেম তাদেরকে মাফ করা হবে'।

আল্লামা বগভী (রঃ) আবু সাবেতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো এবং এভাবে দোয়া করলো ঃ হে আল্লাহ! আমার ভ্রমণরত অবস্থায় আমার প্রতি দয়া কর, আমি একা, আমাকে কোন নেককার সাথী দান কর'। হযরত আবু দারদা (রাঃ) তখন সেখানেই ছিলেন, তিনি বললেন, 'যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হও, তবে আমি তোমার থেকেও অধিকতর ভাগ্যবান এজন্যে যে, তোমার সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়ে গেল'। আমি নিজে শুনেছি, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেছেন এবং বলেছেন, 'যারা অগ্রগামী তারা হিসাব ব্যতীতই জান্নাতে যাবে। আর যারা 'মোকতাসেদ' তথা মধ্যপন্থী তাদের হিসাব হবে তবে সহজ হবে, আর যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করবে তাদেরকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করানো হবে। তখন তারা চিন্তিত হয়ে যাবে, পরে তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে'। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

আহমদ, এবনে জরীর, তেবরানী, হাকেম এবং বায়হাকীও এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তবে তাদের বর্ণনায় একথাটি সংযোজিত হয়েছে যে, 'যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, হাশরের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে হিসাবের স্থানে দন্ডায়মান রাখা হবে, এরপর আল্লাহ পাকের রহমতে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে, তখন তারা–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

দোয়া খানি পাঠ করবে'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ওসামা এবনে যায়েদ (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'তিন প্রকার লোক এ উম্মতেরই হবে'। বায়হাকীও এই হাদীস সংকলন করেছেন।

তফসীরকার কা'ব এবং আতা (রঃ)-ও বলেছেন, তিন প্রকার লোকই জান্নাতে যাবে।

এবনে আবিদ দুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এসব লোক উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ পাক যে কিতাবই নাযিল করেছেন তার উত্তরাধিকারী করেছেন এ উম্মতকে, এ উম্মতের মধ্যে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, তাদেরও মাগফেরাত প্রদান করা হবে। আর যারা মধ্যপন্থী, তাদের হালকা হিসাব হবে, আর যারা অগ্রগামী, তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম আহমদ, তিরমিজী এবং বায়হাকী হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ 'এসব লোক একটি দলের ন্যায় হবে, আর সকলে জান্নাতে যাবে'।

ফরয়াবী (রঃ) হযরত বরা এবন আযেবের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ পাক এদের সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।

ওলামায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, এক ব্যক্তি মদীনা শরীফ থেকে দামেশকে হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি উদ্দেশ্য এসেছ'?

সে বললো, 'ঐ হাদীস শ্রবণ করার জন্যে যা আপনি বর্ণনা করেন,' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে আস নাই তো'?

আগন্তুক বললো, 'না'।

তোমার সফরের অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে কি?

সে বললো, 'না'।

তবে কি শুধু হাদীস শ্রবণের জন্যেই এই সফর করেছ?

আগন্তুক ঃ 'জ্বি-হ্যাঁ'।

তখন হযরত আবু দারদা (রাঃ) বললেন, 'শোন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (দ্বীনি) এলমের অন্বেষণে ভ্রমণ করে, আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাতের বাগানে ভ্রমণ করাবেন। আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাগণ এলম অন্বেষণকারীদের সম্মানার্থে তাদের জন্যে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন, কেননা ফেরেশতাগণ তালেবে এলমদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে আগ্রহী থাকেন। আলেমদের জন্যে আসমান জমীনের প্রত্যেকটি জিনিস এস্তেগফার করে এমনকি পানির মাছেরা পর্যন্ত। (একজন অ-আলেম) আবেদ ব্যক্তির উপর আলেমের ফজিলত এমন, যেমন চন্দ্রের ফজিলত রয়েছে তারকারাজির উপর। আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ উত্তরাধিকার স্বরূপ ধন-দৌলত রেখে যান না, তাঁদের উত্তরাধিকার হলো এলমে দ্বীন। যে ব্যক্তি এলমে দ্বীন হাসিল করলো, সে অত্যন্ত বড় সম্পদ অর্জন করলো।[১] (আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিজী শরীফ)

আবু আছেম এবং ইসবিহানী হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক বন্দাদের পুনরুত্থান করবেন, এরপর আলেমদেরকে ভিন্ন করে তাদেরকে সম্বোধন করবেন, 'হে আলেমদের দল! আমি তোমাদের মধ্যে এলম রেখেছিলাম, আমি তোমাদেরকে জানতাম, না জানলে তোমাদেরকে এলম দান করতাম না। আর তোমাদেরকে এলম দেয়ার পর তোমাদেরকে আযাব দেব তা হবে না। যাও, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি'।

তেবরানী হযরত সা'আলাবা এবনে হাকেমের সূত্রে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্ পাক যখন বন্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে স্বীয় কুরসীতে উপবেশন করবেন, তখন আলেম সমাজকে বলবেন, 'আমি তোমাদেরকে আমার এলম এবং হেকমত এজন্যে দান করেছিলাম, যেন তোমাদেরকে ক্ষমা করি। তোমাদের আমল যাই হোক আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি'।

এবনে আসাকের, আবু ওমর সানআনী হাফস এবনে মাইছারার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কেয়ামতের দিন আলেম সমাজকে পৃথক করে রাখা হবে। যখন মানুষের হিসাব নিকাশ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্ পাক আলেমদের লক্ষ্য করে এরশাদ করবেনঃ 'আমি তোমাদের নিকট আমার হেকমত রেখেছিলাম আর তা একটি কল্যাণের জন্যেই রেখেছিলাম। আজ সে কল্যাণ তোমাদেরকে দান করতে চাই, তোমাদের দ্বারা যা কিছুই হোক না কেন তোমরা জান্নাতে চলে যাও'।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৮১

আকাবা এবনে সাবহান বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট

اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ

(আলোচ্য আয়াত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হে আমার সন্তানতুল্য! এরা সকলেই জান্নাতে যাবে। যারা অগ্রগামী তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগেই বিদায় গ্রহণ করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, আর যারা মধ্যপন্থী তারা সে সব লোক, যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর নিকট পৌঁছে গেছেন। আর যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছেন, তারা আমার ন্যায়, তোমাদের ন্যায় লোক। উম্মুল মোমেনীন নিজেকেও আমাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন ঃ ইতোপূর্বে যে তিন প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা সকলেই উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত। যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, তারা হলো সে সব লোক যারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত করে, যা বৈধ, এমন হক্ব থেকেও তারা নিজেদেরকে দূরে রাখে, যারা কঠোর সাধনায় রত থাকে। দ্বিতীয় দল মধ্যপন্থীদের, যারা নিজেদেরকে আনন্দ-উল্লাসে মত্ত রাখেনা, কিন্তু নিজের প্রবৃত্তির হক্ব আদায় করে, নফল রোজা রাখে আবার মাঝে মধ্যে ছেড়েও দেয়, রাত্রিকালে নফল নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়েও পড়ে, তারা বিয়ে-শাদী করে পারিবারিক জীবন যাপন করে, বৈধ বস্তু পানাহার করে, সুন্নতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে, এরাই সে সব লোক যাদের সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে'।

তৃতীয় দল হলো অগ্রগামী লোকদের তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম এবং সিদ্দীকগণ।

আলোচ্য আয়াতে ظالم لنفسه অর্থাৎ নিজেদের প্রতি জুলুমকারীদের কথা সর্ব প্রথম উল্লেখ করার কারণ হলো, তাদের সংখ্যা বেশী, আর অগ্রগামী দলের কথা সব শেষে বলার কারণ হলো তাদের সংখ্য সবচেয়ে কম। মধ্যপন্থীদের সংখ্যা মধ্যম, তাই তাদেরকে মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

অতএব, পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত বন্দা বলে যাদেরকে ঘোষণা করা হয়েছে তারা উল্লেখিত সকল স্তরের লোকই তথা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়া।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১৩

পাপী তাপী মোমেনগণও ঈমানের বরকতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআতে মাগফেরাত লাভ করবে এবং অবশেষে জান্নাতে যাবে।

মধ্যপন্থীরা নিরাপদ, অগ্রবর্তী লোকেরা লাভ করবেন সর্বোচ্চ মর্যাদা।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

এটিই তো বিরাট মর্যাদা, এটিই জীবন-সাধনার সাফল্য।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকারী বানানো, অথবা বন্দাদেরকে এজন্যে মনোনীত করা নিঃসন্দেহে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

'তারা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ এবং মুক্তার গহনা পরানো হবে, আর সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের'।

ইতোপূর্বে যে তিন প্রকার লোকের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্পর্কেই জান্নাতের এ খোশ-খবরী। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করে এরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণকে মুকুট পরানো হবে, যার একটি সাধারণ মুক্তার আলো সারা পৃথিবীকে আলোকিত করবে। (তিরমিজী, হাকেম, বায়হাকী)

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন যে, তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কোন জান্নাতবাসী এমন হবেনা যার হাতে তিনটি কাঁকন থাকবেনা, একটি স্বর্ণের, আরেকটি রৌপ্যের এবং আরেকটি মুক্তার।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হাতের যে স্থান পর্যন্ত অজুর পানি পৌছে, সে পর্যন্ত মোমেনের অলংকার থাকবে।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা রেশমের পোষাক পরিধান করোনা, স্বর্ণ রৌপ্যের তৈরী পাত্রে আহার করোনা, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্যে, আর তোমাদের জন্যে আখেরাতে।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে দুনিয়াতে রেশমী পোষাক পরিধান করবে সে আখেরাতে তা পাবেনা।

এবনে আবিদ দুনিয়া হযরত কা'ব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যদি জান্নাতের কোন পোষাক দুনিয়াতে পরিধান করা হয়, তবে যে তা দেখবে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, কেননা কারো দৃষ্টি শক্তি তা সইতে পারবেনা।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পুরুষের জন্যে স্বর্ণের অলংকার এবং রেশমী পোষাকের ব্যবহার দুনিয়াতে নিষিদ্ধ হলেও বেহেশতে জায়েয হবে।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا
لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾
وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ
تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৪) এবং তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করে দিয়েছেন, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত মার্জনা-প্রিয়, অতীব গুণগ্রাহী'।

(৩৫) যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন, যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করেনা এবং কোন ক্লান্তিও হয়না।

(৩৬) আর যারা কাফের, তাদের জন্যে রয়েছে দোযখের আগুন, তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে তারা মরে যাবে। আর তাদের জন্যে দোযখের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ, নাফরমানের শাস্তি বিধান করে থাকি।

(৩৭) সেখানে তারা চিৎকার করতে থাকবে (এই বলে), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (দোযখ থেকে) বের করে দিন, আমরা ভাল কাজ করবো,

পূর্বে যা করতাম তা আর করবো না। (আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ) আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু আয়ু প্রদান করিনি যে, তখন কেউ ইচ্ছা করলে সতর্ক হতে পারতো? আর তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল, অতএব শাস্তি ভোগ করতে থাক, জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতবাসীদের জান্নাতে যে মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য নেয়ামত প্রদান করা হবে, তার আংশিক বিবরণ ছিল, আর এ আয়াতে জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করে তাঁর দরবারে যেভাবে শোকর আদায় করবেন তার বিবরণ দেয়া হয়েছে, এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ط

'আর জান্নাতবাসীগণ বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা দূরীভূত করেছেন'।

জান্নাতে সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে

আলোচ্য আয়াতের الحزن। শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। الحزن। শব্দটির অর্থ হলো দুশ্চিন্তা। প্রশ্ন হলো কিসের দুশ্চিন্তা? হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো দোযখে পতিত হবার দুশ্চিন্তা। বেহেশতে প্রবেশ করার পর যখন দোযখের শাস্তির ব্যাপারে বেহেশতবাসীগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবেন, তখন তারা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে একথা বলবেন।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এ হলো মৃত্যুর দুশ্চিন্তা।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ দুশ্চিন্তা হলো অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তা অর্থাৎ তাদের সাথে কী ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত ছিলেন না, আযাবের ভয় এবং দুশ্চিন্তা সর্বক্ষণ তাদের ছিল, কিন্তু বেহেশতে প্রবেশের পর আল্লাহ পাক তাদের সে দুশ্চিন্তা দুরীভূত করেছেন।

একরামা (রঃ) বলেছেন, জীবনে কৃত যাবতীয় পাপাচারের পরিণতির দুশ্চিন্তা এবং নেক আমল করা হলেও তা কবুল না হওয়ার দুশ্চিন্তা। বেহেশতে প্রবেশের পর এসব দুশ্চিন্তা দূর হবে, তাই আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে বেহেশতবাসী একথা বলবে।

কালবী (রঃ) বলেছেন, দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের ব্যাপারে যে দুশ্চিন্তা থাকে, الحزن। শব্দ দ্বারা তাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার সায়ীদ এবনুল যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, الحزن। শব্দটি দ্বারা দুনিয়ার জীবনে রুজি-রোজগারের যে দুশ্চিন্তা থাকে তা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা বেহেশতে প্রবেশের পর বেহেশতবাসীর রুজি-রোজগারের কোন চিন্তা থাকবেনা, যে চিন্তা সর্বক্ষণ পৃথিবীর মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, الحزن। শব্দটি দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের দুশ্চিন্তাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)-ও লিখেছেন, الحزن। শব্দটি দ্বারা সকল দুশ্চিন্তাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা দুনিয়ার হোক বা আখেরাতের।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, এ জীবনে যারা পাপাচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, তারা কেয়ামতের দিন সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, সে দুশ্চিন্তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কালবী (রঃ) বলেছেন, শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হবার দুশ্চিন্তা, বেহেশতে প্রবেশের পরই এ দুশ্চিন্তা দূরীভূত হবে।[২]

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তিনি তাদেরও ক্ষমা করবেন। আর তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী, যারা মধ্যপন্থী অথবা অগ্রগামী, তিনি তাদের গুণগ্রাহী, তাদেরকে তাদের আমলের চেয়েও অনেক বেশী সওয়াব দান করবেন।

الَّذِيٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِۦ

'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন,' কেননা ইতোপূর্বে দুনিয়াতে অথবা মধ্যলোকে কোথাও মানুষের স্থায়ী আবাসস্থল ছিলনা, সবই ছিল নিতান্ত সাময়িক ব্যবস্থা। দুনিয়াতে কারোই স্থায়ী আবাসস্থল হয়না, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে মানুষ শুধু আল্লাহ পাকের ডাকের অপেক্ষায় থাকে, একই অবস্থা মধ্যলোকেও, কেয়ামতের দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এর অপেক্ষায় থাকতে হয় প্রত্যেককে, কিন্তু বেহেশতের অবস্থা তেমন নয়; বরং বেহেশত হয় মানুষের স্থায়ী আবাস স্থল। আর তাই বেহেশতে প্রবেশের পর লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে এবং আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে একথা বলবে।

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

'যেখানে কোন দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করেনা এবং কোন ক্লান্তিও হয়না'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১৬
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯৯

শানে নুযুল

বায়হাকী 'আল বাসে' এবং এবনে আবি হাতেম এবনে হারেসের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আওফার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি আরজ করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! নিদ্রার কারণে আমাদের নয়ন যুগল সুশীতল হয় তবে জান্নাতে নিদ্রা আসবে কি'? তিনি এরশাদ করেন 'না'। নিদ্রা তো মৃত্যুরই অংশ বিশেষ। আর জান্নাতে মৃত্যু নেই'। তখন প্রশ্নকারী পুনরায় প্রশ্ন করলো, 'জান্নাতে আরাম কিভাবে পাওয়া যাবে'? প্রশ্নকারীর একথাটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বেআদবী মনে হলো। তিনি এরশাদ করলেন, 'জান্নাতে কোন প্রকার ক্লান্তিই আসবেনা, জান্নাতবাসীর প্রত্যেকটি কাজে শুধু আনন্দই থাকবে'। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

অর্থাৎ সেখানে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট বা ক্লান্তি আমাদেরকে স্পর্শও করেনা।[২]

হাদীস শরীফে রয়েছে, যারা কলেমা তৈয়্যেবা পাঠ করবে, তারা কবরে হাশরে কোথাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেনা।

তেবরানীতে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, মৃত্যুর সময় মোমেন বন্দার কোন ভয় হবেনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মোমেন বন্দার বড় বড় গুনাহকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেক আমলগুলোর অধিকতর মূল্যায়ন করা হবে, তখন মোমেন বন্দাগণ জান্নাতে পৌঁছে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবেন, তারা উপলব্ধি করবেন যে আমাদের আমল এর উপযুক্ত নয় যা আমরা জান্নাতে লাভ করেছি।[৩]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ج لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ط

'আর যারা কাফের, তাদের জন্যে রয়েছে দোযখের আগুন, তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরে যাবে। আর তাদের জন্যে দোযখের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১৭
২। তফসীরে আদদুররুল মানুসর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭৫
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৮২

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের শুভ পরিণতি তথা জান্নাতের অকল্পনীয় নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যারা এ জীবনে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহ্‌রহ ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করেছে, কখনো নেয়ামত দাতাকে স্মরণ করেনি; তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, যাঁরা তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদেরকেও তারা অবিশ্বাস করেছে, আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে দোযখের কঠিন শাস্তি। তারা দোযখের শাস্তির কারণে একাধারে আর্তনাদ করতে থাকবে, কিন্তু তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে কখনো রেহাই দেয়া হবেনা, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবেনা যে, মৃত্যুর মাধ্যমে তারা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে, পক্ষান্তরে দোযখের আযাবও এতটুকু লাঘব করা হবেনা। যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ তাদের শাস্তি এভাবেই হয়।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যারা চির দোযখী হবে, সেখানে কখনো তাদের মৃত্যু আসবেনা। আর তারা দোযখের শাস্তি থেকে নিস্তারও পাবেনা। দোযখবাসীরা দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে বলবে, 'আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের জন্যে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেন', কিন্তু তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা এখানেই পড়ে থাক'। কাফেররা তখন মৃত্যুকে আরামদায়ক মনে করবে, কিন্তু সে মৃত্যুও তাদের নিকট আসবেনা, যেমন কোরআনে করীমেই এরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

'সেখানে তাদের মৃত্যুও হবেনা আর জীবনও পাবেনা'।

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا

'আর তাদের আযাব এতটুকু লাঘব করা হবেনা'।

অর্থাৎ দোযখীদেরকে যেমন মৃত্যুর মাধ্যমে আযাব থেকে রেহাই দেয়া হবেনা, তেমনি তাদের আযাব লাঘবও করা হবেনা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে চলে যাবে এবং দোযখীদেরকে দোযখে পৌঁছানো হবে, তখন মৃত্যুকে জান্নাত এবং দোযখের মধ্যস্থলে জবেহ করা হবে এবং একজন ঘোষক এ ঘোষণা করবে, 'হে জান্নাতবাসীগণ! আর মৃত্যু নেই', 'হে দোযখবাসীরা! আর মৃত্যু নেই'। এ ঘোষণা শ্রবণ করে জান্নাতবাসীগণ পরম আনন্দ লাভ করবেন, পক্ষান্তরে, দোযখীদের দুঃখের সীমা থাকবেনা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে একথাটি সংযোজিত হয়েছে যে, মৃত্যুকে সেদিন একটি দুম্বার আকৃতি দিয়ে আনা হবে। এরপর জবেহ করে মৃত্যুকে চির বিদায় দেয়া হবে।

আর ক্ষণিকের জন্যেও দোযখীদের শাস্তি এতটুকু লাঘব করা হবেনা; বরং দোযখীদের দেহের চামড়া যখন শাস্তির কারণে বিনষ্ট হয়ে যাবে তখন সে স্থলে নতুন চামড়া দিয়ে দেয়া হবে। যখন অগ্নি কমবে তখন তাকে আরো সতেজ করা হবে।

كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ

'এভাবেই আমি আখেরাতে প্রত্যেক অবাধ্য, অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি'।

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط

'সেখানে তারা চিৎকার করতে থাকবে এবং বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে একটিবার দোযখ থেকে বের হতে দিন এবং পুনরায় দুনিয়াতে যেতে দিন। পূর্বের ন্যায় মন্দ কাজ আর করবো না, এবার ভাল কাজ করবো'। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোযখীদের দুনিয়ার কর্মকান্ডের ব্যাপারে আক্ষেপ এবং অনুতাপ হবে, এজন্যে তারা বিলাপ করে কেঁদে কেঁদে বলবে, 'আমাদেরকে একটিবার সুযোগ দিলে আমরা পূর্বের ন্যায় মন্দ কাজ আর করবো না, সাধু-সজ্জন হয়ে জীবন যাপন করবো এবং আখেরাতের সম্বল নিয়ে হাযির হবো'।

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ

(আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে জবাব দেয়া হবে) আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু আয়ু প্রদান করিনি? যে তখন কেউ ইচ্ছা করলে সতর্ক হতে পারতো, অর্থাৎ তোমাদেরকে দুনিয়াতে সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছিল, ইচ্ছা করলে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারতে, উপদেশ গ্রহণ করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহ করতে পারতে, কিন্তু তোমরা তা করনি, এখন বিলাপ করলে কোন লাভ হবে না। আলোচ্য আয়াতে যে আয়ুর কথা বলা হয়েছে, যা আখেরাতের প্রস্তুতির জন্যে যথেষ্ট, তা কত? তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাবে একাধিক মত পোষণ করেন।

কাতাদা (রঃ) আতা (রঃ) এবং কালবী (রঃ)-এর মতে, এর দ্বারা আঠার বছর উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) বলেছেন, এ সময় হলো ২০ বছর।

হাসান বসরী (রঃ) এক্ষেত্রে চল্লিশ বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ সময় হলো ২০ থেকে ৬০ বছর।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর মতে, ষাট বছর উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা এটি এমন একটি সময় যার পরে আর কোন ওজর-আপত্তি কারোই থাকতে পারেনা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম্ এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন কোন ব্যক্তিকে ষাট বছর পর্যন্ত পৌঁছে দেন, এরপর তিনি তার তরফ থেকে আর কোন ওজর কবুল করেন না, অর্থাৎ সত্য গ্রহণের জন্যে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহের জন্যে এ সময়সীমা যথেষ্ট, যদি এর মধ্যে কেউ ভবিষ্যত চিন্তা না করে, আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ না করে গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকে, জীবনের ষাটটি বসন্ত হেলায় হারিয়ে ফেলে, তবে আখেরাতে তার আর কোন ওজর-আপত্তি চলবেনা।[১]

তেবরানী এবং এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হবে, 'ষাট বছর বয়স্ক লোকেরা কোথায়'? কেননা, এ বয়সের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন আলোচ্য আয়াতঃ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যে ব্যক্তির বয়স ষাট বছর হয়ে গেছে, তার সত্য গ্রহণ না করার ব্যাপারে আর কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হয়না, কেননা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত হবে আর সত্তর-উর্দ্ধ লোকের সংখ্যা কম হবে।

এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরজ এবাদত কাযা করার কোন ন্যায্য কারণ থাকেনা, অতএব ঈমান না আনারও কোন ওজর গ্রহণযোগ্য হয়না।

وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ط

'অধিকন্তু তোমাদের নিকট এসেছে সতর্ককারী'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২০১

অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন, তিনি বিশ্ববাসীকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা সে আহবানে সাড়া দাওনি, তিনি তোমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করেছেন কিন্তু তোমরা সে কথায় কর্ণপাত করোনি, সত্য উপলব্ধি করার জন্যে তোমাদেরকে সুদীর্ঘ বয়স দেয়া হয়েছে, যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে কিন্তু তোমরা তার সদ্ব্যবহার করোনি, দ্বিতীয়তঃ তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল আগমন করেছেন, তোমরা এরপরও সতর্কতা অবলম্বন করোনি, অতএব, তোমাদের অনিবার্য ভয়াবহ পরিণতির জন্যে তোমরা প্রস্তুত হও, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَذُوقُوا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

অতএব, শাস্তির আস্বাদ ভোগ করতে থাক, জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই, এমন জালেমদেরকে সাহায্য করার সাধ্য কারোই নেই।

আলোচ্য আয়াতে النذير। (সতর্ককারী) শব্দটি দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ মতই পোষণ করেছেন।

এবনে আবি হাতেম সুদ্দীর (রঃ) এবং এবনে জরীর যায়েদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তারাও এ মতই পোষণ করেছেন। অবশ্য কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ শব্দটি দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যদিও সতর্ককারী রূপে সকল নবী রসূলগণই আগমন করেছেন এবং সমস্ত আসমানী কিতাবও এ উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এ উম্মতের জন্যে পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই সতর্ককারীর ভূমিকায় রয়েছেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সতর্ককারী হলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আর বিবেক-বুদ্ধিই মানুষকে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনয়নে উদ্বুদ্ধ করে। একজন মানুষ যদি পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়ও অবস্থান করে, কখনও কারো সঙ্গে তার দেখা হয়নি, এমন অবস্থায়ও তার বিবেক বুদ্ধির কারণেই আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন অবশ্য কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করেই তাকে তার স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনতে হবে। যদি কেউ তা না করে, তবে সে কাফের হিসেবেই পরিগণিত হবে।

তফসীরকার একরামা, সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহর (রঃ) মতে, আলোচ্য আয়াতের النذير। শব্দটি দ্বারা বৃদ্ধকালের সাদা চুল উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বৃদ্ধকালের সাদা চুল মৃত্যুর বার্তা বাহক।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যার একটি চুলও সাদা হয়েছে সে বলে, এবার তুমি তৈরী হও, মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে, অতএব সাদা চুলও সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করছে।

আর কোন কোন তফসীরকারগণ বলেছেন, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুও সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে। অতএব, সতর্ককারী থাকা সত্ত্বেও যারা সতর্কতা অবলম্বন করেনা, সত্যকে গ্রহণ করেনা, নিঃসন্দেহে তারা জালেম, তাদের শাস্তি অবধারিত, আর তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এমন কেউ নেই, তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে তেমন সাধ্য কারোই নেই।[১]

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَن
كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا
مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ
شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا
مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا
فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم
بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৮) আল্লাহ পাক আসমান জমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন, নিশ্চয় তিনি অন্তর সমূহের যাবতীয় গোপন কথা জানেন।

(৩৯) তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। অতএব, কেউ কুফরী ও নাফরমানী করলে তার কুফরীর পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানী শুধু তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ-ই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানী তাদের ক্ষতি ব্যতীত কিছুই বাড়ায় না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫১৯-২০

(৪০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, সেই দেব দেবীদের কথা আদৌ ভেবে দেখেছো কি? আমাকে দেখাও, যদি তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকে, অথবা আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? নাকি আমি তাদেরকে এমন কোন গ্রন্থ প্রদান করেছি, যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বরং পাপীষ্ঠরা তাদের পরস্পরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহিদের প্রমাণ এবং শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত এবং গুণাবলীর বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক তাঁর পরিপূর্ণ এলম সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আসমান জমীনের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত। শুধু তাই নয়, বরং মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যেসব ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবহিত। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, মানুষের জীবনের সকল অবস্থা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। পূর্ববর্তী আয়াতে দোযখীদের আর্তনাদের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তারা দোযখের শাস্তি-যন্ত্রণায় অধৈর্য হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে এই ফরিয়াদ করবে যে, একটিবার অন্ততঃ তাদেরকে দোযখ থেকে বের হয়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়া হোক। তাহলে তারা পূর্বের ন্যায় আর মন্দ কাজ করবে না; বরং এবার সৎ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে।

আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাদের এ উক্তির জবাবে এরশাদ করেছেনঃ মানুষের অবস্থা, তাদের মনের সব গোপন কথা, তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আল্লাহ পাক ভালো করেই জানেন। কাফেররা যত শপথ করেই বলুক না কেন যে, আর অন্যায় করবে না, নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হবার কারণেই তারা একথা বলে, একটু ছাড় পেলেই কোন সন্দেহ নাই তারা তাদের পুরানো অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করবে একথা আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানেন। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

'যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তবে তারা পুনরায় সে মন্দ কাজই করবে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল'।

আর যেহেতু আল্লাহ পাক তাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট পৃথিবীর কোন কিছুই গোপন নেই, তাই তাঁর জ্ঞান মোতাবেকই তাদের সাথে ব্যবহার করা হবে এবং তাদেরকে দোযখ থেকে বের হতে দেয়া হবেনা।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন, যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে কাফেররা যতদিন পৃথিবীতে ছিল ততদিনই কুফরী ও নাফরমানী করেছে। তাদের শাস্তি হলে তাদের জীবনের দিনগুলোর হিসাব মোতাবেকই হবে, এর বেশী নয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ পাক তাদের পূর্বাপর সব কিছু জানেন, তাই তিনি একথাও জানেন, যদি তাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন দেয়া হতো, তবু তারা চিরদিনই কাফের থাকত। এজন্যে তাদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন যে কাফেরদেরকে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করানো হলে তারা পুনরায় কুফরী, নাফরমানী ও যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত হবে, তাই তাদের শাস্তি সর্বদা অব্যাহত থাকবে।[২]

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ط فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ط وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ج وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا

‘তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন, অতএব কেউ কুফরী ও নাফরমানী করলে তার কুফরীর পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানী শুধু তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানী তাদের ক্ষতি ব্যতীত কিছুই বাড়ায় না’।

অর্থাৎ হে মানব জাতি! লক্ষ কর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আল্লাহ পাকের এ দানের জন্যে তাঁর শোকর গুজার হওয়া, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আত্মনিয়োগ করাই তোমাদের কর্তব্য। যদি মহান দাতা আল্লাহ পাকের অগণিত নেয়ামত ভোগ করেও তোমরা তাঁর অকৃতজ্ঞ থাক, তবে তার পরিণতিতে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তোমরা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনবে।

১। তফসীরে রূহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২০১-২০২
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৩০

ইতোপূর্বে পৃথিবীতে যারা ছিল, আল্লাহ পাক তাদেরকে বিদায় করে দিয়েছেন তাদের স্থলে তোমাদেরকে এনেছেন। পূর্ববর্তীদের নাফরমানীর শাস্তি দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল, কিন্তু তোমরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করোনি, অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করোনি, এমন অবস্থায় যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, তাকে তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এতে আল্লাহ পাকের কিছুই যায় আসেনা, কিন্তু তোমাদের না-শোকরী ও কুফরীর শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। তোমাদের না-শোকরী ও নাফরমানী আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি বাড়াবে আর তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ج اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ج بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেই দেব-দেবীদের কথা আদৌ ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও যদি পৃথিবীতে তারা কিছু সৃষ্টি করে থাকে, অথবা আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? নাকি আমি তাদেরকে এমন কোন গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা যার প্রমাণের উপর নির্ভর করে? বরং পাপীষ্ঠরা তাদের পরস্পরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, আপনি এই কাফের মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক কর, আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে নিজেদের মনের বাসনা পূর্ণ করার জন্যে ডাক, আমাকে দেখাও, তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? কিংবা আসমানের কোন অংশ কি তারা সৃষ্টি করেছে? যদি তা না করে থাকে তাহলে বল, তাদের ক্ষমতার দৌড় কতটুকু? আর কোন্ যুক্তিতে তোমরা তাদের সম্মুখে মাথানত কর? কোন্ কারণে তাদের প্রতি তোমাদের অন্তরের ভক্তি- অনুরক্তি উজার করে দাও? কোন্ যুক্তিতে তারা তোমাদের উপাস্য হল? যখন তাদের কোন ক্ষমতা নাই, বিশ্ব সৃষ্টিতে তাদের কোন অবদান নেই এমন অবস্থায় তারা কখনও উপাস্য হতে পারে না। অথবা তাদের নিকট আমার এমন কোন গ্রন্থ রয়েছে কি? যাতে শেরক ও কুফুরীর কোন দলিল প্রমাণ রয়েছে?

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি মক্কার কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কোন গ্রন্থ দিয়েছি, যাতে শেরক ও কুফরের কোন প্রমাণ রয়েছে'?

بَلْ إِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُوْرًا

'বরং এই জালেমরা একে অন্যকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

তারা পরস্পরকে শুধু প্রতারণা করেছে, তাদের শেরক ও কুফরের কোন যুক্তি নেই। (হে রসূল!) এই কাফেররা একদিকে একে অন্যকে প্রতারণা করছে অন্যদিকে তারা আত্মপ্রতারিত হচ্ছে। আর তারা একথা বলে যে তাদের দেবতারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে, এটিও নির্জলা মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা দেখেও দেখেনা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। তাই তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের পরিণাম ভয়াবহ।

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
أَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ
بَعْدِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ
أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى
الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا
فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا
بِأَهْلِهٖ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৪১) নিশ্চয় আল্লাহ পাক আসমান সমূহ ও জমীনকে ধরে রেখেছেন, যেন তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ

তাদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত সহনশীল, অতীব ক্ষমা-প্রিয়।

(৪২) আর এই মুশরেকরা আল্লাহ পাকের নামে অত্যন্ত দৃঢ় শপথ করে বলতো, যদি তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে, তবে তারা অন্য সকল সম্প্রদায় থেকে অধিকতর উত্তমভাবে সুপথে চলবে, এরপর যখন সতর্ককারী আগমন করেন তখন তা শুধু তাদের বৈরী ভাবই বৃদ্ধি করলো।

(৪৩) পৃথিবীতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যে তাদের হীন ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পেল, আর হীন ষড়যন্ত্রের কুফল ষড়যন্ত্রকারীদের উপরই পতিত হয়ে থাকে। তবে কি তারা তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের অপেক্ষা করছে? (হে রসূল!) আপনি কখনও আল্লাহ পাকের নিয়মে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেন না। আর আল্লাহ পাকের নিয়ম কানুনে কখনো কোন ব্যতিক্রমও দেখতে পাবেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক ব্যতীত যেসব দেব-দেবীর সম্মুখে কাফের মুশরেকরা মাথা নত করে, তাদের কোন শক্তি নেই, আসমান জমীনের সৃজণে তাদের কোন অংশ নেই। এ অসহায়, অপদার্থ বস্তুর সম্মুখে মাথা নত করা মানবতার অবমাননা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম শক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক আসমান সমূহ ও জমীনকে ধরে রেখেছেন যেন তারা স্থানচ্যুত না হয়'। জমীন এবং আসমান সমূহকে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী হস্তে ধরে রেখেছেন, যেন তারা নড়াচড়া না করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতে, তাঁর কৃপাগুণে আসমান জমীনকে স্থবির করে রেখেছেন, তারা দুলতে পারেনা, নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়না, এটিই মহান আল্লাহ পাকের মহাশক্তি যে, তিনি তার একটি আদেশ ক্রমে আসমান সমূহকে এবং বিশাল বিস্তৃত জমীনকে এভাবে স্থির করে রেখেছেন। আর এটি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি বিশেষ দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর যতদিন এ পৃথিবী আছে তথা যতদিন আল্লাহ পাক পৃথিবীকে এভাবে রাখা পছন্দ করবেন, ততদিন তা এভাবেই থাকবে। যখন কেয়ামত হবে তখন আসমান জমীনের এ অবস্থা শেষ হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আসমান এবং জমীনের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভর করে। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ط

'আর যদি আসমান জমিন স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তাদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারবেনা'। এটি আল্লাহ পাকের মহা শক্তিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, আসমান জমীন তাঁর মর্জি মোতাবেক স্ব-স্ব স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যদি আসমান জমিন নড়ে যায়, তবে এগুলোকে ধরে রাখার ক্ষমতা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারোই নেই।

হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতের আয়না ভেঙে গেল

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দু'টি আয়না দেয়া হয়েছিল, যেন হাতে রেখে দেন এবং জীব্রাঈল (আঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছিল যেন মূসা (আঃ)-কে কখনও নিদ্রিত হতে দেয়া না হয়। হযরত মূসা (আঃ) এভাবে তিনটি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছিলেন। অবশেষে নিদ্রা তাঁকে পেয়ে বসে এবং আয়নাগুলো তাঁর হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'হে মূসা! যদি আমি তন্দ্রাহত হতাম, তবে আয়নার ন্যায় এ আসমান জমীন ভেঙে চুরমার হয়ে যেত'।[১]

اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সহনশীল, অতীব ক্ষমা-প্রিয়'।

আল্লাহ পাক অত্যন্ত সহনশীল হবার কারণেই কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়ে রাখেন, দ্রুত এবং তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করেন না।

আর আল্লাহ পাক ক্ষমা-প্রিয় হবার কারণে গুনাহগার মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে থাকেন, যদি তিনি তা না করতেন, তবে মুসলমানগণ মাগফেরাত লাভ করতো না, আর কাফেররা অবকাশ পেতোনা, আসমান তাদের উপর ভেঙে পড়তো, জমীন তাদেরকে নিয়ে ধ্বসে পড়তো, যেমন ভূমিকম্পের সময় হয়।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج

১। তফসীরে আজিজী, পৃষ্ঠা-২৪৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭৭

'আর মুশরকরা আল্লাহ পাকের নামে দৃঢ় শপথ করে বলতো, 'যদি তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে তবে তারা অন্য সকল সম্প্রদায় থেকে অধিকতর উত্তমভাবে সুপথে চলবে। এরপর যখন সর্তককারী আগমন করেন, তখন তা শুধু তাদের বৈরী ভাবই বৃদ্ধি করলো'।

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম এবনে আবি হেলালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার কোরায়শরা বলতো যে, যদি আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে কোন নবী প্রেরণ করেন, তবে আমরা অন্যদের চেয়ে তাঁর অধিকতর অনুসরণ করবো। ইতোপূর্বে যত উম্মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের চেয়ে অনেক বেশী আমরা এই নবীর অনুগত থাকবো। তাই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বে মক্কার কোরায়শরা জানতে পেরেছিলো যে, ইহুদী নাসারারা তাদের নিকট প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিলো। এজন্যে তারা বলেছিলো, ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত হোক, তাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নবী রসূলগণ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। এরপর মক্কার কোরায়শরা আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিলো, যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের প্রতি কোন নবী রসূল আগমন করেন, তবে আমরা পূর্ববর্তী যে কোন উম্মতের চেয়ে সে নবীর অধিকতর অনুসারী হবো।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

'যখন তাদের নিকট সতর্ককারী আগমন করেন তখন তা শুধু তাদের বৈরী ভাব-ই সৃষ্টি করলো'।

অর্থাৎ যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো, যাঁর জন্যে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো এবং যার অনুসরণ করবে বলে শপথ করেছিলো, তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৈরীতা, শত্রুতা অনেক বেড়ে গেল। পরবর্তী আয়াতাংশে এ বৈরীতার দু'টি কারণ বর্ণিত হয়েছেঃ

اِسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ط

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭৭

পৃথিবীতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যে এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তারা উঠে পড়ে লাগলো।

তফসীরকার কালবী (রহঃ) বলেছেন যে, এ হীন ষড়যন্ত্র ছিল তাদের শেরকের ব্যাপারে ঐক্যমত হবার কারণ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, মূলতঃ তাদের ষড়যন্ত্র ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এভাবে যে তারা চেয়েছিলো তাঁকে বন্দী করতে অথবা হত্যা করতে অথবা দেশ থেকে বহিঃস্কার করতে। আর এসব অপরাধের ব্যাপারে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো, আর এটিই ছিল তাদের যৌথ ষড়যন্ত্র।

আল্লাহ পাক তাদের এ ষড়যন্ত্র বানচাল করার কথা এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ط

'আর হীন ষড়যন্ত্রের কুফল ষড়যন্ত্রকারীদের উপরেই পতিত হয়ে থাকে'।

একথার বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক দিনে, যারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় একটানা দীর্ঘ তেরটি বছর ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তারা বদরের দিন তার শোচনীয় পরিণতি ভোগ করেছে, তাদের কিছু লোক বদরের রণাঙ্গনে নিহত হয়েছে, আর কিছু লোক বন্দী হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ হীন ষড়যন্ত্রের অর্থ হলো শেরক। অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করার ধৃষ্টতা দেখায় তাদেরকেই ভোগ করতে হবে এর ভয়াবহ পরিণতি।[১]

সাময়িকভাবে যদিও কাফেরদেরকে আনন্দ-উল্লাসে মত্ত দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে তাদের কুফরী ও নাফরমানী, অঙ্গীকার ভঙ্গ, অহঙ্কার প্রভৃতি অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে। এমন জঘন্য অপরাধীদের শাস্তি ইতোপূর্বেও হয়েছে। এটি আল্লাহ পাকের চিরাচরিত নিয়ম। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ج

'তবে কি তারা তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের অপেক্ষা করছে'?

অর্থাৎ যেভাবে ইতোপূর্বে অবাধ্য কাফের মুশরেকদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে, মক্কার কাফেররাও কি সে ধ্বংসেরই অপেক্ষা করছে? কেননা ইতোপূর্বে যারা সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই কার্যকর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২৩

হয়েছে। ঘাতক নিজের আঘাতেই ধ্বংস হয়েছে। এটি আল্লাহ্ পাকের চিরাচরিত নিয়মঃ

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ج

'(হে রসূল!) আপনি কখনও আল্লাহ্ পাকের চিরাচরিত নিয়মে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেন না'।

কাফেরদের ধৃষ্টতা দেখলে মনে হয় যে, অতীতে যারা নাফরমানীর কারণে আযাব ভোগ করেছে, এ দুবৃত্তরাও সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিরই অপেক্ষা করছে, অথচ আল্লাহ্ পাকের চির শাশ্বত নীতির কোন পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম হয় না।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا

'আর আল্লাহ্ পাকের নিয়ম-কানুনে কখনও কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবেন না'।

অর্থাৎ এমন হবে না যে, অপরাধীরা পুরস্কৃত হবে আর নিঃস্পাপ লোকেরা শাস্তি ভোগ করবে, এ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

তরজমা

(৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল তা তারা দেখতে পেতো, তারা তো এদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী

ছিল। আল্লাহ পাক এমন নন যে আসমানে বা পৃথিবীতে কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিমান।

(৪৫) মানুষের কার্যকলাপের কারণে যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে (তাৎক্ষণিকভাবে) শাস্তি দিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণীকেই ছাড় দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। এরপর যখন তাদের সেই নিদৃষ্ট সময় উপস্থিত হবে (তখন আর রক্ষা নেই)। আল্লাহ পাক নিজেই তাঁর বন্দাদেরকে দেখে নেবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, এ কাফেররা কি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের অপেক্ষা করছে? ইতোপূর্বে যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছে, তাদের অন্যায় আচরণের দ্বারা এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসন্দুর করে তুলেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। তাই এ আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা পূর্ববর্তী দূরাত্মা কাফেরদের ধ্বংসাবশেষ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো? এ আরবদের পাশেই রয়েছে সিরিয়া, মিসর, ইরাক, ইয়ামন, আর সেখানেই সামুদ জাতি, আদ জাতি, ফেরাউন, নমরূদ এদের পরিণতি কী হয়েছিল? কিভাবে তাদেরকে তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি স্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। অথচ মক্কার কাফেরদের তুলনায় শৌর্যে-বীর্যে, ঐশ্বর্য্যে-সম্পদে পূর্বকালের কাফেররা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাদের জনবল, ধনবল তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রেহাই দিতে পারেনি। অতএব, অতীতের দূরাত্মা কাফেরদের পরিণতি দেখে এদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ط

'আর আল্লাহ পাক এমন নন যে আসমানে বা পৃথিবীতে কোন কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে'।

পৃথিবীর সমস্ত শক্তি একত্রিত করেও আল্লাহ পাকের কোন ইচ্ছাকে বাধা দেয়া সম্ভব নয়। যখন যাকে যেখানে ইচ্ছা তিনি পাকড়াও করতে পারেন। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এমন অবস্থায় অবাধ্য, নাফরমানরদেরকে পৃথিবীতে দৌরাত্ম করার অবকাশ কেন দেয়া হয়? এ প্রশ্নের জবাবেই রয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

'মানুষের কার্যকলাপের কারণে যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে (তাৎক্ষণিকভাবে) শাস্তি দিতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণীকেই ছাড় দিতেন না'।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম দয়ার কারণে মানুষের অনেক দোষ-ক্রটি তিনি ক্ষমা করেন। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না, তাই সকলে রক্ষা পাচ্ছে। যদি তিনি অপরাধীদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে একটি প্রাণীও রক্ষা পেতো না। কুফরী ও নাফরমানীর পরিণতিতে শুধু মানুষই ধ্বংস হতো না, প্রাণী জগৎও ধ্বংস প্রাপ্ত হতো। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে কাফেরদের কারণে তদানীন্তন পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংস হয়েছিল। হযরত নূহ (আঃ)-এর তরীতে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারাই শুধু রক্ষা পেয়েছিল।

মূলতঃ আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কৃপার কারণেই তিনি এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا

'এরপর যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেবেন'।[১]

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের عباد শব্দটি দ্বারা সকল বান্দাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অনুগত হোক বা অবাধ্য। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার আমল অনুপাতে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন।

অথবা এর অর্থ হলো, সকল বান্দা আল্লাহ্ পাকের সম্মুখেই রয়েছে, তিনি সকলকে দেখছেন, অতএব কে শাস্তির যোগ্য আর কে পুরস্কারের যোগ্য তা তিনি জানেন।[২]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৫ই জুন, মোতাবেক ১৫ই মহররম, রোজ বৃহস্পতিবার, রাত ৯টায় সূরা ফাতেরের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর এ সাধনা এবং তোমার বিশেষ রহমতে এ মহান গ্রন্থকে পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২০৭
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইয়াসিন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত–৮৩, রুকু–৫, বাক্য–৭২৯, অক্ষর–৩,০০০

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣ عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ
اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى
الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ
سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে (শুরু করছি)

তরজমা

(১) ইয়াসিন।

(২) শপথ জ্ঞানগর্ভ পবিত্র কোরআনের,

(৩) (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অন্যতম,

(৪) আপনি সরল সঠিক পথেই রয়েছেন।

(৫) পবিত্র কোরআন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।

(৬) যাতে করে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক জাতিকে যাদের পিতা পিতামহদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়নি, তাই তারা বে-খবর রয়েছে।

(৭) তাদের অনেকের সম্পর্কেই স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে, তারা ঈমান আনবে না।

(৮) আমি তাদের গলায় শেকল পরিয়ে রেখেছি, তা তাদের চিবুক পরিমাণ বর্তমান রয়েছে। তাই তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে রয়েছে।

(৯) আর আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর রেখেছি এবং পেছনেও প্রাচীর রেখেছি, আর তাদেরকে উপর থেকে ঢেকে রেখেছি, তাই তারা দেখতে পায়না।

সূরা ইয়াসিন প্রসঙ্গে

এবনে মরদবিয়া, খতীব এবং বায়হাকী হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, সূরা ইয়াসিনকে 'মোআম্মা' বলা হয়, কেননা এ সূরার বরকতে এর পাঠক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করে।

এ সূরার আরেকটি নাম হলো 'দাফিয়া', কেননা এ সূরার কারণে এর পাঠক সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা পায়। এ সূরাকে 'কাযীয়া'ও বলা হয়। এজন্যে যে, এ সূরার বরকতে এর পাঠকের সকল প্রয়োজনের আয়োজন হয়।

শানে নুযুল

আবু নাঈম 'দালায়েলে' বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে উচ্চস্বরে কোরআনে করীম পাঠ করতেন। মক্কার কাফেররা তা পছন্দ করতো না। একদিন তারা এজন্যে তাঁর প্রতি আক্রমণ করার কুমতলবে এগিয়ে আসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতগুলো ঘাড়ের সঙ্গে আটকে যায়। চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা বাধ্য হয়ে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তাঁর সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বিপদমুক্তির আরজী পেশ করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ পাক তাদের বিপদ দূর করে দিলেন। তখন এ সূরার শুরু থেকে يؤمنون পর্যন্ত নাযিল হয়।

সূরা ইয়াসিনের ফজিলত

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বস্তু মাত্রেরই একটি অন্তর রয়েছে, পবিত্র কোরআনের অন্তর হলো ইয়াসিন। যে ব্যক্তি এ সূরাকে একবার পাঠ করবে আল্লাহ পাক তাকে (পুরস্কার স্বরূপ) দশবার পবিত্র কোরআন খতম করার তৌফিক দান করবেন। (তিরমিজী, দারেমী, বায়হাকী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন রাতে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে ঐ রাতেই মাফ করে দেবেন।

আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, এবনে মাজা, এবনে হাব্বান, তেবরানী, হাকেম, বায়হাকী হযরত মা'কাল এবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সূরা ইয়াসিন হলো পবিত্র কোরআনের ক্বলব বা অন্তর, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ সূরা পাঠ করে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়, অতএব তোমরা তোমাদের মৃতদের উপরে এ সূরা পাঠ কর।

খতীব হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে তাকে বিশ হজ্বের সমান সওয়াব দান করা হবে। আর যে এ সূরাকে শ্রবণ করবে সে আল্লাহর রাহে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার সমান সওয়াব পাবে। আর যে এ সূরাকে লিখবে, তার অন্তরে এক হাজার নূর, এক হাজার একীন, এক হাজার নেকী এবং এক হাজার রহমত প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে এবং পাশাপাশি এক হাজার হিংসা-বিদ্বেষ এবং অন্তরের রোগ বের করে দেয়া হবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন তার পিতা মাতার কবরে বা একজনের কবরের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক এ সূরার অক্ষরের সংখ্যার সমান মৃত ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেবেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে এমন ব্যক্তির নিকট এ সূরা পাঠ করলে মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব হয়। কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এ সূরা পাঠ করলে কবরের আযাব মাফ হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন নিয়মিত পাঠ করে, কেয়ামতের দিন এ সূরা তার জন্যে সুপারিশ করবে। (এবনে মাজা, আবু দাউদ, মসনদে আহমদ)

রুগ্ন বিপদগ্রস্ত লোক যদি এ সূরা লিপিবদ্ধ করে তাবিজ রূপে গলায় রাখে তবে আরোগ্য লাভ হয়, বিপদ দূর হয়, এ সূরার বরকতে মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

সূর্যোদয়ের সময় এ সূরা পাঠ করলে পাঠকের সব অভাব দূর হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে ধন-সম্পদের অধিকারী হয়। (দারেমী)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭৮
তফসীরে রূহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২০৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খোলা থাকবে।

কারো উপর জ্বীনের আছর হলে অথবা কেউ পাগল হলে এ সূরা পাঠ করে ফুঁক দিলে জ্বীনের আছর ও পাগলামী দূর হয়। এ সূরা লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে জ্বীন ও রোগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।[১]

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরাকে কোরআনের দিল বা অন্তর বলা হয়েছে। এর কারণ এই, এ জীবনের অস্তিত্ব দিল বা অন্তরের উপরের নির্ভরশীল। এমনিভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে ঈমানের উপর। আর ঈমানের তিনটি মূলনীতি রয়েছে (১) তৌহিদ (২) রেসালত এবং (৩) কেয়ামতের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। এ সূরায় ঈমানের এ তিনটি মূলনীতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এসব কিছুর ভিত্তি হল, কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রতি বিশ্বাস করে তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

ঈমানী জিন্দেগীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহ পাককে ভয় করা এবং আখেরাতের প্রতি একীন রাখা আর তার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা। এ সূরায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।[২]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় তৌহিদ ও রেসালতের কথা ছিল এবং সূরার শেষ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে যারা অবিশ্বাস করতো সেই অহংকারী লোকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এ অহংকারী অবিশ্বাসীদের আচরণে (হে রসূল!) আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বের সূরায় কাফেরদের একটি শপথের উল্লেখ রয়েছে,

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ

আর এ সূরার প্রারম্ভেই শপথ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

১। এ সূরার আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন এ লেখকের এনায়েতুল কোরআন, পৃষ্ঠা-২৬১-৬২

২। তফসীরে রূহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২০৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬২০

তফসীরুল কোরআন

يس

ইয়াসিন। এর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানেন, কেননা এটি 'মোকাত্তায়াতে'র অর্ন্তভুক্ত।[১]

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের এটিই মত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আরবের বনী তাঈ গোত্রের পরিভাষায় 'ইয়াসিন' শব্দের অর্থ হলো, হে ইনসান! বা হে মানুষ! আর এই মানুষ বলতে স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র বরকতময় সত্ত্বাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

'ইয়াসিন' আসলে ছিল 'ইয়াইনসিন', সংক্ষেপ করার জন্যে 'ইন' শব্দটি সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই 'ইয়াসিন' রয়ে গেছে। এ মত পোষণ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), একরামা (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), সায়ীদ এবনুল যোবায়ের (রঃ) এবং সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ।

আবুল আলীয়া (রঃ) বলেছেন, 'ইয়াসিন' অর্থ 'হে ব্যক্তি'।

আবুবকর ওয়াররাক বলেছেন, 'ইয়াসিন' শব্দটির অর্থ হলো 'ইয়া সাইয়্যেদাল বাশার' অর্থাৎ 'হে সমগ্র মানব জাতির সর্দার।[২]

ইমাম তাবারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ইয়াসিন' শব্দটি আল্লাহ পাকের নাম সমূহের মধ্যে অন্যতম। এ নাম দ্বারা আল্লাহ পাক শপথ করেছেন।

আর একরামা (রঃ) বলেছেন, 'ইয়াসিন' অর্থ হলো, 'হে মানুষ'।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এটি হলো আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামের প্রাথমিক কথা। আল্লাহ পাক এ বাক্যটি দ্বারাই কথা শুরু করেছেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কোরআনের নাম সমূহের অন্যতম।[৩]

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ۝ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۝ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۝

১। এ সম্পর্কে বিস্তরিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬২২
৩। তফসীরে তাবারী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৯৭

শপথ সেই জ্ঞানগর্ভ কোরআনের, যার প্রতিটি অক্ষর হেকমতপূর্ণ এবং জ্ঞানের উৎস, যার মহিমা অপূর্ব, যেখানে বাতিল বা যাদুর অনুপ্রবেশের কোন সম্ভাবনা নেই, যাতে কাব্যেরও কোন সম্পর্ক নেই। হে নবী! পবিত্র কোরআনের প্রতিটি বাক্যই আপনার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, জ্বলন্ত সাক্ষী। (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অন্যতম। অবশ্যই আপনি সরল সঠিক পথের উপর রয়েছেন। আপনার দ্বীন-ধর্ম, মত ও পথ সম্পূর্ণ সঠিক। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আপনার আদর্শ মহান, চির অনুসরণীয়।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ

'নিশ্চয় এ মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন পরাক্রমশালী, দয়াময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত'।

অতএব, আপনার অনুসারীরা পথভ্রষ্ট হতে পারেনা, করুণাময়ের অনন্ত অসীম করুণা থেকেও তারা বঞ্চিত হবেনা, আর আপনার বিরোধীরাও পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা পাবেনা।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ

'(হে রসূল!) যাদের পিতা-পিতামহদের সতর্ক করা হয়নি বলে তারা বে-খবর রয়েছে, এমন এক জাতিকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে আপনার নিকট পবিত্র কোরআন নাযিল করা হয়েছে'।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর নবুওয়্যত সম্পর্কিত দায়িত্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, অর্থাৎ হে নবী! আপনার দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ, অসাধারণ এবং অত্যন্ত কঠিন, এমন এক জাতিকে ভয় প্রদর্শনের তথা হেদায়েত করার দায়িত্ব আপনার প্রতি অর্পিত হয়েছে যাদের কাছে তো নয়ই, এমনকি তাদের পূর্ব পুরুষের কাছেও কখনো কোন নবী রসূল প্রেরিত হননি। পরিণামে তারা সরল সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে, নাজাতের পথ তাদের অজানা, তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, আল্লাহ পাকের নাম পর্যন্ত তারা জানেনা, আখেরাতের বিষয় তাদের অজানা, তারা চির অজ্ঞ। এর কারণ এই, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কোন নবী রসূল প্রেরিত হননি। তারা ভালো মন্দের পার্থক্য বোঝেনা, সত্য-অসত্যের পরিচয় তারা জানেনা, সুদীর্ঘ কাল ধরে তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। (হে রসূল!) এমনি একটি অজ্ঞ জাতির হেদায়েতের জন্যে আপনি প্রেরিত।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২৭

(হে রসূল!) এ পথভ্রষ্ট জাতিকে বিপদমুক্ত করা, তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করা এবং সরল সঠিক পথের দিকে আনা আপনার মহান দায়িত্ব। কিন্তু এ কাজ সহজ নয়, যারা আপনার অনুসরণ করবে, তারা সঠিক পথ লাভ করবে, আর যারা আপনার অনুসরণ করবেনা তারা পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত হবে। তবুও বলে রাখি, এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা কখনো আপনার আহবানে সাড়া দেবেনা, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

'তাদের অধিকাংশ লোক সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে যে, তারা ঈমান আনবেনা'। তারা সত্য ও সুন্দরের দিকে আসবে না, ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কর্মের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। শয়তানের অনুসরণকে তারা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে, তাই তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবেনা।

এবনে জরীর তফসীরকার একরামা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবু জেহেল বলেছিল, 'আমি যদি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে পাই তবে এমন করবো'। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ

'আমি তাদের গলায় শেকল পরিয়ে রেখেছি তা তাদের চিবুক পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে, অতএব তারা ঈমান আনবেনা'।

এ আয়াত لا يبصرون পর্যন্ত আবু জেহেল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যেহেতু আবু জেহেল ইতোপূর্বে বলেছিল যে, মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যেখানে পাব সেখানেই শেষ করবো, এরপর লোকেরা আবু জেহেলকে বলতো, 'তোমার কি করণীয় আছে কর, এখনো মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বর্তমান রয়েছেন'। তখন সে বলতো, 'আমি যে তাকে দেখিনা'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু জেহেল এবং বনী মখজুম গোত্রীয় তার এক সাথী সম্পর্কে। আবু জেহেল শপথ করে বলেছিল, আমি যেখানেই মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দেখি, পাথর দ্বারা তার মাথা ভেঙ্গে চৌচির করে দেব। অবশেষে একদিন সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামাজ রত অবস্থায় দেখে ফেলল, তার কাছেই পাথর পড়েছিল, সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর নিক্ষেপ করার জন্যে পাথরটি তুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ঘাড়ের সঙ্গে আটকে গেল। হাত থেকে পাথর পড়ে গেল। আবু জেহেল অনতিবিলম্বে তার সাথীদের নিকট ফিরে গেল,

তার অবস্থা বর্ণনা করলো এবং সে ধরাশায়ী হলো। এরপর ঐ মখজুমী ব্যক্তিটি বললো, 'আমি এই পাথর দ্বারা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)কে হত্যা করবো'। তাই সে পাথর নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলো। তিনি তখনও নামাজে রত ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তখন ঐ মখজুমীকেও অন্ধ করে দিলেন। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শ্রবণ করছিল কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলনা। এ অবস্থায় সে সাথীদের নিকট ফিরে আসে। কিন্তু সে তাদেরও দেখতে পেলোনা। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি করেছ'? মখজুমী বললো, 'আমি তাকে দেখতে পাইনি, তবে তাঁর আওয়াজ শ্রবণ করেছি। আমার মনে হলো আমার এবং তার মধ্যে কোন কিছু আড়াল হয়েছিল, যেমন কোন নর উষ্ট্র আক্রমণ করার জন্যে লেজ নড়াচড়া করছিল। যদি আমি তাঁর নিকট যেতাম তবে আমাকে সে খেয়ে ফেলতো'। তখন এ আয়াত اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا নাযিল হয়।[১]

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ

'আর আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর তৈরী করে রেখেছি এবং তাদের পেছনেও প্রাচীর রেখে দিয়েছি, এরপর তাদেরকে উপর থেকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায়নি'।

কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলনা

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বনী মখজুম গোত্রের কিছু লোক পরস্পর পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শহীদ করবে। এ পরামর্শে আবু জেহেল এবং ওয়ালিদ এবনে মগীরাও অংশ নিয়েছিল। একদিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করছিলেন। কাফেররা তাঁর পবিত্র কোরআন পাঠের শব্দ শ্রবণ করছিল, তখন পরামর্শ মোতাবেক ওয়ালিদ এবনে মগীরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হলো এবং তাঁর নামাজের স্থানে পৌছে গেল। কিন্ত সে তাঁকে সেখানে দেখতে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২৭-২৮

পেলনা, অথচ তাঁর পবিত্র কোরআন পাঠের শব্দ সে শ্রবণ করছিল। এ অবস্থায় সে তার সাথীদের নিকট ফিরে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলো, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামাজের স্থানে হাযির হলো। তাদেরও একই অবস্থা হলো। অর্থাৎ তাঁর আওয়াজ তারা শুনছিল, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলনা, তারা তাঁর আওয়াজের দিকে অগ্রসর হলো তখন পেছন থেকেও একই আওয়াজ আসতে লাগল, পুনরায় পেছনে আসলে সম্মুখ থেকে একই আওয়াজ আসতে লাগল, এভাবে তাদের অভিযান পন্ড হয়ে গেল। তারা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখেও যেতে পারলো না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক একথাই এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

'আর আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর তৈরী করে রেখেছি এবং তাদের পেছনেও প্রাচীর রেখে দিয়েছি, এরপর তাদেরকে উপর থেকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায়নি'।[১]

মূলতঃ আল্লাহ পাক যাকে হেফাজত করার ইচ্ছা করেন, তাকে আক্রমণ করার সাধ্য কারোই নেই।

দ্বিতীয়তঃ চক্ষুকে দর্শনের শক্তি আল্লাহ পাকই দান করেছেন, তিনি যদি কখনো এ শক্তি হরণ করেন, তবে এ শক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা কারোই থাকেনা। তাই হামলাকারী কাফেরদের দর্শন শক্তিকে আল্লাহ পাক তখনকার মতো অকেজো করে দিয়েছিলেন।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার কোরায়শদের মজলিশে আবু জেহেল বলেছিল, 'আমাকে বলা হয়, আমি যদি তাঁর (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করি তবে দুনিয়াতে নেতৃত্ব পাব আর আখেরাতে জান্নাতে যাব, আর যদি আমি তাঁর বিরোধিতা করি তবে এখানে অপমানজনক মৃত্যু হবে এবং আখেরাতে দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আজ তাকে আসতে দাও, দেখিয়ে দেব'।

ঘটনাক্রমে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখনই সেখানে তশরীফ আনলেন, তাঁর হাতের মুঠোয় সামান্য মাটি ছিল, তিনি তখন আলোচ্য আয়াত সমূহ পাঠ করছিলেন, ফলে আল্লাহ পাক ঐ কাফেরদেরকে তখনকার মত

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২৮-২৯

অন্ধ করে দিলেন। তিনি তাদের মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। তারা তাঁর চারি পার্শ্বেই ছিল। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাই তারা তাঁকে দেখতে পায়নি। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ পাক ঘটনাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

'আর (হে রসূল!) কাফেরদের প্রতি আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি, মূলতঃ আমিই মাটি নিক্ষেপ করেছি'।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাজকে 'নিজের কাজ' বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা, প্রকাশ্যে কাফেরদের প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকই তাদের প্রতি মাটি নিক্ষেপ করে তাদেরকে তখনকার মত অন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

এ ঘটনার পর পরই এক ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হয়ে দেখল, কাফেরদের এক বিরাট দল জড়ো হয়ে আছে, আগন্তুক তাদের এভাবে একত্রিত হবার কারণ জানত চাইলে তারা বললো, 'আমরা (হযরত) মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষায় রয়েছি। আজ তাঁকে জীবিত রাখবো না'। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, 'তিনি তো তোমাদের সামনে দিয়েই চলে গেলেন এবং তোমাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। বিশ্বাস না হয় মাথায় হাত দিয়ে দেখ'। তখন তারা দেখলো, সত্যিই তাদের মাথায় মাটি পড়ে আছে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন,

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

(তাদের অনেকের সম্পর্কেই স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে যে, তারা ঈমান আনবেনা।)

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২১৬-১৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮১-৮২

একথা দ্বারা কারো এই ভুল ধারণা হতে পারে যে, তাহলে কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানীর জন্যে তারা দায়ী নয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার কৃতকর্মের জন্যে অবশ্যই দায়ী, মানুষকে আল্লাহ পাক বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, ভাল-মন্দ, সত্য-অসত্য এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান মানুষ মাত্রকেই দান করা হয়েছে। তদুপরি, যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তাঁর প্রচারিত দ্বীন সমগ্র মানব জাতির জন্যে মনোনীত এবং পছন্দনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁর ওফাতের পর দ্বীন ইসলামের প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতের ওলামায়ে কেরামের উপর, কেননা তারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী। বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে সারা পৃথিবীতে ওলামায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে এজাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী হিসেবে সারা পৃথিবীতে দ্বীন ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। সযত্নে তাঁরা তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত একদল লোক ইসলামের বিরোধিতা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শকে অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেনি, তারা ইবলিস শয়তানের অনুসরণ করাকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছে, এজন্যে আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত সমূহে নিজের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছেন যে তারা ঈমান আনবেনা। অন্য আয়াতে একথাটিকে আল্লাহ পাক এভাবে এরশাদ করেছেন,

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

'যখন তারা বাঁকা পথ ধরলো, আল্লাহ পাকও তাদের মন বাঁকা করে দিলেন'।

তাহলে বাঁকা পথ ধরার অপরাধ তারা করেছিল বলেই তাদের এ পরিণতি হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا

'আর যে আল্লাহ পাকের জিকর ভুলে যায়, আল্লাহ পাক তার উপর ইবলিস শয়তানকে তার সাথী করে দেন (সে সব সময় তার সঙ্গে থাকে)'।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সূচনাতেই আল্লাহ পাক কাউকে পথভ্রষ্ট হতে দেননা; বরং তাকে সঠিক পথে আনার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ তেরটি বছর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অত্যাচারিত-উৎপীড়িত অবস্থায়ও কাফেরদেরকে দ্বীন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে টেনে আনার

প্রয়াস পান, কিন্তু তারা শুধু তাঁর বিরোধিতাই করেনি; বরং তাঁর প্রতি এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করে, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এভাবে হেফাজত করেন যে, তাঁর প্রতি হামলায় উদ্দত হবার মুহূর্তে তাদেরকে অন্ধ করে দেন, যা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ-ও ঘোষণা করা হয়েছে, যে 'তাদের অনেকের সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তারা ঈমান আনবেনা'।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿১০﴾
اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿১১﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ
اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿১২﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ
جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿১৩﴾ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿১৪﴾ قَالُوْا
مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿১৫﴾

তরজমা

(১০) আর (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন বা না করুন তাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।

(১১) (হে রসূল!) আপনি তো শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ পাককে ভয় করে। অতএব এমন লোকদেরকে আপনি ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দান করুন।

(১২) নিশ্চয় আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। আর আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে সুস্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি।

(১৩) (হে রসূল!) তাদের জন্যে ঐ গ্রামবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন যখন তাদের নিকট এসেছিল রসূলগণ।

(১৪) স্মরণ কর সে সময়কে যখন আমি তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম দু'জন রসূল; কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো, তখন আমি তাদেরকে তৃতীয় একজন দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম। তারা বলেছিল, 'আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি'।

(১৫) তারা বললো, 'তোমরা আমাদেরই ন্যায় মানুষ, দয়াময় আল্লাহ পাক কিছুই প্রেরণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছো'।

তফসীরুল কোরআন

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের ঈমান না আনার কারনে মনক্ষুন্ন না হবার জন্যে বলা হয়েছে এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন আর না-ই করুন তাদের জন্যে তা সমান, কেননা তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবেনা, তাদের অন্যায় আচরণ, তাদের ধৃষ্টতা, হঠকারীতার কারণে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, পরিণামে তারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তাদেরকে পথে আনতে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন তারা পথে আসবেনা, কাফেরদের এ অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া যে, মক্কাবাসী কাফেররা ঈমান না আনলেও (হে রসূল!) আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না, কেননা ঈমান আনয়নের যোগ্যতা তাঁদের মধ্যে আর নেই, তাই তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা না করা দু'-ই সমান। অবশ্য এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাদেরকে সতর্ক করা না করা তাদের পক্ষে সমান হলেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে তাদেরকে সতর্ক করা বিরাট লাভের ব্যাপার, কেননা এর দ্বারা আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর মহান আদর্শ অন্যের হেদায়েতের কারণ হবে।

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ

'(হে রসূল!) আপনি তো শুধু তাদেরকেই সতর্ক কতে পারেন, যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ পাককে ভয় করে, অতএব এমন লোকদেরকে আপনি ক্ষমা এবং মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দান করুন'।

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভয় প্রদর্শন শুধু এমন ব্যক্তির জন্যেই উপকারী হতে পারে, যার মধ্যে ঈমান এবং সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বর্তমান রয়েছে, যে উপদেশ মেনে চলে, যে না দেখে আল্লাহ পাককে ভয় করে, (হে রসূল!) এমন লোককে মাগফেরাতের তথা ক্ষমা লাভের এবং মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দান করুন।

আর যে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, যে কেয়ামতের প্রতিও বিশ্বাস করেনা এমন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করা না করা একই কথা।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط

'নিশ্চয় আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি, যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়'।

অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী, এ জীবনের পর আরও একটি জীবন আসবে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে সেখানে তার কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কোরআনে করীমের ভাষায়ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ط وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ط اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

'আর প্রত্যেকটি মানুষের কর্ম তার গ্রীবলগ্ন করেছি (প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে) আর কেয়ামতের দিন তার জন্যে আমি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবো (আর তাকে বলা হবে) তোমার আমলনামা তুমি নিজেই পাঠ কর। হিসাব নিকাশের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট'।

এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হতে পারে যে, মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা যা মৃত্যুরই নামান্তর, এ মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার পর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে এলম এবং হেদায়েত দান করেন, যা প্রকৃতপক্ষে জীবন বোধেরই পরিচায়ক। অতএব, انا نحن نحى الموتى অর্থাৎ মূর্খতা এবং গোমরাহীর পর আমিই মানুষকে হেদায়েত দান করি তথা প্রকৃত জীবনবোধ দান করি।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আরববাসী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মক্কায়ে মোয়াজ্জমার জীবনে তাঁর বিরোধিতা করেছে, কেননা তারা তখন আধ্যাত্মিক

জীবন-বঞ্চিত ছিল, আল্লাহ পাকের মা'রেফাত থেকে তারা ছিল বহু দূরে। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন তথা তাদের মধ্যে জীবনী শক্তির সঞ্চার করেছেন, তারা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আদর্শ এবং শিক্ষক হয়েছেন। আর পৃথিবীতে তাঁরা অমর কীর্তি রেখে গেছেন।

আলোচ্য আয়াতে اثار শব্দটির অর্থ হলো নেক আমল, এমনিভাবে, ওয়াকফ করা সম্পদ বা এমন কোন নেক আমল যা পূর্বে করা হতো, কিন্তু এখন করা হয় না এমন নেক আমলের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা। অথবা সমাজ জীবনে কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করা, এমনিভাবে মন্দ কাজও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন কোন মন্দ প্রথা প্রচলন করা, কুফর ও নাফরমানীতে সাহায্য করা প্রভৃতি। অতএব

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

এর অর্থ হলো, মানুষ ভাল বা মন্দ যা পৃথিবীতে রেখে যায়, আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা প্রচলন করে তার কর্মের সওয়াব তো সে পাবেই, উপরন্তু যারা পরবর্তীতে ঐ প্রথার অনুসরণ করবে, তাদের আমলের সমান সওয়াবও তাকে দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে, যে বা যারা কোন মন্দ প্রথা প্রচলন করবে, পরবর্তীকালের লোকেরা সে মন্দ প্রথার অনুসরণ করলে ঐ ব্যক্তির মন্দ কাজের গুনাহ তো হবেই, তার পাশাপাশি যারা ঐ মন্দ কাজে তার অনুসরণ করবে, তাদের গুনাহর সমান গুনাহও তার হবে। (মুসলিম শরীফ)

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী اثارهم শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো মসজিদগামীদের পদচিহ্ন। কেননা, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামাজে সর্বাধিক সওয়াব সে ব্যক্তি লাভ করে যে সর্বাধিক দূরবর্তী স্থান থেকে মসজিদে হাযির হয়। এরপর সে ব্যক্তির সর্বাধিক আনুপাতিক হারে সওয়াব হয়, যে অন্যদের চেয়ে দূরবর্তী স্থান থেকে আসে। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজ আদায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে, তার সওয়াব ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী যে নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মসজিদের পার্শ্বে কিছু জমি খালি ছিল, বনী সালমা গোত্রের লোকেরা ইচ্ছা করলো যে, তাদের মহল্লা ছেড়ে মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে এসে বসবাস করবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে অবগত হয়ে এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি

মসজিদের কাছে চলে আসতে চাও'? তারা আরজ করলো, জ্বী, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আমাদের তেমনই ইচ্ছা। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'হে বনী সালমা! নিজেদের বাড়ী-ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ হয়'।[১] (মুসলিম শরীফ)

ইমাম আহমদ, এবনে মাজা, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কিছু আনসারী সাহাবায়ে কেরামের আবাস-স্থল মসজিদে নববী থেকে দূরে ছিল। তাঁরা মসজিদের নিকট এসে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলে এ আয়াতাংশের উল্লেখ করা হয়।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ

অর্থাৎ '(মসজিদে গমনের সময়) তাদের পদচিহ্নগুলো আমি লিপিবদ্ধ করি'। এরপর তাঁরা নিজেদের স্থানেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন।[২]

মসনদে আহমদে এ পর্যায়ে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে যে, একজন মদীনাবাসী সাহাবীর ইন্তেকাল হয় মদীনা শরীফে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাজে জানাযা আদায় করে এরশাদ করলেন, কত ভাল হতো যদি নিজের দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও তার ইন্তেকাল হতো! এক ব্যক্তি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যখন কোন মুসলমান প্রবাসে ইন্তেকাল করে, তখন তার দেশ থেকে ঐ স্থান পর্যন্ত পরিমাপ করে তাকে জান্নাতে স্থান দেয়া হয়।

এবনে জরীর হযরত সাবেত (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমি হযরত আনাস (রাঃ)-এর সঙ্গে নামাজের জন্যে মসজিদে গমন করছিলাম এবং দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমার হাত ধরে ফেললেন এবং ধীরে ধীরে হালকা পদক্ষেপে যেতে লাগলেন। নামাজ শেষ হবার পর তিনি বললেন, আমি হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে গমন করছিলাম এবং দ্রুত যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, হে আনাস! তুমি কি জাননা যে এ পদচিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ হচ্ছে।[৩]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২১৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৯০
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২১৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৯০-৯১
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৯১

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ

'আর আমি প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুই সুস্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষণ করে রেখেছি'।

امام مبين শব্দ দ্বারা 'লওহে মাহফুজ'কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ সব কিছুই 'লওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ

'(হে রসূল!) তাদের জন্যে ঐ গ্রামবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন তাদের নিকট এসেছিল রসূলগণ'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে যারা অস্বীকার করতো তাদের উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াত থেকে পূর্বকালে যারা নবী রসূলগণকে অস্বীকার করেছে তাদের যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যাতে করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

যে জনপদের ঘটনা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সে জনপদ কোন্‌টি? এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন, এটি হলো সিরিয়ার 'আনতাকিয়া' শহর, আর আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে 'মুরসালুন' বলা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথী।

'আনতাকিয়া' শহরের অধিবাসীরা মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে তৌহিদ এবং রেসালতের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে তবলিগ করার লক্ষ্যে তথায় প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ পাকের নির্দেশ ক্রমেই হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর 'প্রেরিত' ছিলেন, এজন্যে তাদেরকে 'মুরসাল' বলা হয়েছে। তারা নবী বা রসূল ছিলেন না। এর প্রমাণ পবিত্র কোরআনেও রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট ফেরেশতাদের একটি দল এসেছিলেন। তাদেরকেও 'মুরসালুন' বলে পবিত্র কোরআন উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ

এমনিভাবে রাণী বিলকিস হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট যে বাণীবাহক পাঠিয়েছিল, তাদের সম্পর্কেও পবিত্র কোরআনে 'মুরসালুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

ঠিক এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত ব্যক্তিদেরকেও আলোচ্য আয়াতে 'মুরসালুন' বলা হয়েছে।

অবশ্য কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তারা সরাসরি আল্লাহ পাকের রসূলই ছিলেন।[১]

আনতাকিয়ার ঘটনা

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ইতিহাস বেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) সত্যের দাওয়াত দিতে তাঁর দু'জন সাথীকে আনতাকিয়া শহরে প্রেরণ করলেন। যখন তারা আনতাকিয়ার নিকটবর্তী হলেন তখন দেখলেন, জনৈক বৃদ্ধ বকরী চড়াচ্ছে (এ ব্যক্তির নাম ছিল হাবীব, পরবর্তীতে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাহাবী হয়েছিলেন)। তাঁরা উভয়ে ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সালাম করলেন। সে তাদেরকে তাদের পরিচয় এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলো। তারা বললেন যে, আমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত, তোমাদেরকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার আহবান জানাতে এসেছি। বৃদ্ধ লোকটি বললো, তোমাদের নিকট কি কোন নিদর্শন রয়েছে? তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ পাকের হুকুমে রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ করি, জন্মান্ধকে চক্ষুস্মান এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করি। বৃদ্ধ লোকটি বললো, আমার এক পুত্র রয়েছে, সে দু' বছর ধরে অসুস্থ, তারা বললেন, আমাদেরকে তার নিকট নিয়ে চল। তারা উভয়ে যখন ঐ ব্যক্তির পুত্রের দেহ স্পর্শ করলেন তখন সে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এ সংবাদ সমগ্র জনপদে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের হাতে আল্লাহ পাক অনেক রোগীকে আরোগ্য দান করলেন।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ বর্ণনা করেছেন, 'আনতাকিয়া' জনপদের রাজার নাম ছিল আনতাফাস। সে ছিল মূর্তিপূজক। রাজা এ দু' ব্যক্তির সংবাদ পেয়ে তাদেরকে তার দরবারে তলব করলো এবং তাদের পরিচয় জানতে চাইলো, তখন তারা বললেন, আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণীবাহক। রাজা জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে? তারা বললো, আমরা তোমাকে আহবান করি এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতে আর মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে, কেননা এ মূর্তিগুলো কিছু শ্রবণও করতে পারেনা, দেখতেও পারেনা। অতএব, মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এমন পবিত্র সত্ত্বার এবাদত কর, যিনি সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু দেখেন। রাজা বললো, আমাদের উপাস্য ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য রয়েছে? তারা বললেন,

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৪

জ্বী-হ্যাঁ। সেই পবিত্র সত্ত্বা, যিনি আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তখন রাজা বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যাও, পরে তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করবো। তখন প্রেরিত ব্যক্তিগণ উঠে আসেন, অনেক লোক তাদের পেছন পেছন আসে এবং বাজারে এসে তাদের উভয়কে প্রহার করে।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আঃ) উভয় ব্যক্তিকে আনতাকিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন, তারা আনতাকিয়া পৌঁছলেও বাদশাহর দরবার পর্যন্ত যেতে পারেনি, অনেক দিন তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে, একদিন রাজা শহরে বের হয়, তখন তারা উভয়ে উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলেন, উচ্চস্বরে আল্লাহ পাকের জিকর করায় রাজা রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে গ্রেফতার ও একশত বেত্রাঘাত করার আদেশ দেয়, যখন উভয় বাণী বাহককে মিথ্যাজ্ঞান করা হয় এবং তাদেরকে প্রহার করা হয়, তখন হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের নেতা শামউনকে তাদের সাহায্যার্থে প্রেরন করেন। শামউন সে জনপদে বেশ পরিবর্তন করে হাযির হলেন। বাদশার দরবারের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তখন তারা রাজাকে শামউনের ব্যাপারে অবহিত করলো। রাজা শামউনকে দরবারে ডেকে পাঠালে তিনি হাযির হলেন। রাজা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে মুগ্ধ হলেন, তাঁকে যথোচিত সম্মান জানালেন, কিছুদিন পর শামউন রাজাকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে দু' ব্যক্তিকে আপনি কারাবন্দী করে রেখেছেন, তারা যখন আপনার ধর্মের বিরোধী কথাবার্তা বলেছে, তখন আপনি তাদের প্রহার এবং বন্দী করেছেন। আপনি কি তাদের সঙ্গে কোন কথা বলেছিলেন? রাজা বললো, আমি এত বেশী রাগান্বিত হয়েছিলাম যে, তাদের সঙ্গে কোন কথাই বলতে পারিনি। তখন শামউন বললো, রাজা যদি সমীচিন মনে করেন তবে তাদেরকে তলব করে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শামউনের পরামর্শে রাজা ঐ দু'জন বাণী বাহককে তলব করলেন। শামউন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদেরকে এখানে কে প্রেরণ করেছে? তারা জবাব দিলেন, আল্লাহ পাক, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কোন শরীক নেই, শামউন তাদেরকে বললো, আল্লাহ পাকের গুণাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তারা বললো, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। তাঁর যেমন মর্জি হয় তেমনি আদেশ দেন। শামউন বললো, তোমাদের নিকট কোন নিদর্শন রয়েছে কি? তারা উভয়ে বললো, যে কোন নিদর্শন ইচ্ছা তলব করতে পারেন। একথা শ্রবণ করা মাত্র রাজা একটি ছেলেকে ডেকে আনলো যার চক্ষুর কোন নমুনাই ছিলনা, কপাল যেমন সমান, চক্ষুর স্থানও তেমনি সমান। তখন ঐ দু' ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকলো, অবশেষে ঐ ছেলেটির চক্ষুর স্থান ফেটে গেল

এবং একটু পরে সে চক্ষুস্মান হয়ে গেল। রাজা অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হলো, শামউন রাজাকে বললো, যদি আপনি আপনার উপাস্যকে এরূপ করতে বলেন, আর উপাস্যরা এরূপ করতে পারে, তবে আপনার প্রাধান্য বিস্তার হবে। রাজা বললো, তোমার কাছে তো কোন কিছু গোপন নেই, আমরা যেসব মূর্তির পূজা করি, তারা কোন কিছু শোনেও না, দেখেওনা, কোন প্রকার ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই তারা করতে পারেনা।

রাজা যখন পূজা করতো তখন শামউন নামাজ আদায় করতে থাকত এবং আল্লাহ পাকের দরবারে কাকুতি-মিনতি করতে থাকত। তখন লোকেরা মনে করতো শামউন তাদের ধর্মে রয়েছে। এরপর রাজা ঐ দু'জন বাণী বাহককে বললো, তোমাদের খোদা যদি মৃতকে জীবিত কতে পারে, তবে আমি তাকে মানবো। তারা বললেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তখন রাজা একটি শিশুর লাশ হাযির করলো, যার মৃত্যু হয়েছিল এক সপ্তাহ পূর্বে, পিতার অনুপস্থিতি হেতু তাকে দাফন করা হয়নি, মৃত লাশটি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, এমন অবস্থায় তারা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রকাশ্যে দোয়া করতে থাকল আর শামউন চুপিসারে দোয়া করতে থাকল। কিছুক্ষণ পরই মৃত শিশুটি জীবিত হয়ে বসে পড়ল এবং বললো, মুশরেক অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়েছিল সাত দিন পূর্বে, আমাকে অগ্নির সাতটি ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি তোমাদেরকে শেরক পরিত্যাগ করার জন্যে বলছি, তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন। এরপর সে বলেছে, আসমানের দরজা খোলা হয়, আমি দেখি, আর আমি একজন অতি সুন্দর যুবককে দেখেছি যে, এই তিনজনের সুপারিশ করছে। রাজা জিজ্ঞাসা করলো, তিনজন কে? সে বললো, শামউন এবং এই দু'জন। রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলো, শামউন যখন দেখলো, এ ঘটনা রাজার মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তখন সে রাজাকে বললো, আপনি এ দু' ব্যক্তিকে বলুন, তারা যেন আপনার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দেয়। রাজা তাই করলো, তখন বাণী বাহকদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হলো এবং আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতে লাগল। শামউনও চুপিসারে দোয়া করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ পাক রাজার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দিলেন, কবর ফেটে গেল, মেয়েটি বের হয়ে এল এবং বললো আপনারা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন, এ দু' ব্যক্তি সত্যবাদী। তবে আমার আশঙ্কা আপনারা তাদের কথা মানবেন না। এরপর সে তাদেরকে অনুরোধ করলো যে, আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিন, তারা তাকে কবরে পৌঁছে দিল।

এবনে এছহাক, কা'ব এবং ওয়াহাব (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাজা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেনি আর তার জাতিও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে। এজন্যে সে উভয় রসূলকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। এ খবর পেয়ে বৃদ্ধ হাবীব দ্রুতবেগে এসে রাজা এবং তার পারিষদদের উপদেশ দিয়েছে। এটিই হল আনতাকিয়ার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।[১]

এ ঘটনার বিবরণই রয়েছে এ আয়াত সমূহে।

اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ

'স্মরণ কর সে সময়কে যখন আমি ঐ জনপদবাসীর নিকট (তাদের হেদায়েতের জন্যে) দু'জনকে প্রেরণ করি, কিন্তু জনপদবাসীরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে, তখন আমি তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা (পূর্বে প্রেরিত দু'জনের) শক্তি বৃদ্ধি করি। তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত। আমরা তোমাদের নিকট এসেছি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের পথের সন্ধান দেই, অতএব তোমরা মুর্তি পূজা পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, প্রথম প্রেরিত দু' ব্যক্তির নাম হলো, ইয়াহয়া এবং ইউনুস। আর তৃতীয় ব্যক্তির নাম ছিল শামউন। আর কারো কারো মতে, তাদের নাম ছিল ইউহান্না এবং বুলিস, আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, তোমান ও বুলিস। শোয়ায়েব জোবায়ী বলেছেন, তাদের নাম ছিল শামউন ও ইউহান্না। আর তৃতীয় ব্যক্তির নাম ছিল বুলিস। তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন, আল্লাহ পাক ارسلنا শব্দটি ব্যবহার করেছেন (অর্থাৎ আমি প্রেরণ করেছি)। আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রেরণ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন, অথচ প্রেরণকারী হলেন হযরত ঈসা (আঃ)। এর কারণ এই, হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমেই প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু আনতাকিয়াবাসী সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে।

قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَىْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ

'জনপদবাসী বলে, তোমরা তো আমাদেরই ন্যায় মানুষ, এছাড়া ভিন্ন কিছুতো নও, আল্লাহ্ পাক কিছুই অবতরণ করেননি, তোমরা সকলেই মিথ্যা কথা বলছো'।

অর্থাৎ তারা বলে, তোমাদের মাঝে এমন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে রসূল মনোনীত করেছেন, তোমরা তো আমাদেরই ন্যায় রক্ত-মাংসের মানুষ। অতএব, কোন্ গুণে আমরা তোমাদের নেতৃত্ব মেনে নেব। তোমরা মিথ্যা কথা বলে আমাদেরকে অনুগত করতে পারবেনা। কেননা, তোমাদের মধ্যে অতি মানবীয় কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।[১]

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا
إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم
مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن
ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا
الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾
اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৬) তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক উত্তম রূপেই জানেন, আমরা তোমাদের নিকট অবশ্যই প্রেরিত হয়ে এসেছি'।

(১৭) আর (আল্লাহ পাকের মহান বাণী) স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই আমাদের কাজ।

(১৮) জনপদবাসী বললো, 'আমরা তোমাদেরকে নিশ্চয় অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করবো, আর আমাদের নিকট থেকে তোমাদেরকে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩৪-৩৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২২১

(১৯) তারা বললো, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই থাক, তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি বলেই কি এত কথা! বরং তোমরাই এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়'!

(২০) আর (তখনই) শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এসে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসূলগণের অনুসারী হও'।

(২১) তোমরা অনুসরণ কর এমন লোকের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না এবং যারা হেদায়েত প্রাপ্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আনতাকিয়াবাসী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং তাদের আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে রসূলগণ এ অস্বীকৃতির যে জবাব দিয়েছেন তার উল্লেখ রয়েছে। রসূলগণ আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছেন, আমরা সত্যি সত্যিই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, তোমাদের কল্যাণ সাধনই আমাদের কাম্য। যেহেতু কাফেররা রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, তাই তারা আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে দ্বিতীয়বার বলেছেন, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই যে, আমরা আল্লাহ পাকের তরফ থকে প্রেরিত।

وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

আমাদের দায়িত্ব হলো সুস্পষ্ট ভাষায় তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া। আমরা এ উদ্দেশ্যেই তোমাদের নিকট এসেছি, আর সে বাণী আমরা পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের মানা না মানার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের কথার সত্যতার প্রমাণ তথা রেসালতের নিদর্শন আমাদের নিকট রয়েছে, অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করা এবং কুষ্ঠরোগীর সুস্থ হওয়া। এসব হলো আমাদের সত্যতার প্রমাণ। এখন ভালো-মন্দ বা লাভ-ক্ষতি তোমাদের নিজস্ব, তোমাদের অস্বীকৃতি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা।

এদিকে রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে অনাবৃষ্টির সম্মুখীন করেন। ফলে তাদের জনপদে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তারা বলে ঃ

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

জনপদবাসী বললো, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা

করবো। আর আমাদের নিকট থেকে তোমাদেরকে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে'।

অর্থাৎ তারা বললো, তোমাদেরকে বড় অলক্ষুণে মনে হয়, এই যে অকাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তা তোমাদেরই কারণে, তোমাদের অশুভ পদচারণাই আমাদের সকল বিপদের কারণ, যদি তোমরা এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত না হও এবং আমাদের জনপদ থেকে বের হয়ে না যাও, তবে আমরা প্রস্তর নিক্ষেপে তোমাদেরকে হত্যা করবো।

قَالُوْا طَٰئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

রসূলগণ বললো, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে থাক, তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি বলেই কি এত কথা! বরং তোমরাই এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়'।

রসূলগণ তাদের আপত্তিকর উক্তির জবাবে বললেন, তোমাদের এ অলক্ষুণে অবস্থা তোমাদেরই সঙ্গে রয়েছ, তোমাদের অন্যায়-অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই তোমাদের উপর বালা-মসিবত, দুর্ভিক্ষ আপতিত হয়েছে। আমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত, তোমাদের জন্যে হক্ব এবং হেদায়েত নিয়ে এসেছি, আর আপতিত এ বালা-মসিবতের কারণ হলো তোমাদের কুফরী ও নাফরমানী।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের অদৃষ্টের ভালো-মন্দ তোমাদেরই সাথে রয়েছে, আর যা অদৃষ্টে রয়েছে তা অবশ্যই তোমাদের নিকট পৌঁছবে। আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি আর তোমরা আমাদেরকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার হুমকি দিচ্ছ! অথচ তোমাদের কর্তব্য ছিল আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

'বরং তোমরাই এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়'। পাপাচারে সীমা লংঘন করাই তোমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা যা বলছি তা তোমাদের সৌভাগ্যের কারণ হবে অথচ তোমরা তাকে অলক্ষুণে ভাবছ।

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ

'আর (তখনই) শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এসে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসূলগণের অনুসারী হও'।

এই ব্যক্তি ছিলেন হাবীব নাজ্জার, তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি, শহরের এক প্রান্তে নির্জনে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন তিনি। রসূলগণের সঙ্গে কাফেরদের দুর্ব্যবহার দেখে তিনি নীরব থাকতে পারলেন না, তাই তাঁদের সাহায্যে ছুটে আসেন এবং তাঁদের অনুসরণের জন্যে তার সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানালেন। তিনি বললেন ঃ

اتَّبِعُوا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

'তোমরা অনুসরণ কর এমন লোকের, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না এবং যারা হেদায়েত প্রাপ্ত', যারা সঠিক পথের দিশারী।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, হাবীব রেশমী বস্ত্র তৈরী করতেন।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, পেশায় তিনি ছিলেন একজন ধোপা। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। এজন্যে শহরের শেষ প্রান্তে তিনি বসবাস করতেন। একজন দানশীল মর্দে মোমেন ছিলেন তিনি। তাঁর পুরো দিনের রোজগারের এক ভাগ আল্লাহর রাহে দান করতেন, অন্যভাগ আপনজনদের মাঝে ব্যয় করতেন। তিনি যখন এ দুঃসংবাদ পেলেন যে, দূরাত্মা কাফেররা রসূলগণকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তখন তিনি ছুটে আসলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে রসূলগণের অনুসরণ করার এবং অন্যায় পথ পরিহার করার জন্যে উদাত্ত আহবান জানালেন।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, হাবীব সত্তর বছর ধরে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাঁর কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে সে এগুলোর কাছে মিনতি জানিয়েছে। যখন রসূলগণ তাঁকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আপনাদের নিকট কোন নিদর্শন রয়েছে কি?' তখন তারা হাবীবের জন্যে দোয়া করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক তাঁকে আরোগ্য দান করলেন আর এভাবে তাঁর ঈমান লাভের তৌফিক হয়। যখন তিনি রসূলগণের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন, তখন ছুটে এসে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।[২]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২১শে জুন ১৯৯৫, মোতাবেক ২১শে মহররম ১৪১৬ হিজরী, রোজ বুধবার, রাত সাড়ে দশটায় তফসীরে নূরুল কোরআনের ২২তম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো, হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ রহমতে কবুল কর এ সাধনা এবং তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

وصلى الله تعلى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩৬
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-২২৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২, পৃষ্ঠা-৯৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৩৮